বাংলা সংগীতের রূপ

সুকুমার রায়

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ—
ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৭

মুদ্রাকর ঃ
অ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স
৪৩৭-বি, রবীন্দ্র সরণী
(শোভাবাজার মোড়)
কলিকাতা—৭০০ ০০৫

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

গ্রন্থ-পরিচিতি

"বাংলা সংগীতের রূপ" গ্রন্থটি রচনা করেছেন সংগীতজ্ঞানী শ্রীসুকুমার রায়। পূর্বভাষ ব্যতীত সাতটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি বিভক্ত এবং একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত। 'বাংলা সংগীতের রূপ' একাধারে সংগীতের ইতিবৃত্ত, সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বলা যায়। সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সংগীত-সমাজে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি, রীতিনীতি, রাগরূপ ও রাগের বিকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সাংগীতিক বিষয়বস্তু ও আলোচনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গ্রন্থটি সুনিপুণভাবে রচিত হয়েছে মার্জিত রুচি ও রীতির পরিচয় দিয়ে।

পূর্বভাষে শ্রীসুকুমার বাবু লিখেছেন: "বর্তমান বাংলা গান, যাকে লঘুসংগীত রূপে বিভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করা হয়, সে সংগীতই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। পুস্তকের লক্ষ্য ঐতিহাসিকের নয়। এই গ্রন্থে আছে পদ্ধতি ও আঙ্গিক (technique) সম্পর্কিত আলোচনা।" অবশ্য ঐতিহাসিকতার অবগাহী না হলেও অতীতের পৃষ্ঠা থেকে সামান্য ও বিশেষ বহু ঘটনা ও রীতির হয়তো সমাবেশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে কোন গ্রন্থ রচনা করতে গেলে। তাছাড়া আধুনিক ঘটনাবগাহী বিবর্তনশীল সমাজই অতীতের প্রয়োজন ও প্রতিষ্ঠাকে গ্রহণ করে তবে চলমান। বিচক্ষণ গ্রন্থকার তাই ঐতিহাসিক ক্রম ও উপাদানের উপস্থাপনের জন্য আগ্রহশীল না হলেও অতীতে ও বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজে বাংলা-গানের রূপায়ণ ও বিকাশ কীভাবে হয়েছে ও আছে তার একটি পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট বিবরণ সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন—যা পরীক্ষা-নিরীক্ষাসেবী সংগীতশিল্পী, সংগীতসেবী ও সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক কার্যকরী হবে।

বিচারশীল গ্রন্থকার বলেছেন, প্রচলিত লঘুসংগীত জীবনের প্রাণবন্ত প্রবাহ এবং এই প্রবাহকে বুঝতে গেলে কেবলি প্রচলিত ও অনুসৃত থিওরী প্রয়োগ করে বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিজে সংগীত আলোচনায় সে পথ বেছে নেন নি এবং বর্তমান গ্রন্থকারও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে এই গ্রন্থ রচনা করেন নি। তিনি তাই লিখেছেন, "এই গ্রন্থে প্রচলিত লঘুসংগীত সম্বন্ধে

বিশ্লেষণ করে যে থিওরীতে পৌছান গেছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রেই সেগুলো সাজাতে চেষ্টা করেছি।" গ্রন্থকার পূর্ববর্তী জীবনে একজন বিচক্ষণ শিক্ষাবিদ ছিলেন এবং শাস্ত্রীয় সংগীতও শিক্ষা করেছেন বহু বিদগ্ধ উস্তাদের নিকট। সুতরাং ভারতীয় সংগীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তিনি অধিকারী এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ও সাধারণ বিশ্লেষণী রীতির আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রচলিত লঘু সংগীতের বহু তথ্য ও তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন নূতন একটি দৃষ্টির সন্ধান দিয়ে।

গ্রন্থকারের আর একটি কথা ঐ গ্রন্থের পূর্বভাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: "সেকালে বাংলাদেশে আঞ্চলিক ভাষায় পল্লী-সংগীতের সঙ্গে বর্তমান ছিল ধর্মীয় আবেদনে রচিত গান, যথা কীর্তন" প্রভৃতি। অবশ্য কীর্তন প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রবন্ধসংগীতেরই কাঠামোকে আশ্রয় ক'রে রসের ও ভাবের পূর্ণ প্রকাশ, এবং এই কীর্তনই এক সময়ে বাংলা দেশের সাধারণ ও অসাধারণ সমাজে ভাব ও ভক্তির বন্যা সৃষ্টি করেছিল যা অপর কোন দেশে ও সমাজে যার তুলনা মেলে না। সংগীতজ্ঞানী গ্রন্থকার সমগ্র-দৃষ্টি নিয়ে গীতকার কবিদের (রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল) ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করেছেন গঠনমূলক (constructive) সমালোচনার ভঙ্গীতে এবং এঁদের রচিত গান ও সুরেরও গতি ও তাত্ত্বিক সূত্র নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁদের সংগীত-আলোচনার রীতি-পদ্ধতিকে একটু নতুন ভাবে পরীক্ষা করে লঘুসংগীতের পর্যায়ে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তারও একটা পথ নির্দেশ করেছেন। গ্রন্থকারের এই নির্দেশ গতানুগতিকতা থেকে পৃথক অথচ নতুন একটি ধারাসৃষ্টির দাবী রাখে। বর্তমান গ্রন্থের প্রচেষ্টা ও লক্ষের উল্লেখ করে গ্রন্থকার লিখেছেন: "তত্ত্ব ও তথ্যমূলক আলোচনার জন্যে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায় কিনা, এই গ্রন্থে সেই চেষ্টাই আছে।" সুতরাং গ্রন্থের সমগ্র আলোচনার মূলে যে একটি যথার্থ তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধানের সার্থক প্রচেষ্টা আছে একথা অবশ্যই স্বীকার্য।

শ্রীসুকুমার বাবুর বর্তমান গ্রন্থে সাংগীতিক আলোচ্য বিষয়বস্তু যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বিস্তৃত আলোচনা থেকে আধুনিক যুগের গান-রচয়িতা ও সুরকারদের রচনা ও সুর-প্রয়োগ রীতির বিশিষ্ট শৈলী,

চরিত্র প্রভৃতির নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। আর করেছেন শাস্ত্রীয় সংগীত বাংলা গানকে কতটুকু ও কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার বিচিত্র উপাদানের সমাবেশ ক'রে। রবীন্দ্র-সংগীত, রবীন্দ্রনাথের গান রচনা ও সুর-বৈচিত্র্য, তাঁর গানের অনির্বচনীয়তা, স্বতন্ত্ররূপ ও প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতিরও আলোচনা করেছেন একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতির গানের স্বকীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যেরও তিনি আলোচনা করেছেন বিশ্লেষণী মন নিয়ে। তাছাড়া পল্লীগীতির বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার আধুনিক বিদগ্ধ গ্রন্থকার ও সমালোচকদের মতবাদের উল্লেখ করেছেন। মধ্য যুগের গান, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, ভজন প্রভৃতির গতি-প্রকৃতি গঠন ও প্রকাশ-ভঙ্গীর আলোচনাকেও তিনি গ্রন্থ থেকে বাদ দেন নি। তা ছাড়া সংগীতে বা গানে ব্যবহৃত বিচিত্র তালেরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন যা সংগীত-শিক্ষার্থীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

'সংগীত প্রযোজনায় সুরকার', 'বাংলা গানে রাগসংগীতের প্রভাব', 'খেয়াল ও বাংলা গান', 'টপ্পা', 'ঠুমরী,' 'রাগপ্রধান বাংলা গান' প্রভৃতির আলোচনা বিশ্লেষণমূলক এবং এই আলোচনাগুলি গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিশিষ্টে ছ'টি নির্দেশিকায় গ্রন্থকার গ্রন্থপঞ্জী এবং রবীন্দ্র-সংগীত, শ্রীদিলীপকুমার রায়ের উল্লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের কতিপয় রাগভঙ্গিম-গান, অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে কতকগুলি বিদগ্ধ সংগীতকারের মন্তব্য ও মতবাদ, নজরুল গীতির রূপ, জনপ্রিয়তা ও বৈশিষ্ট্য এবং রেকর্ডে প্রকাশিত আধুনিক সংগীতে সুর-সংযোজনা এবং আকাশবাণীর 'রম্যগীতি' অনুষ্ঠানে প্রচারিত কিছু সংখ্যক দৃষ্টান্ত গ্রন্থের অঙ্গীভূত করেছেন, সে বিষয়গুলি জানা সংগীত-শিক্ষক ও সংগীত-শিক্ষার্থীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সংগীতজ্ঞানী ও শিক্ষাসেবী বিচক্ষণ গ্রন্থকার দীর্ঘদিন ধরে আকাশবাণীর সংগীত অনুশীলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় আধুনিক যুগে বাংলা গানের ও অন্যান্য গানের সঙ্গে অভিজাত ক্ল্যাসিকাল শ্রেণীর গানের রূপ ও গতি-প্রকৃতির সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাছাড়া বর্তমান সুরকারগণের সুরসংযোজন প্রণালী ও তাঁদের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী গানের প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে অভিমত দেওয়াও তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে।

মোট কথা শ্রীসুকুমারবাবুর স্বকীয় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সুলিখিত "বাংলা সংগীতের রূপ" গ্রন্থটি বাংলার গুণী সমাজে বিশেষ প্রশংসা লাভ করার দাবী রাখে। বর্তমানে বাংলাভাষায় সংগীতের বহু গ্রন্থই রচিত হয়েছে ও রচিত হচ্ছে বিভিন্ন রুচি, দৃষ্টি ও উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু তথাপি স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্লেষণ মূলক দৃষ্টি নিয়ে সংগীত-গ্রন্থ রচনার এখনো যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। পূর্বসূরীদের গ্রন্থ আমাদের আদরণীয়, কিন্তু বর্তমানে সংগীতের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের যথেষ্ট আলোচনা হওয়ায় সংগীতের আলোচ্য বস্তুর দৃষ্টি ও প্রসার আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংগীতের বিষয়বস্তুর সুসংগত ও সঠিক আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক ও অবান্তর আলোচনারীতির আশ্রয় নেওয়াও অসঙ্গত। সংগীতশিক্ষা ও আলোচনার ক্ষেত্র এখন বাংলা দেশে বিস্তৃত, সুতরাং সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থরচনার সময়ে সংগীত-শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক, শাস্ত্র ও বিচার সম্মত এবং ইতিহাসনিষ্ঠ বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বর্তমান গ্রন্থটির আলোচনাভঙ্গী সেদিক থেকে রসোত্তীর্ণ বলা যায়। বৈজ্ঞানিক, অপক্ষপাত ও বিশ্লেষণী মনোবৃত্তি ও দৃষ্টি নিয়ে সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার সমগ্র বিষয়ের আলোচনা করেছেন এবং আশা করি সুলিখিত এই সংগীত-গ্রন্থ সংগীত-শিক্ষক, সংগীত-শিক্ষার্থী ও সংগীত-সেবীদের সমাজে বিশেষ সমাদর পাবে।

নিবেদন

বাংলার সমকালীন সংগীত-ধারাকে নিয়মের মধ্য দিয়ে বোঝবার চেষ্টায় এই গ্রন্থের চিন্তা-পদ্ধতিকে শ্রেণীবদ্ধ করে কয়েকজন সংগীত-আলোচকের উল্লেখ করেছি। যে ভাবনাতে যিনি বিশেষ মতামত দিয়েছেন প্রয়োজন অনুসারে তাঁর মতামতই উল্লেখিত হয়েছে। এই উল্লেখের অতিরিক্তও অনেকেই ভাবছেন বলে মনে করি।

আলোচনা সংবদ্ধ করবার জন্যে ব্যাপক বিশ্লেষণ বর্জন করা গেছে। গ্রন্থের দু একটি অংশ, যা 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তার অনেকটাই পরিবর্তিত করা হয়েছে।

ছাপার সময়ে আমি কলকাতার বাইরে কটকে থাকায়, প্রকাশক মহাশয়কে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, এজন্যে আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থের রচনাকাল খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ভাবে ১৯৬১-১৯৬৬, কিছু অংশ পরেও সংযোজিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বাহ্নে আমার চোখে দুজনার চিত্র ভাসছে। একজন ঢাকার স্বর্গীয় বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়। তাঁর কাছেই আমার রবীন্দ্রসংগীত এবং অতুলপ্রসাদের গানের হাতেখড়ি। আর একজন আমার প্রথম সংগীতগুরু, যাঁর কাছে বসে ১৯৩১ সাল থেকে সংগীত শাস্ত্র পড়া ও সংগীত শেখা শুরু করেছিলাম, তাঁকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করছি। তিনি পূর্বে ঢাকায় ছিলেন বর্তমানে পাকিস্তানে সিলেট-সুনামগঞ্জে দিনযাপন করছেন। এস্রাজে নানা রাগের আলাপচারী করে তিনি সংগীত শিক্ষা দিতেন, রবীন্দ্র-সংগীত ভালবাসতেন, সংক্ষেপে সংস্কৃত গ্রন্থগুলো আলোচনা করতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ছিল। আমার ভাবনার উৎসমুখ সেখানেই।

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে আমার যে সব অগ্রজ, বন্ধু, সতীর্থ, অন্তেবাসী এবং শুভানুধ্যায়ী সংগীতশিল্পীদের উৎসাহ আছে, তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

সুকুমার রায়

সূচীপত্র

পূর্বভাষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক গান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পল্লীগীতি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ধর্মীয় গীতি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কণ্ঠ

সংগীতের প্রযোজনায় সুরকার

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাংলা গানে রাগ সংগীতের প্রভাব

পরিশিষ্ট

পূর্বভাষ

১

বাংলা দেশের বাইরে বর্তমান বাংলা গান সম্বন্ধে যে ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, এই গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদ পরিকল্পনার মূলে তাই ছিল। কিন্তু প্রতিটি প্রসঙ্গ অবলম্বন করে ধীরে ধীরে অনেক স্থলেই মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি পরিচ্ছেদই স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পরিমার্জিত করে একটি সম্পূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে বইটি প্রকাশ করা হল।

বর্তমান বাংলা গান, যাকে লঘুসংগীতরূপে বিভিন্ন ভাবায় উল্লেখ করা হয়, সে সংগীতই এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু। পুস্তকের লক্ষ্য ঐতিহাসিকের নয়। এই গ্রন্থে আছে পদ্ধতি ও আঙ্গিক (technique) সম্পর্কিত আলোচনা। কতকগুলো প্রশ্ন অবলম্বনেই এই আলোচনার আরম্ভ, যথা—

বর্তমান লঘুসংগীতের উৎস এবং প্রকৃতি কি?

গীতিকারের নামে পরিচিত গানগুলোর বিশেষ প্রকৃতি কিভাবে নিরূপণ করা যায়?

রবীন্দ্র-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী, অথবা সংগীত-শ্রেণী কিনা?

আধুনিক গান কাকে বলব?

আধুনিক গান বিচারের পন্থা কি হবে?

পল্লীগীতি সম্বন্ধে সমস্যাগুলি কিরূপ?

ভক্তিমূলক বাংলা গানের রূপ কি?

কণ্ঠ-ভঙ্গি আঞ্চলিক সংগীতে কিভাবে প্রতিফলিত হয়?

চিরায়ত রাগ-সংগীতের সঙ্গে বাংলা গানের সম্পর্ক কি?

এরূপ অনেক প্রশ্নই শ্রোতার মনে ভিড় করে আসে। অনেককে এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বিশেষ গান সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেও শোনা যায়। অধুনা প্রচলিত পল্লী-সংগীত সম্বন্ধে অভিযোগও অনেক। সংগীত-রীতির দিক থেকে লোকের মুখে রবীন্দ্র-সংগীতের সম্বন্ধে কিছু কিছু

অভিযোগও শোনা যায়। যাঁদের বাংলা ভাষা জানা নেই, এবং যাঁরা চিরায়ত সংগীত সম্বন্ধে সজাগ, তাঁরা আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের মতো গীতিকারদের রচনার তারতম্য সম্বন্ধেও কোন স্থির ধারণা করতে পারেন না। অর্থাৎ, আধুনিক গান যদি একটি বিশেষ শ্রেণীর গান হয়ে থাকে, (যেমন, ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা ঠুমরী এক একটি শ্রেণী) তা হলে বাংলা গানের বিভিন্ন গীতিকারদের নিয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হয় কিনা? এ ধরণের উক্তির পেছনে সমালোচক-মনও ক্রিয়াশীল দেখা যায়। রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল আমাকে গৌহাটি রোটারী ক্লাবের এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে।

এই গ্রন্থের আলোচনায় উল্লিখিত প্রশ্নগুলো লক্ষ্য রেখে আরম্ভ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রূপ-নির্ধারণ, তত্ত্ব খুঁজে পাবার চেষ্টা ও সূত্রের সন্ধানও রা গেছে। প্রতিটি বিশ্লেষণের পর অন্বয় করবার চেষ্টাও করেছি। এ কথা সত্য যে অনেক স্থলে সহানুভূতি-সম্পন্ন দৃষ্টি আছে। সহানুভূতি শিল্প-বোধের মূলে থাকা স্বাভাবিক।

প্রচলিত লঘুসংগীত জীবনের প্রাণবন্ত প্রবাহ। এই প্রবাহকে রাগ-সংগীতের সূত্র বা থিওরি প্রয়োগ করে বুঝতে পারা যায় কিনা বলতে পারি না। এখানে সে রীতি অনুসৃত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে সংগীত আলোচনায় সে পথে যান নি। এই গ্রন্থে প্রচলিত লঘু-সংগীত সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে যে থিওরিতে পৌঁছান গেছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রেই সেগুলো সাজাতে চেষ্টা করেছি।

সেকালের 'দেশী-সংগীত' আজকে লোক-প্রচলিত সংগীতরূপেই পরিচিত। আজকে এ গানের বহু বৈচিত্র্য। [লোক-প্রচলিত কথার অর্থে লোক-সংগীত বা পল্লী-সংগীত বোঝান হয়নি। রাগ-সংগীতের সীমানার বাইরে সকল প্রকারের আঞ্চলিক গানকেই ব্যাপকভাবে ধরা হয়েছে।] দেখা যায়, অনেকেই এ গানের আলোচনা আরম্ভ করেন শাস্ত্রীয় সংগীতের সূত্র থেকে। একথা সত্য যে প্রাচীন কালে লোক-প্রচলিত নানান ধরণের সংগীতকে ধীরে ধীরে সংস্কার করেই রাগ-সংগীতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সংগীত-শাস্ত্রে দেশী সংগীতের উল্লেখ স্বতন্ত্র ভাবেই করা হয়েছে। বহু প্রকারের গানের উল্লেখও পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপক আলোচনা কোথাও মিলে না।

সে-কালে বাংলাদেশে আঞ্চলিক ভাষায় পল্লী-সংগীতের সঙ্গে বর্তমান ছিল

ধর্মীয় আবেদনে রচিত গান, যথা কীর্তন। কীর্তন গানের পদ্ধতি ও আঙ্গিক বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এটা সকল প্রকার লোক-প্রচলিত গানের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু, এখানে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কীর্তনকেও রাগ-সংগীতের ধারায় ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সমগ্র দৃষ্টিতে গীতকার-কবিদের (রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-নজরুল) ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সব গানের ঔপপত্তিক ও তাত্ত্বিক সূত্রের সন্ধানই মূল উদ্দেশ্য। রাগ-সংগীতের আলোচনার পথ প্রাসঙ্গিক নয়।

পরীক্ষা করলে দেখা যায় আঞ্চলিক /লঘু/ লোক-প্রচলিত সংগীত ও রাগ-সংগীত, দু'টি স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি। দুটোর সৃষ্টি ও বিকাশের কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দুয়ের জমিটা আলাদা রকমের। লঘু-সংগীতের মূল উৎস "প্রাকৃত রীতি"। মনের স্বতঃস্ফূর্ত সহজ ভাবাবেগ, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে এবং সামাজিক জীবনকে আশ্রয় করে এ সংগীত রূপলাভ করেছে। এই প্রকৃতিকে সকল প্রাচীন শাস্ত্র "দেশী" বলে বর্ণনা করেছে। একই অর্থে আমরা বলতে পারি, লঘু-সংগীত বা লোক-প্রচলিত নানান ধরনের গানের মূল উৎস প্রাকৃত-রীতি বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণা। হয়ত রাগ-সংগীতের প্রভাবও এতে আছে। কিন্তু এই সব সংগীতের রূপ নির্ধারণের সূত্র কি কিছু আছে? এই আলোচনার গোড়ায় বলে রাখা দরকার যে এ ধরণের বিশ্লেষণ নতুন নয়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্নমুখী। এ বিষয়ে নিয়মিত আঙ্গিক-বিশ্লেষণ কদাচিৎ মিলে। বর্তমান লঘু বা আঞ্চলিক গানের যে রূপ পরিস্ফুট হয়েছে বা হবে, তাকে বাস্তবদৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ করলে কতকগুলো ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থের আলোচনাতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন পূর্ব-নির্ধারিত ফর্মূলা ধরে নেওয়া হয়নি।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। এই গ্রন্থের বিষয় গানের কথা নয়। বাংলা গান অথবা যে কোন আঞ্চলিক লঘু গানের আলোচনাতে কথাবস্তু প্রধান হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাব্যগীতি নিয়ে কাব্যিক আলোচনা করা, ধর্মীয় গান নিয়ে দার্শনিক আলোচনার উদ্ভব হওয়া, রবীন্দ্র-সংগীত আলোচনায় কথার ঐশ্বর্যকে ব্যাখ্যা করা খুবই স্বাভাবিক। সে আলোচনা সংগীত-আলোচনা নয়। আবার একথাও সত্য যে, লঘু-সংগীতে শুধু সুর বা

সংগীতের দিকটা বিচার করলেই সরসতার উপলব্ধি হয় না। এই অর্থে শুধু সংগীত-আলোচনা গৌণ মনে হতে পারে। এরূপ কেন হয়? আমরা লঘু গানের শ্রেণীবিভাগ করি বিষয়বস্তু অনুসারে, যথা প্রেমমূলক গান, প্রকৃতি-বিষয়ক গান, বীরত্ব-ব্যঞ্জক, অধ্যাত্ম-সংগীত, হাস্য-রসাত্মক গান ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ বিষয়বস্তুর কথা ভাবলেও সুরের কোন প্রকৃতি অনুরূপ বলে ব্যাখ্যা করা যায় কি? লোক-সংগীতের বেলায় কতকগুলো বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে এবং সুর দিয়ে তাকে চেনা যায়, তাকে ছন্দের দিক থেকে ভেবে নেওয়া যায়। কিন্তু সকল রকমের গানের রচনায়ই কিছু সাংগীতিক নিয়ম বের করা যায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সুরের অ্যাবস্ট্রাক্ট কল্পনার কথা আসে। সেই সঙ্গে আসে সংগীত-বোধ ও সংগীত-সঞ্চার করবার বিশেষ বিশেষ কায়দাগুলোর কথা। অর্থাৎ গানের কথা-বস্তুর অনুরূপ নির্দিষ্ট অর্থবোধক সুর আছে কিনা? একথা বুঝে নিতে হলে সংগীত-সংস্কারের ওপর কতকটা নির্ভরশীল হওয়া দরকার হয়। সংগীত-সংস্কারই বুঝিয়ে দেয় কোন্‌টা কীর্তনের অঙ্গ, কোন্‌টা রবীন্দ্র-সুরের কাঠামো, কোথায় ভাটিয়ালীর টানা সুর অথবা কোথায় সুরের মধ্যে দিনান্তের পরিবেশ আছে, কোন্ সুরটা নানা আবেগ-প্রবণ ইত্যাদি। এই সব উপাদান বিশ্লেষণের সময় কথার প্রসঙ্গ বিচার্য হলেও, কথা শুধু সংগীতের ক্ষেত্রে অনেকটাই গৌণ। বিশিষ্ট গানকে বিশিষ্ট সুরের রূপে চিনতে পারা ও তার লক্ষণ গুলো জানা আজ আর সমস্যা নয়। অর্থাৎ আমাদের এমন সংগীত-সংস্কার আছে যে আমরা সুরের বিষয়কে সুরের দ্বারাই চিনে নিতে পারি, কথার সঙ্গে উপযুক্ত সুর যুক্ত হয়েছে কিনা বুঝতে পারি। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হয়, কোন যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনার ভিত্তিভূমি দৃঢ় হয় না। অর্থাৎ, আমাদের বক্তব্য এই যে সুরের প্রকৃতি অ্যাবস্ট্রাক্ট হলেও, নিছক দুর্বোধ্য নয়, বরং বিশেষ অর্থবোধক। এজন্যে গানকে কথাবস্তু অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করলেও, সুর বিশ্লেষণে ও রূপ নির্ধারণে অসুবিধা হয় না। শুধু মনে রাখা দরকার, সংগীতের আলোচনাই এই গ্রন্থে প্রধান লক্ষ্য। সে জন্যে গীতি-রচয়িতাদের নাম প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক নাম হয়ত বাদ গেছে।

কিন্তু কথার বিচিত্র ব্যবহারে লঘু-সংগীতের প্রকৃত রূপ নির্ধারিত হয়, পল্লীগীতি বা লোক-সংগীত এর উদাহরণ। ভৌগোলিক রূপটি লোকসংগীতে ফুটে ওঠে প্রধানত কথার ব্যবহারে এবং লোকসংগীত বিশিষ্ট পল্লীর

ভাষা ও ভাব কেন্দ্র করেই পরিচিত হয়। এসব ক্ষেত্রে কথাকে বাদ দিয়ে সুর-বিচার যেমন চলে না, তেমনি আবার কিছু কিছু গানের প্রকাশভঙ্গি দ্বারা প্রকৃত সংগীতরূপ বর্ণনা করাও চলে। চেনাজানা উচ্চারণ ভঙ্গিতে ও সুরে তাকে প্রয়োগ করবার কায়দা থেকে লক্ষণ নির্ধারণ করা যায়। লোক-সংগীতে গানের কথাই শুধু প্রাকৃত নয়, সুরটাও প্রাকৃত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে লঘু-সংগীতের নানান ধরণের গানের উৎসটা প্রাকৃত, স্বতঃস্ফূর্ত। এই নানান ধরণের লঘু-সংগীতের সঙ্গে রাগ-সংগীতের বিভিন্নতা নির্দেশ করতে গেলেও একটি কথা উল্লেখযোগ্য—প্রচলিত রূপের ওপর রাগ-সংগীতের প্রভাব অনেক ভাবেই বিস্তৃত দেখা যায়। কোথাও রাগ-সংগীত মৌলিক ভিত্তিভূমি, শ্যামা-সংগীত কোথাও কোথাও টপ্পায় পরিণত হয়েছে, কোথাও অন্য গান ধ্রুপদের মূর্তিতে বিকশিত হয়েছে, কীর্তনে ধ্রুপদী তালের প্রয়োগ হয়েছে এবং রাগালাপের পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে, কোন সুরকার খেয়ালকে অবলম্বন করেই গান রচনা করছেন, কোনো গানে সম্পূর্ণ ঠুমরীর ভঙ্গি এসেছে। সকল স্থানেই রাগ-সংগীতের রূপের সঙ্গে লঘু-সংগীতের গঠনপ্রকৃতির বিভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে প্রকৃত বিশ্লেষণ না হলে সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। লঘু-সংগীতের আলোচনা এজন্যে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। প্রভাবটি ব্যাখ্যা করে স্বাতন্ত্র্যটিকে চিনে নেওয়া দরকার।

আলোচনার লক্ষ্য গানের গঠনের রীতি ও কলা-কৌশল বিশ্লেষণ। উদাহরণ দিতে পারলে সুবিধে হত, সংগীতের উদাহরণ গানের দ্বারাই হওয়া উচিত। এখানে বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে, উদ্দেশ্য—ভাবনার সমগ্রতালাভ। সমসাময়িক শিল্প নিয়ে সমালোচক কত রকমের আলোচনাই করেন, একই বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে বহু দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। বাংলা গানের রূপ সম্বন্ধে তাই হয়েছে। চিরায়ত সংগীত বা রাগ-সংগীতের দৃষ্টি-ভঙ্গিতেও অনেকে এর রূপ-বিচার করেছেন। এই গ্রন্থে সেই বাঁধাধরা রীতিটি অবলম্বিত হয় নি। অন্যদিকে আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকের নয়। বাংলা সংগীতের রূপ বলতে সংগীতের গঠন-প্রকৃতি, তত্ত্ব ও তথ্যমূলক আলোচনার জন্যে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায় কিনা, এই গ্রন্থে সেই চেষ্টাই আছে।

২

লোক-প্রচলিত বা লঘু সংগীতের কোন ইতিহাস বা বিস্তৃত আলোচনা প্রাচীন সংগীত-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, একথা সকলেই জানেন। যে সংগীত প্রচলিত সংগীতরূপকে সংস্কার করে দাঁড়িয়েছে, রাগ-সংগীতে আমরা সে রূপই পাচ্ছি। সংগীত-শাস্ত্রে এই বিষয়েরই স্থান। সংগীত আলোচনায় আমাদের দৃষ্টি শাস্ত্রীয় সংগীতের দিকেই ফিরে। কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীতও অপরিবর্তনীয় বা একেবারে বাঁধা নয়। যুগের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। সংগীত-তত্ত্ব রচনার মধ্যেও সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাগ-সংগীতের প্রত্যক্ষ রূপই এর প্রমাণ। এ সম্পর্কে বর্তমান যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি লক্ষ্য করা যাক। আমরা জানি, উত্তর ভারতীয় রাগ-সংগীতে গানের ঐশ্বর্য ঘরাণা রীতিতে আবদ্ধ ছিল। মনে করা হত, যে গানের রীতির কথা বলতে পুর্বস্থরীর নাম উল্লেখ করা যায় না রাগ-সংগীত-সমাজে তার জাত নেই। রূপ ও রসে পরিপুর্ণ করে পুর্বরীতি বজায় রাখা ঘরাণারই কর্তব্য। কিন্তু দেখা গেছে, প্রবহমাণ রাগ-সংগীতও যুগে যুগে রূপ বদলায়। গোড়ার এই রাগ-সংগীতের রীতিরও ক্রম-বিবর্তন হয়েছে, তাতে অন্য বহিরাগত প্রভাবও এসে পড়েছে। অর্থাৎ সংগীত গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন পথে চলতে থাকে। রীতির কথা ছেড়ে দিলেও, মূল সংগীত রচনার কথা ধরা যাক। সেখানেও পরিবর্তন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এ ধরণের পরিবর্তনের জন্যে এমন কি মুসলমান শাসনের পুর্বযুগের বর্ণিত রাগরূপ পরবর্তী যুগের রাগরূপের সঙ্গে মেলে না। ব্যাখ্যা দ্বারা তাকে বুঝতে হয়। এজন্যে রাগ-সংগীতের বিশ্লেষণ করে পুরোনো শাস্ত্রীয় তত্ত্বের সঙ্গেও মিলিয়ে নেবার চেষ্টা চলে। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে উত্তর ভারতীয় রাগ-সংগীতের প্রাচীন তত্ত্বের বিরাট বাধা ও প্রতিবন্ধকের স্তর ভেদ করে প্রচলিত হিন্দুস্থানী সংগীতের সঙ্গে যে সঙ্গতি স্থাপন করেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে লোক-প্রচলিত সংগীতের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ নানান আঞ্চলিক সংগীতের ক্ষেত্রে) তেমন সুশৃঙ্খল কাজ আজ পর্যন্তও হয়নি। উনবিংশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত সংগীত-সমালোচকেরা বিভিন্ন ভাবে নানা দিক থেকে নানান বিষয় সম্বন্ধে লিখেছেন। সেগুলোকে অবলম্বন করে ভাল মৌলিক রচনার সম্ভাবনা আছে।

লোক-প্রচলিত, আঞ্চলিক সংগীতের বিশ্লেষণমূলক ও তাত্ত্বিক আলোচনায় বাধা-প্রতিবন্ধক আছে। গানগুলোর আঞ্চলিক রূপই এর বাধা। সাধারণ নিয়মে আঞ্চলিক রূপ পরিবর্তিত হয়। উনবিংশ শতক থেকে আরম্ভ করে যে সব গান স্বরলিপির মাধ্যমে অথবা নানান ভাবে আজও সংরক্ষিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আজকের যুগে আলোচনা হচ্ছে ও হতে পারে। প্রত্যক্ষ রূপ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা এখানেই সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের গানের মূলে এক-একটি বিশেষ সুর-বিচারের সূত্র সন্ধান করা সহজ নয়। যে ধরণের আলোচনায় কীর্তন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বুঝতে পারা যাবে ঠিক অনুরূপ আলোচনায় উত্তর ভারতীয় ভজন গান ও গীত বোঝা যাবে না। তাছাড়া লৌকিক সংগীতের বহু বৈচিত্র্য স্বতন্ত্র ধরণের বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। অর্থাৎ আজকাল সংগীতের লোক-প্রচলিত গীতি সম্বন্ধে ধারণা আমাদের হয়েছে কিন্তু সংগীত বিচারের দিক থেকে তাদের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণী-বিভাগ করে করা প্রয়োজন। কারণ, সুর ব্যবহার ও প্রয়োগে সর্বত্র স্বাতন্ত্র্য আছে।

বিভিন্ন লোক-প্রচলিত গানের সামগ্রিক আলোচনার কথা ছেড়ে দিলেও, বাংলার নানা প্রকারের গানগুলো সুশৃঙ্খল ভাবে বিশ্লেষণ করা কতকটা সহজসাধ্য। এর জন্য যে লক্ষণ বা সূত্র অবলম্বন (principles) করা যায় তাকে ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক সংগীত বিচারেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। লোক-প্রচলিত সংগীতের বিশ্লেষণে শাস্ত্রীয় সংগীতের সূত্র প্রয়োগ করে বুঝতে চেষ্টা করা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু বিষয়বস্তু ও তাৎপর্যের দিক থেকে এই পদ্ধতি উপযুক্ত নয়, এর দ্বারা লঘু-সংগীতের মূল্যায়নও চলে না, এতে সংগীত বিশ্লেষণের সব চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিতে পারে। রবীন্দ্র-সংগীত চিন্তা করতে গিয়ে যাঁরা শুধু শাস্ত্রীয় সংগীত বিশ্লেষণের পন্থায় এগিয়ে যান তাঁরা এর প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারবেন না। পল্লীগীতিকে রাগরাগিণী বিচারের পন্থায় বিশ্লেষণ করা যায় না এবং সেজন্যে পল্লী-সংগীতের উপযুক্ত কণ্ঠ ও তাল ব্যাখ্যায় স্বতন্ত্র সূত্র-শ্রেণীর আবিষ্কার করা দরকার হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে দেখা যায়, কোন কোন লোক-প্রচলিত সংগীত চিরায়ত সংগীতেরই রূপেও প্রকাশিত হয়েছে। যথা—কীর্তন। কীর্তনের বিকাশে একটা নির্দিষ্ট আঙ্গিক অনুশীলিত হয়েছে। অথচ একথা ঐতিহাসিক সত্য যে কীর্তন লোক-প্রচলিত সংগীতেরই একটি রূপের অভিব্যক্তি। অর্থাৎ কীর্তনের উদ্দেশ্য

রাগ-সংগীতের অনুরূপ নয়। কথাবস্তু কীর্তন গানে প্রধান। কিন্তু বিশিষ্ট আঙ্গিক উদ্ভাবনের জন্যেই কীর্তন আলোচনায় সেই বিশেষ পদ্ধতি বুঝে নেবার দরকার। অর্থাৎ লোক-প্রচলিত গানের প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোন' সূত্র বা গঠন-পদ্ধতি পাওয়া সম্ভব। আঙ্গিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোথাও সাহিত্য, কোথাও দর্শন, অথবা কোথাও এমন কি রাগ-সংগীতের উল্লেখও অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ অনেক আলোচনায় এসব জটও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, রাগ-সংগীতের উল্লেখও অনাবশ্যক কেন? ধরা যাক, পল্লীগীতিতে কোন রাগের রূপ আছে, কিন্তু তাকে সেই ভাবে বিশ্লেষণ করতে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা হয়ত নেই। অথচ লোক-প্রচলিত সংগীতের ব্যাখ্যায় রাগ-সংগীতের উল্লেখ দরকার হয়। ভারতীয় সংগীতের ভিত্তি melodyতে বা একক স্বরবিকাশে। সেজন্যে রাগগুলো এক এক বিশিষ্ট ধরণের সুরের নামও বুঝায় বটে। যথা "কাফি রাগ কাফি ঠাট থেকে উৎপন্ন হয়েছে" এ কথাটি বললে বুঝা যায় প্রথম "কাফি" শব্দটি রাগের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় "কাফি" শব্দটি একটি নাম। এইরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে রাগ নাম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ ছাড়া লোক-প্রচলিত গানের আলোচনায় সুরের প্রয়োগ-বিধি স্বতন্ত্র ভাবেই বিশ্লেষণ করা যায়। প্রচলিত গান সম্বন্ধে সাধারণের রুচি এবং সাধারণ শ্রোতার সংগীত-চেতনাও লক্ষ্য করা দরকার। সংগীত সম্বন্ধে একদিকে সজাগ রুচি-বোধের প্রসঙ্গ আছে, অন্যদিকে দেখা যায় শ্রোতার কান কোন কোন সুরকে সহজে গ্রহণ করে। সেই সুরের আবৃত্তিই এর প্রমাণ। কেনই বা এরূপ হয়? এসব প্রসঙ্গও আঞ্চলিক সংগীত আলোচনার পরিমণ্ডলে আসে। এ যুগের যে বাণী-প্রধান গান বিশেষ ধরণের সহজ সুরে প্রকাশিত হয় এবং নানা প্রাকৃত ছন্দে প্রচারিত হয়, এই আলোচনা তাকে এড়াতে পারে না। অর্থাৎ আঞ্চলিক সংগীতের বিচারে একটি সমগ্র দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রয়োজন। সমগ্র সংগীত-রূপটি বিশিষ্ট ইমারতের মতো মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রতি অংশের বিচার করা দরকার।

৩

বাংলার সংগীতের মৌলিক আলোচনার সূত্রপাত উনবিংশ শতকে। সংস্কৃতি ও ধর্মের রেনেসাঁসের বিশেষ আলোক-পাত হয়েছিল সংগীতে। লোক-প্রচলিত সংগীতের একটা অভূতপূর্ব জাগরণ হয়। সাহিত্যে বিশেষ ধারা

বিভিন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে স্ফূর্তি লাভ করে। চিত্রকলার বিকাশ ও নাট্যশালার উজ্জীবন প্রভৃতি বহু বিষয়ে নবযুগ সূচিত হয়। নবযুগের সংগীত-সৃষ্টিতে ঠাকুর পরিবারকে ঘিরে একটা বিরাট নতুন সম্ভাবনার পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল। এর অঙ্কুর গজিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নিধুবাবুর গানে। রামমোহন সংগীতের প্রয়োগ করেন নতুন করে—তাঁর অবলম্বন ছিল চিরায়ত সংগীত। এর পরেই ঠাকুর পরিবারকে কেন্দ্র করে দেশী বিদেশী যন্ত্রের ব্যবহার, দণ্ড-মাত্রিক এবং পরে আকার-মাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন, ঐকতান সৃষ্টি, যুক্ত-সংগীত ও নাট্যগীতির রূপান্তর, ভক্তিমূলক গানে (ব্রহ্মসংগীতে) নানান রীতির ব্যবহার, লোক-সংগীতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ—প্রভৃতি বহু রূপ পরিস্ফুট হয়।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রচলিত সংগীতের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টি সে-যুগের স্মরণীয় ঘটনা। প্রচলিত সংগীতকে তিনি প্রথমে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে গুণীর আসনে মর্যাদা দান করে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এ সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন। সংগীত সে যুগের মনীষিদের মনে নতুন ভাব প্রকাশের প্রধান বাহনরূপে ধরা দেয়। সংগীত বাঁধা ছিল বিশিষ্ট আসরে। সংগীত-রসিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল হিন্দুস্থানী চিরায়ত সংগীতের দিকে। রামমোহন যে ঐতিহ্যের পুরোধা সেখানে ধ্রুপদ-রীতির গানই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয় এবং একটি স্বতন্ত্র রস সৃষ্টি করে। এই ধারা রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনা পর্যন্ত একটানা প্রবাহিত হয়ে আসে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাগসংগীতের সংমিশ্রণেই এ ধারাকে নতুন গতি দান করেন। এর পর হিন্দী ভাঙা রীতিতে ব্রহ্মসংগীত রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিষ্ণু চক্রবর্তীর কথা আসে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির প্রচার এই ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখে। আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বারা যাঁরা উৎসাহিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি অক্ষয় চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। এজন্যে উনবিংশ শতকের সংগীত আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, নতুন যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার, সুর-রচনায় সৃষ্টিপ্রবণ মনের প্রক্রিয়া এবং সমসাময়িক সামাজিক ও জাতীয় জাগরণের কাজে সংগীতের ব্যবহার ইত্যাদি পন্থা উদ্ভাবন ও প্রচলনের ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলায় নতুন ভাবনাকে গতি দান করেন। এই

ইতিহাস বিস্তৃতভাবে রচিত হওয়া দরকার। ১৮৬৭ সনের হিন্দু মেলার বহু বর্ণনা নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে এবং ১৮৬৮ সনে এর দ্বিতীয় অধিবেশনে সংগীতের ক্রমবিকাশে দেশপ্রীতিমূলক সংগীতের প্রয়োগ নতুন প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। অতএব দেখা যায়, সে যুগের মনীষিদের বহু বিচিত্র ভাবনার উৎসারিত স্রোত বাংলার নতুনকে গড়ে তোলবার মূলগত কারণ ও মানস প্রস্তুতি।

দেখা যাচ্ছে তৎকালীন পরিবেশ কি করে সংগীত ভাবনাকে চিরাচরিত পথ থেকে একটি স্বতন্ত্র জগতে নিয়ে গিয়েছিল। সংগীত আলোচনার প্রসঙ্গে এ সময়ে মৌলিক প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনার সৃষ্টি করেন 'গীতসূত্রসারে'র লেখক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৮ সনে দিলীপকুমার রায় বলেছেন, "গ্রন্থকারের ধ্যানদৃষ্টি, বিশ্লেষণের দীপ্তি ও স্বাধীন চিন্তার প্রসাদে এই বইটি কুসংস্কারপীড়িত ওস্তাদ-শাসিত দেশে হয়ে দাঁড়িয়েছে নবযুগের অগ্রদূত।"···পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন এ-যুগ হল কাব্য-সংগীতের যুগ, নাট্য-সংগীতের যুগ।" বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত কণ্ঠসাধনার রীতির সমালোচনা করেন, স্টাফ্ নোটেশান বা পাশ্চাত্য সংগীতের স্বরলিপি পদ্ধতি প্রচলনের পক্ষে যুক্তি দেন, তাছাড়া যে সব গীত-রীতি তখনো সুধী-সমাজে গ্রাহ্য ছিল না অথচ তার মধ্যে জনপ্রিয়তার মৌলিক লক্ষণ দেখা গিয়েছিল সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট আশা প্রকাশ করেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' এজন্যেই যুগান্তকারী পুস্তক বলে অনেকেই স্বীকার করেছেন। একটা দৃঢ় প্রতিক্রিয়াশীল সংগীত-ভাবনা সংস্কারমুক্ত ও স্পষ্ট হয়ে ভাষারূপ পেয়েছে। এই মনোভাবটি এ যুগের সংগীত আলোচনায় একটি অমূল্য তথ্য। সেই সঙ্গে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের সংগীত-ভাবনার কথা আসে। রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রসঙ্গগুলো নতুনত্বের পথে সগর্ব পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন রাগ-সংগীতের পরিবেশে প্রথমে সংগীত অনুশীলন করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে তেমনি তিনি প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রকে মৃত বলেও উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা সংগীতের আর্ট ও প্রযুক্ত-শিল্পচেতনার দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগীত-চিন্তাকে এগিয়ে দিয়েছে এবং মুক্ত আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে।

৪

এ যুগের গানের পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের ফলেই আধুনিক ভাবধারার প্রকাশ। দেখা যাবে লোক-প্রচলিত লঘু-সংগীত আলোচনায় চিরাচরিত রাগ-সংগীতের পদ্ধতির উল্লেখ না করেও বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু সংগীতের মূল ভিত্তি অনুসন্ধানের জন্যে মার্গ-সংগীতেরও প্রয়োজন হতে পারে। লোক-প্রচলিত গানের প্রতি মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্গ-সংগীত বোধের অতি সহানুভূতিশীল সহজ প্রেরণা শ্রীদিলীপকুমার রায়ের আলোচনায় পাওয়া গেছে। দিলীপ বাবুর আলোচনা, সংগীত-রীতি ও তত্ত্বের প্রতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সফল প্রয়োগ। বর্তমান জগৎ ও জীবনের চাহিদাকে প্রত্যক্ষ রেখে তিনি শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি সংগীত-আলোচনায় প্রয়োগ করেছেন। একদিকে ক্লাসিক্যাল সংগীতের রস-রূপের মূল্যায়ন, অন্যদিকে মুক্ত রচনাতে শিল্পীমনের স্পর্শ—দিলীপকুমারের মধ্যে এ দুটো গুণের সম্মিলন হয়েছে এবং দিলীপকুমার বর্তমান ভাবধারার স্বপক্ষে বলতে সর্বাগ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। নতুন গানের আস্বাদন দিলীপকুমার মুক্তভাবে করেছেন, পরীক্ষণ নিরীক্ষণের বহু পন্থা নিজে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারের আলোচনায়, রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন সাধারণের ভাবগ্রাহ্য জগতে দৃষ্টি ফেরাতে বলেছেন, দিলীপকুমার তেমনি নতুন প্রচলিত গানের বিভিন্ন রূপ ও রসের মৌলিক ব্যা'্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে অনেকটাই লৌকিক রীতির দিকে আকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, দিলীপকুমার সে স্থলে নতুনের বৈচিত্র্য-সন্ধানী এবং গায়কীর তাৎপর্য নতুন করে ব্যাখ্যা করেন। দুজনার দৃষ্টিতে একটি লক্ষ্য বর্তমান, বাংলার প্রচলিত সংগীতের মূল একই সংগীতের মাটিতে প্রোথিত। তাকে বুঝতে হলে কাব্য ও সংগীতের ভিত্তি-ভূমি বোঝা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ মূল রাগ-সংগীতের কাঠামোর উপর আপনার ভাবের অনুসারে দেহ রচনা করেছেন। তাতে যে প্রতিমা দাঁড়িয়েছে গোড়ার দিকের গানগুলো রাগ-সংগীতের অনুরূপ হলেও প্রাণটি হয়েছে কাব্যানুভাব স্পন্দিত। দুয়ের মিলনে সুর-প্রতিমাও নতুন রূপে রচিত হয়েছে। এইজন্যে আলোচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আত্মভাব বিকাশের কথা ভেবেছেন, দিলীপকুমারের ব্যাখ্যা হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগবিকাশের পদ্ধতি-অনুসারী নয়, দিলীপকুমার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন অথবা এই দিকেই তাঁর লক্ষ্য। সংগীত প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের আলোচনা রাগ-সংগীত অনুসারী হলেও

সংগীতের সৌন্দর্যতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি-সম্মত বলা চলে। রাগ-সংগীতের তাৎপর্য বিশ্লেষণে শ্রীদিলীপকুমার রায় যেমন নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন তেমনি প্রচলিত সংগীতের মুক্তির চিন্তাও তাঁর মধ্যে স্পষ্ট। লোক-প্রচলিত গানে ও নতুন কাব্য-সংগীতের সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'মেলডি'র প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি ভেবেছেন। একই সময়ে ধূর্জটিপ্রসাদ কলা ও দার্শনিকতায় বাংলা সংগীত আলোচনার ক্ষেত্র সমৃদ্ধ করেছেন।

সংগীতের প্রতি সমগ্র দৃষ্টির দিক থেকে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর দান বিশেষ বিবেচ্য। যদিও তাঁর রচনার সংগ্রহ ও মূল্যায়নের জন্যে আজও অপেক্ষা করতে হবে, তবু একথা বলা চলে যে প্রযুক্তি-সংগীতে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের ফলে বহু তথ্য ইনি যুক্তিবদ্ধ রীতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। অন্যদিকে প্রচলিত সংগীতের প্রতিও একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাতন্ত্র্য সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আলোচনায় পাওয়া গেছে। সংগীতের লক্ষণ অনুসারে সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিভাগেও এঁর কাজ অসামান্য। ইনি লোক-প্রচলিত সংগীত, বিশেষ করে লোক-গীতি সম্পর্কে নানা স্থানে নানা কথা বলেছেন। শুধু মতামত নয়, প্রযুক্তি সম্বন্ধেও তাঁর অভিজ্ঞতা ও গবেষণার একটি স্থায়ী মূল্য আছে। বাংলা লোক-প্রচলিত সংগীত সম্পর্কিত তাঁর বহু মতামত আকাশবাণীর সংগীতের শ্রেণীবিভাগে ও প্রযোজনার মধ্যে আইডিয়া হিসেবে ক্রিয়াশীল ও প্রচ্ছন্ন আছে। লোক-প্রচলিত সংগীত সমালোচনার দিক থেকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র। এঁর রচনার মূল্য অসামান্য। এক দিকে যেমন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও তথ্য প্রয়োগ অন্যদিকে আজকের সংগীতে গঠন-প্রকৃতির প্রতি মৌলিক দৃষ্টির মূল্য অনস্বীকার্য। প্রাক্-আধুনিক যুগের সংগীতের ঐতিহাসিকতা বাংলা-সংগীত আলোচনায় বিশেষ স্থান লাভ করেছে। রাগ-সংগীতের মূল্যবান গ্রন্থগুলোর অনুবাদ ও টীকা অনেকস্থলে প্রচলিত ধারণার উপর আঘাত হেনেছে।

রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনেকেই করেছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রযুক্তি-রীতি-অনুসারী রচনার মূল্য সমধিক। তথ্যের প্রাচুর্য শ্রীশান্তিদেব ঘোষের রচনা রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ অভিজ্ঞান। ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর কয়েকটি বক্তব্য রবীন্দ্রসংগীতের উপর প্রবল আলোক-সম্পাত করেছে। তাছাড়া শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য ব্যাপক ও দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিক। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা—বিশ্লেষণ-মূলক। স্বামী শ্রীপ্রজ্ঞানানন্দের রবীন্দ্র-

সংগীত-আলোচনা রাগভিত্তিক ও দার্শনিক। রবীন্দ্র-সংগীতের অন্যান্য আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বহু প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন এবং এঁর বক্তব্যও সুদৃঢ়। শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যকে মিলিত করে ব্যাখ্যা করেছেন।

লোক-প্রচলিত সংগীতের আলোচনার যে প্রচেষ্টা এই গ্রন্থে আছে, তাতে সমর্থিত ধারণাগুলোর ক্ষেত্রেই উল্লিখিত নামের অবতারণা করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রচলিত সংগীতের বহু আলোচনা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। লৌকিক-সংগীতের তথ্যের দিক থেকে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের রচনা বিশেষ মূল্যবান। এমন সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক তথ্য বিশ্লেষণ না হলে আজও বহু ক্ষেত্রে লোকগীতির রূপ বুঝে নেওয়া দুঃসাধ্য হত। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বাউল সম্প্রদায়ের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল, তাই বাউলের সুর ও ছন্দ রবীন্দ্রসংগীতে স্বতঃই উৎসারিত হয়েছে। বাউল গানের তথ্যসমৃদ্ধ রচনার অভাব বাংলায় নেই। মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের মূল্যবান সংগ্রহ এবং ডক্টর উপেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্যের কাজ এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ ধরণের কাজের উৎস সন্ধান করতে গেলে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের কথা স্মরণ করা দরকার। লোকগীতির বস্তু ও তথ্য দীনেশচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য ও রূপ পরিচিতির দিক থেকে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের সম্প্রতি প্রকাশিত সংগ্রহও প্রশংসনীয়।

সমসাময়িক সংগীতের বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে এবং রাগ-সংগীতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর আলোচনা ও বক্তব্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও উত্তর-রবীন্দ্র যুগের গীতকারদের সম্বন্ধে নানা প্রসংগে শ্রীচৌধুরীর বক্তব্য মৌলিক। সংগীত-আলোচনায় শাস্ত্রীয় সংগীতের উপরে যাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ কিন্তু বর্তমান গানের উপরেও যাঁরা ভাবনার আলোকপাত করেছেন বা করছেন তাঁদের কথা উল্লেখ করা হল। রাগ-সংগীতের দিক থেকে, মূল তত্ত্ব ও তথ্যের ঐতিহাসিক ও আঙ্গিকের আলোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে লোক-প্রচলিত গানের সমস্ত প্রকার রচনার বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া দরকার—রাগ-সংগীত বিশ্লেষণের পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র রকমের। আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই নানা প্রসঙ্গে এ পথ দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগত সংগীত সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা এই দৃষ্টিভঙ্গিরই নামান্তর। রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি যেমন তাঁর রচনা

সম্বন্ধে পরিচিতি দান করে তেমনি সমসাময়িকদের রচনা সম্পর্কেও খাটে। সুরকারের রাগসংমিশ্রণ, পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের প্রসঙ্গগুলো রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িকদের সম্বন্ধে সমানভাবেই প্রযোজ্য। লোক-প্রচলিত সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি নতুন যুগের সৃষ্টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্য রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সুরজগতের প্রথম বৃত্তপথ, যেন নতুন সৌরমণ্ডলের রূপরেখা স্পষ্ট করে দিলেন।

৫

লোক-প্রচলিত লঘু-সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান-রূপে প্রকাশিত হওয়ার মূলে যে কয়েকটি ধরণের প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে সংগীত-রূপকে নির্দিষ্টরূপে পরিপুষ্ট করেছে, গোড়ায় সে কথা উল্লেখ করা দরকার। প্রথমেই রঙ্গমঞ্চের কথা উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান শতাব্দীর তিন দশক পর্যন্ত নাটকের গান প্রবল ভাবে জনসাধারণের কানে এসেছে এবং মুখে মুখে ফিরেছে। এখানে গিরিশ ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলির উল্লেখ করা দরকার। আধুনিক গানের আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত নাট্যশালার গানগুলো বর্তমান যুগের সূচনায় যোগ দিয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষ ধরণের রচনার মূল উৎস রবীন্দ্রনাথের নানা ধরণের নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলোর ভঙ্গিতে উদাত্ত কণ্ঠের স্বর-সংযোজন নাট্য-প্রয়োজনেই হয়েছিল। আধুনিক যুগে নাট্যগীতি রূপান্তরিত হয়ে বিচিত্র চিত্র-গীতিতে যন্ত্রের অনুষঙ্গে নব কলেবর ধারণ করেছে। চিত্রগীতির বহু ধরণের পরীক্ষণ নিরীক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা আজ বহুমুখী হয়েছে।

কিন্তু প্রচলিত গানের প্রচার, প্রসার এবং প্রভাবের মূল কেন্দ্র গ্রামোফোন রেকর্ড। গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশ সাধারণের রুচি ও রসবোধ সজাগ করেছে। বিগত চল্লিশ বছরে অপ্রত্যক্ষে বহুভাবে সংগীত-রীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ এই পরীক্ষা। নতুন ভঙ্গির আমদানী, নতুন ধরণের রচনা, অন্য দেশ থেকে সুর সংগ্রহ, লৌকিক ছন্দ ও সুরকে নতুন রচনায় প্রয়োগ, নাট্য ও ফিল্ম সংগীতকে লোকসমাজে প্রচার, মৌলিক রাগ-সংবদ্ধ বাংলা গানের প্রচার, কণ্ঠভঙ্গির বহুতর কায়দার উদ্ভাবন, যন্ত্র-সংগীতকে লোক-সমাজে প্রচার, যন্ত্র-সংগীতের নানারূপ ব্যবহার, বাদ্য-বৃন্দকে

জনপ্রিয় করা, পল্লীসংগীত ও ধর্মীয় গীতির প্রচার—এই সব কাজই গ্রামোফোন কোম্পানী তাদের ব্যবসার জন্যে করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণের রুচি ও রসবোধের দাবী এবং বহু গুণী ও স্রষ্টার মনও এর পেছনে একযোগে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এই সম্পর্কে অনেকের সম্বন্ধেই স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করলে সংগীত বিকাশের তথ্য পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, নজরুলের সংগীতের বিশেষ স্ফুরণ হয়েছিল গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্যে রচনার উপলক্ষে। গীতকার এবং বিশেষ করে সুরকারের একটা কর্মপন্থা সৃজনে রেকর্ড কোম্পানীগুলো ব্যবসার অতিরিক্ত ভাবনার পথ তৈরি করেছিল, স্বীকার করব। শিল্পীর প্রতিভার বিকাশের সহায়ক হয়েছিল গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত সংগীতের পরিবেশ।

কিন্তু আর একটি প্রতিষ্ঠানের কথা এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের দানের সঙ্গে তুলনীয়। লোক-প্রচলিত গানের বহুতর পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলভোগ করেছেন সর্বসাধারণ। সংগীত-শিক্ষা সম্পর্কিত ধাপ পার হয়ে যখন এই বিশ্ববিদ্যাক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট হওয়া যায় তখন এখানে সংগীত-শিল্প সম্বন্ধে নানান রূপ ও ভাবনা এবং সংগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করা যেতে পারে। তাছাড়া সংগীত-প্রযুক্তির এই একটি মাত্রই সজীব ক্ষেত্র। এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেয় না, শিক্ষাদান এর লক্ষ্যও নয়, যদিও শিক্ষা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা এখানে অবহেলিত নয়। সংগীত-রূপকে নানা ভাবে প্রাণবন্ত করে তোলা এবং নবরূপদানে সাহায্য করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। শ্রোতাসাধারণের দাবী অনুসারে বহু বিচিত্রতার সমাবেশ এখানেই সম্ভব। অর্থাৎ আকাশবাণীর কথাই এখানে উল্লেখ করছি। একটু তলিয়ে দেখলে আকাশবাণীকে এভাবেই ভাবতে হবে। বহুজনের ভাবনার দান এখানেই সঞ্চিত হয়, তাই বিশেষ করে লোক প্রচলিত নানান সংগীতরূপ সংগীত-সংরক্ষণের এ বিশ্ববিদ্যাক্ষেত্র বিশেষ প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান। সর্বসাধারণের সংগীত-জীবনের সঙ্গে সামাজিক ভাবে সংশ্লিষ্ট বলেই সংগীত সমালোচনার প্রধান উপজীব্য হয় আকাশবাণীর অনুষ্ঠানগুলো।

বর্তমানে প্রচলিত বাংলা গানের রীতি-পদ্ধতি অভিব্যক্ত হয়েছে স্পষ্ট ভাবেই গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রচার প্রসার এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংগীত-অনুষ্ঠান প্রচারের গোড়া থেকে। এই শতকের ত্রিশ দশক থেকে প্রচলিত বাংলা গান স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করে। রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, রজনীকান্ত,

অতুলপ্রসাদের সুর কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করেছে। বহু যুগান্তকারী গান জনচিত্ত মুগ্ধ করেছে এবং শ্রোতার সংগীত-চিন্তাকে প্রবুদ্ধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-সংগীতও লোকালয়ে প্রবেশ করেছে। এ সময়ে নজরুলের উদ্ভব। উনিশশো ত্রিশ সালের পূর্ব থেকেই এই প্রস্তুতি একটি নতুন উৎপাদনের ক্ষেত্র তৈরি করল। সেই সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ড ও তদানীন্তন অল ইণ্ডিয়া রেডিও প্রচলিত সংগীতের প্রচার ও প্রসার সহজভাবেই করতে আরম্ভ করেছিল। ব্যবসার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির মূলে ছিল, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গে রুচি ও রসবোধের প্রসার ও ব্যাপ্তি অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো। এই পরিবেশ সৃষ্টির মাহেন্দ্রযোগ উনিশশো তিরিশের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কয়েক বৎসর। অর্থাৎ এ সময়ে থেকে বর্তমান সংগীত-ধারার শুরু, বিশেষ ভাবে আধুনিক বাংলা গানের প্রচলন লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই সম্পর্কে ১৯৩৮ সালে 'সাংগীতিকী'গ্রন্থে দিলীপকুমার রায়ের একটি উক্তি স্মরণীয়। অজয়কুমারের একটি গান শচীন দেববর্মনের মুখে শুনে বলছেন, "আধুনিক বাংলা গানের মধ্যে একটা নব স্পন্দন, নব আকৃতি যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। বর্ণনা করে এ স্পন্দনের আভাষ দেওয়া অতি কঠিন কাজ—কারণ, এ আলো ভবিষ্যতের অগ্রদূত, যার শুধু পুর্বচ্ছটাই আমাদের গোচর হয়েছে—অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণে আকাশ রাঙিয়ে ওঠার মতন।"

বর্তমান সংগীত শিল্প-সচেতন হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ গানের অভিব্যক্তিকেই সকল দিক থেকে শ্রীসম্পন্ন করবার চেষ্টা আধুনিক যুগেব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। যে রকমের গানই হোক, নিতান্ত সহজ সরল একঘেয়ে পল্লীগীতি অথবা ব্যক্তিনামাঙ্কিত গান (অর্থাৎ, রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল) হোক, গানকে প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ যন্ত্রসংগীত সহযোগিতা এবং গায়কী ভঙ্গি ও সুর-উচ্চারণের পদ্ধতির দ্বারা কলা-সমন্বয়ের কৌশলে রূপদান করা এ যুগের বৈশিষ্ট্য। গ্রামে গ্রামে পালা-কীর্তন যাঁরা শোনেন, গ্রামোফোন রেকর্ডে কৃষ্ণচন্দ্র দের কীর্তন যদি তাঁদের শোনান হয় তাহলে তাঁদের কাছেও সংগীতের আর একটি জগৎ স্পষ্ট হবে। গানের রীতি কলাসমন্বিত হয়ে পড়েছে কৃষ্ণচন্দ্র দের গানে, গান গাইবার পদ্ধতি, অংশবিশেষ ছাঁটাই (editing), সুরসংযোজনায় সামান্য অদলবদল এবং সুর প্রযোজনাও সঙ্গতিপূর্ণ করা দরকার হয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই এই প্রয়োগের পরিমিতি-বোধ ক্রিয়াশীল। যেন প্রচলিত পালা কীর্তন থেকে কলাকৌশলে

এ সংগীত স্বতন্ত্র। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। খুব সোজাসুজি একজন সমালোচকের কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কথাটি পল্লীগীতি ও কীর্তন সম্বন্ধে। "অমার্জিত কণ্ঠের একটা নিজস্ব আবেদন আছে, তবে সাধা গলার আবেদন থেকে তা বড় নয়।" এই উক্তিটি গানের মৌলিক আবেদনকে অস্বীকার করে না, কিন্তু সুরজ্ঞান-সমন্বিত কণ্ঠের গানের শিল্পসমন্বিত প্রকাশ গানকে সুষমামণ্ডিত করে—এ কথাই স্বীকার করে।

বর্তমান লোক-প্রচলিত সংগীতের আলোচনায় এই পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রেখে নানা প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে প্রস্তাবিত হচ্ছে। লোক-প্রচলিত লঘুসংগীত, লোকগীতি এবং অন্যান্য ধরণের গানের তথ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধান করা হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রশ্ন থেকে আরম্ভ করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য চিন্তাও উত্থাপিত হয়েছে। যে কোন শিল্প আলোচনায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যকে জানা প্রয়োজন হয় সকলের আগে, শিল্পবোধের প্রথম ধাপেই ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ। ব্যক্তিনামাঙ্কিত যে সব গান স্বতন্ত্রভাবে বাংলায় চালু আছে, সে সব গানের বৈশিষ্ট্য কি—এ জিজ্ঞাসাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষণের শেষে কিছু কিছু সূত্র খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি। আজকাল সংগীত-সমালোচনায় শিল্পরীতি সম্বন্ধে নানান জিজ্ঞাসা এসে ভিড় করে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত রাগ-সংগীতের সূত্রদ্বারা চলিত গান বুঝে নেওয়া যায় না। সেজন্যেই রবীন্দ্র-সংগীতকে বুঝবার জন্যে বহু সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রতি আলোচনার শুরু বিশেষ প্রশ্নকে উপলক্ষ করে। এই প্রশ্ন-গুলোকে অবহেলা করা চলে না। আজকালের লোকসংগীতকে সত্যিকার লোকসংগীত বলা যাবে কি না? আধুনিক গানকে চলচ্চিত্রের গানের লঘুতম অভিব্যক্তি থেকে বাঁচাতে হবে কি না?—এ সব প্রশ্নও মুখে মুখে ফেরে। জনৈক সংগীত-সমালোচকের সুচিন্তিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "বাংলা গানের শেষ পর্যায়ে নতুনতর রীতির প্রচেষ্টা চলেছে। আমার কাছে মনে হয়েছে শচীন দেববর্মনই বাঙালীর গানের শেষ দিক্‌পাল, অজয় ভট্টাচার্যই শেষ গীতিকার এবং হিমাংশু দত্ত শেষ উল্লেখযোগ্য সুরকার। [উক্তিটি অত্যন্ত একপেশে এবং বিচারের অপেক্ষা রাখে।] কথাটা ক্ষোভের সঙ্গেই মনে হচ্ছে—বর্তমান সময়ের আধুনিক সংগীতের রুচিবিকৃতি ও ভাবের অপদার্থতা ও দৈন্য দেখে, সুরের যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতার কথা ভেবে।" এঁদের লেখক আধুনিক সংগীতের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উপস্থাপিত করেছেন,

এবং লক্ষ্য করেছেন যে সংগীত-জগতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চাঙ্গ-সংগীতের পৃষ্ঠপোষকরা আধুনিকতার বহু বিকৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। অর্থাৎ যদি প্রতি পদক্ষেপে লোক-প্রচলিত সংগীত সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করা যায় তবে বিরুদ্ধ-চিন্তার স্তূপ লোক-প্রচলিত সংগীতকে ভাল করে জানার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এই গ্রন্থের পূর্বভাষে যে কথা বলতে চেষ্টা করেছি তাকে এখানে আবার সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক: এই গ্রন্থটিতে আছে লোক-প্রচলিত সংগীতের রূপ অনুসন্ধানের কাজে কিছু তত্ত্ব ও সূত্রের আলোচনা। বিশেষ কয়েকটি প্রশ্ন থেকে প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা হয়েছে। লোক-প্রচলিত সংগীত বলতে রাগ-সংগীতের সীমানার বাইরে সকলপ্রকার সংগীতকে ধরে নেওয়া হয়েছে, যাকে আঞ্চলিক বা লঘু সংগীত বলে নানা ভাবেই প্রকাশ করা হয়। [শ্রীদিলীপকুমার রায় 'সাঙ্গীতিকী' গ্রন্থে লোক-প্রচলিত সংগীতের প্রসঙ্গটির নাম দিয়েছেন "দেশী সংগীত", এবং বলেছেন, "দেশী সংগীতের মহিমা বিচার করতে হলে মার্গসংগীতের রুচিগত পক্ষপাত থেকে সব আগে মুক্তি চাইতে হবে।"] লোক-প্রচলিত লঘু সংগীতের উদ্ভব স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাকৃত বা দেশী-সংগীত থেকে। এজন্যে রাগ সংগীতের তত্ত্ব ও সূত্র দ্বারা লোক-প্রচলিত সংগীতকে বুঝতে যাবার পথে যথেষ্ট বাধা আছে। কিন্তু, প্রসংগক্রমে রাগ-সংগীত মৌলিক ভিত্তিভূমি বলে তাকে অনেক আলোচনারপ্রসঙ্গেই প্রয়োজন। লঘু সংগীতকে তাৎপর্য আরোপ করে বুঝতে চেষ্টা করবার পথ সুগম করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজের আলোচনায়। তা ছাড়া যদিও অনেক স্থলেই আলোচনা নানাভাবে সংমিশ্রিত হয়ে আছে, কিন্তু কিছু সমালোচকের রচনার মধ্যে সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। লোক-প্রচলিত বর্তমান সংগীত-ধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে উনিশশো তিরিশের সময়কাল থেকে বাংলা গানকে বিশিষ্টরূপে শ্রেণীবিভাগ করে বোঝা যেতে পারে। এই সময় থেকে বিশেষ কারণেই বাংলা গানের রাজ্যটাকে স্পষ্টভাবে শ্রেণীবিভাগ করে নেওয়া যায়। আলোচনার মধ্যে এই ধারণাটিকেও কেন্দ্র করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উনিশশো তিরিশের পূর্বধারা

উনবিংশ শতকের বাংলা গান রচনাকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে, সম্পূর্ণ ধ্রুপদ-প্রভাবিত গান। এই গানের মূল অনুসন্ধান করতে গেলে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বিষ্ণু চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উল্লেখ করা দরকার। এঁরা সকলেই ধ্রুপদের রূপটির উপর জোর দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে টপ্পা-প্রভাবিত রীতি বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত রচনাকে রঙে ও রসে ভরপুর করে। এই গানের গোড়ায় ছিলেন নিধুবাবু। একথাও স্বীকার্য যে অন্তঃসলিলা গীতধারা গ্রামে গ্রামে কীর্তন, নানান ধর্মীয় গান এবং বহু ধরণের বিভিন্ন আঞ্চলিক পল্লীগীত যেভাবে রচিত হয়ে আসছিল—এই দুটো ধারা তা থেকে স্বতন্ত্র।

তৃতীয় পর্যায়ের রচনার মূলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরচিত গান ছাড়াও অন্যের রচিত গানে সুর সংযোজনা করবার কায়দা তাঁরই চেষ্টায় প্রথম উদ্ভাবিত হয়। সংগীতে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। যন্ত্রের ব্যবহারে মৌলিকতা আসে। নাট্যগীতি প্রযোজনার বিশেষ কায়দা সম্বন্ধে ইনি ভাবেন। হিন্দুমেলার উৎসবে যে স্বদেশী গানের উদ্ভব হয় এরও মূলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ প্রথম ও তৃতীয় পন্থায়। রাগসংগীতকে তিনি গানের ভিত্তিভূমি করেন, এর ওপর সুরকলি সৃষ্টির পন্থা উদ্ভাবন করেন। অন্যদিকে লোকসংগীতের উপরেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। টপ্পারীতি রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়েছিলেন, এবং সুর রচনার পথ তিনি বহুদিকেই প্রসারিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সমসাময়িক রচয়িতারা প্রায় অনুরূপ পন্থায় সংগীত রচনা করেন। এঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিভঙ্গী ও গীতরচনার ক্ষেত্র সীমিত ও স্বতন্ত্র ছিল, বর্তমান সংগীত-রচনা-পদ্ধতির ধারা থেকেও এঁরা সকলেই ছিলেন স্বতন্ত্র। অথচ এঁদের রচনার মৌলিকতাও অনস্বীকার্য। সংগীতের দিক থেকে রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে যাঁদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের মত তেমন মৌলিকতা

ও বৈচিত্র্য না থাকা সত্ত্বেও যাঁদের কথা বা গীতির ভাব-সম্পদ শ্রোতার মন কেড়ে নিয়েছিল তাঁরা হলেন :

দ্বিজেন্দ্রলাল—১৮৬৩—১৯১৩

রজনীকান্ত—১৮৬৫—১৯১০

অতুলপ্রসাদ—১৮৭১—১৯৩৪

বর্তমান শতাব্দীর তিরিশ দশকের পূর্ববর্তী সংগীতরীতিতে, রবীন্দ্রনাথকে ধরে, এই চারটি ব্যক্তিত্বের নিদর্শন স্পষ্ট, যদিও এর মধ্যে অতুলপ্রসাদ আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রনাথের মতই সম্প্রসারিত। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গীতিপরিমণ্ডলটি পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়ে গেছে। শুধু বলা যেতে পারে যে ১৯৩০-এর পরও রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন সুর প্রয়োগের ও নতুন রচনার অভাব নেই এবং তখনও তিনি এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষাও যথেষ্ট করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে কালজয়ী।

প্রায় এ সময় থেকেই বিশ্বভারতীর অদূরে স্বরলিপি-নির্ভর রবীন্দ্রসংগীত গ্রামোফোন যোগে ও রেডিও মারফতে বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচর্যায় প্রচারিত হতে থাকে। গানে যন্ত্রের সহযোগিতাও বিকাশ লাভ করে। এক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর স্বকীয় গীতরীতি থেকে কিছু স্বাতন্ত্র্য শিল্পীদের মধ্যে এসে পড়ে। এ স্বাতন্ত্র্য অবশ্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গৌণ। অন্যান্য গানের সঙ্গে এসময় থেকেই আধুনিক গানেরও সুরু। এই নতুন ধারায় আসেন নজরুল ইসলাম একদিকে গীতিকার অন্যদিকে সুরের কারবারী হয়ে। ধারাটি আধুনিকের প্রথম পর্যায়। শুধু আলোচনার সুবিধের জন্যে আধুনিক গানের এই পূর্বধারার কথা উল্লিখিত হল। আজকের নতুন পরিবেশে শ্রোতার দাবী মেটাবার জন্যে গীতরীতি যে বিচিত্রভাবে বিকশিত হয়ে এসেছে তাকে বুঝতে হলে তিরিশ দশকের পরবর্তী ধারার বিশ্লেষণ করা দরকার। উনবিংশ শতকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছু কিছু অন্যের রচনায় সুর সংযোজনা করেছিলেন। নাটকের সংগীত রচনায় গিরিশচন্দ্রের গানের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একজনের গান রচনায় অন্যের সুর প্রয়োগের কায়দায় নাট্য-সংগীতের বিশেষ রূপের প্রকাশ হয়। উনিশশো তিরিশ থেকে সংগীত আলোচনায় এরূপ সুরকার ও প্রযোজকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্র-সংগীতের সুসংগতি সৃষ্টি এবং সংযোগিতা, যন্ত্রকে ভাবপ্রকাশের মর্যাদা দান—বর্তমান ধারার প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু উনিশশো তিরিশের পূর্বধারার লক্ষণগুলো কিরকম? গীতিরচনার এই মূল প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের আলোচনাও দরকার। এই প্রসঙ্গে সংগীতের ইতিহাসের দিকে না গিয়ে রীতি বর্ণনা করা বিধেয়। বাংলা গানের ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে গানের মধ্যে দুটো বিশেষ লক্ষণ বিভিন্ন সংগীতকে রূপদান করে। একটি বিষয়বস্তু-প্রধান এবং অন্য একটি শিল্প-প্রধান বা কলা-সমন্বিত। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য কথাটি অর্থে—যে গান সুরকে অবলম্বন-মাত্র করে নেয় এবং ভাব এবং কথাবস্তু যে গানের বিশেষ লক্ষ্য থাকে, সে গানের কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকার জন্যে সুর-প্রয়োগের মৌলিকতা গৌণ হয়ে যায়, অর্থাৎ নিছক একটি উদ্দেশ্যের জন্যে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সুর প্রয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সুর বাঁধাধরা পথেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে ছন্দ হয় সংগীতের প্রধান অবলম্বন। এ ক্ষেত্রে লোকগীতি অথবা কীর্তনের কথা উল্লেখ করা যাক। বিষয়বস্তু কীর্তনের প্রধান আকর্ষণ। ভাগবতের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই মূল, বৈষ্ণব ভাবধারার সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে বেশিক্ষণ এবং অভিনিবেশ সহকারে কীর্তন শোনা যায় না। লোকসংগীতে একটি সুরের একঘেয়েমি থাকে। সুরের একঘেয়েমিকে অতিক্রম করিয়ে দেয় স্বভাবসুলভ কণ্ঠ ও সরল ভাবধারা। বিষয়বস্তুই এই গানগুলোর প্রধান আকর্ষণ। বিশ্লেষণ করলে এসব গানের সুর-প্রকৃতি নানাদিক থেকেই বর্ণনা করা চলে। কিন্তু তবু পরিসর অত্যন্ত সীমিত। কীর্তনের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগেই কৃষ্ণ-কথাকে নাটকীয় রূপ দান করবার জন্যে পালাগানে প্রচার আরম্ভ হয় এবং পৌরাণিক কাহিনীকে সুরে অভিব্যক্তির জন্যে একটা বিশেষ গায়ন-পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। কীর্তনের মূল প্রেরণায় যে সহজ ও স্বাভাবিক ভাব আছে রাগসংগীতে তা নেই। কিন্তু রাগসংগীত দ্বারা এর সুর-সৃষ্টি প্রভাবিত হয়েছে। রাগের রূপ অনুসরণ করবার রীতিও এতে অনুসৃত। কিন্তু বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা এর মূল লক্ষ্য থাকায় লৌকিক প্রকাশভঙ্গি এর বাহন। কোথাও রাগসংগীতের প্রভাব বিস্তৃত হলেও বক্তব্য বিষয়ে সহজ ছন্দের হিল্লোল এবং কথা অংশের প্রাচুর্য এক বিচিত্র ভাব-জগৎ সৃষ্টি করে। ছন্দ-ভঙ্গির কাঠামোটিও বাঁধা।

বৈষ্ণব ধর্মের ভাবস্রোত এক সময় সমস্ত বাঙালী-সমাজকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বহু-প্রসারী ভাব-ভক্তির নানা অলিগলি সৃষ্টি হয়েছিল। পরে রাগরাগিণী ও তালের বৈচিত্র্য নাট্যভঙ্গিতে যুক্ত হয়, পালাগানের প্রকাশে বিশিষ্ট গীত-রীতির

সৃষ্টিও হয়। সেগুলোর বিকাশে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে (রেণেটি, মনোহরশাহী, গরাণহাটী প্রভৃতি)। কীর্তন গানের এই সমস্ত বিশিষ্ট ভঙ্গিকে কীর্তনীয়া মাত্রেই স্বীকার করবেন। সুর প্রকাশের কয়েকটি রূপ কীর্তনের নিজস্ব সংগীত-প্রতীক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সুরের চেয়েও অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় বিশেষ ভাবে ছন্দের দিকটা বেশি বিকাশ লাভ করে, সুর তাকে অবলম্বন করে। সুর বা রাগ ইত্যাদি, বহু তাল, বাক-রচনাপদ্ধতি—কথা, আখর প্রভৃতির ক্রমবিকাশেই প্রয়োগ করা হয়। কাজেই লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, কীর্তনে বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই মুখ্য। সংগীতের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগ করে যে কোন গায়ক কীর্তনকে চমকপ্রদ করে তুলতে পারেন, সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে পরিপুর্ণতা দান করতে পারেন, কিন্তু কীর্তনের বিষয়বস্তুর সার্থকতা ও ভাবসৃষ্টি শুধুমাত্র সুরের শক্তিতে না-ও সম্ভব হতে পারে। এই বক্তব্যের দ্বারা এমন কথা বলা হয় নি যে সংগীতের মূলগত আকর্ষণী শক্তিকে কীর্তন অবহেলা করে, অথবা melody'র পরিপুর্ণতা কীর্তন দাবী করে না অথবা সুকণ্ঠ এবং মধুরতম সংগীতরস এর উপাদান হতে পারে না। সংগীত মাত্রেই এসব দাবী করে। কিন্তু মূল লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে কীর্তনের পরিমণ্ডল ও ভাবজগৎটিকে বড় করে ধরা দরকার হয়ে পড়ে। এরপর বাস্তব ক্ষেত্রে যা ঘটে সে কথাই বলা হচ্ছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে উক্তির পক্ষে প্রমাণ। একাধিক কীর্তন গানের আসরে দেখেছি, সুরের বৈচিত্র্য ও কণ্ঠের ঐশ্বর্যের চেয়ে শুধু প্রকাশভঙ্গি ও ব্যক্তিগত ভাব-প্রকাশের ব্যক্তিত্বের দ্বারা কীর্তনীয়া মন কেড়ে নিয়েছেন। সেরা কীর্তনগায়কের কাছে অনেক সময়ে দেখা যায়, বোধ হয় কণ্ঠের ঐশ্বর্যের তেমন দাম নেই, যেমন অধিকাংশ কীর্তন-শ্রোতার কাছেও নেই, কারণ সুকণ্ঠই কীর্তনের প্রধান গুণ নয়, কণ্ঠের অতিরিক্ত আর একটি ভাবজগৎ ও মনোজগৎ আছে, সেখানকার আবেদন পুর্ণ না হলে সত্যিকার কীর্তন গান হয় না। বিষয়বস্তু ও ভাবজীবনটা সেখানে বড় এবং সে প্রয়োজনে সুরের প্রয়োগ করে তাকে বেগবান করবার জন্যেই কীর্তনে সংগীতের প্রয়োজন। কীর্তনসংগীতের দিকটা আয়ত্ত করা খুব সহজসাধ্যও নয়, কিন্তু এই সংগীতরীতির উৎপত্তির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিষয়বস্তু, সেজন্যে সাধারণতঃ গায়কের কণ্ঠভঙ্গির সাধনার প্রতি লক্ষ্য থাকে না।

পল্লীগীতির মূলেও ঠিক এই রূপেরই সন্ধান মিলবে। বিষয়বস্তুকে গৌণ করে পল্লীগীতির অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, বরং সে স্থলে সুরের ক্ষীণরেশ

অথবা সামান্য একটু সুরের সূত্রে বেঁধে কথাকে দাঁড় করানো যেতে পারে। পল্লীগীতির সুর রচনায় কোন আইন নেই, পল্লীর আবেদনই সেখানে বড়, সে আবেদন কথা-নির্ভর। বিশিষ্ট ধরণের উচ্চারণ, আঞ্চলিক শব্দের রূপ এবং এমন কি আঞ্চলিক ভঙ্গিও এই কথার প্রাধান্য প্রমাণ করে। অন্যদিকে দেখা যায় এক একটি বিশেষ সুরের ভঙ্গি নিয়ে এক একটি ভৌগোলিক গানের রীতিও চালু হয়।

সাধারণ প্রচলিত সুরকে অবলম্বন করে রামপ্রসাদের একটি সংগীত-রীতি আঞ্চলিক গানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-নামাঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু আজ এ সব সুর পরিচিত হলেও এগুলোতে বিষয়বস্তুর এবং বক্তব্যের ছবিটি স্পষ্ট করে ধরা দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সুরের ছক তৈরী হয়ে গিয়েছে, সুরের প্রয়োগ-রীতিতে প্রথমে কোন অতিশয় শিল্পভাবনা ক্রিয়াশীল হয় নি। আজ অবশ্য অনেকক্ষেত্রে এ গানের মধ্যেও শিল্পবোধের প্রয়োগ চলে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই গানের মূল উপজীব্য বিষয়বস্তু, গানের আবেদনও তাই। মৌলিক পল্লীগীতিতে সুরের কলাসম্মত প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই, কোথাও হয়ত সুর প্রয়োগে পরিমিতি বোধ থাকে না। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? যেমন বিশিষ্ট কীর্তনীয়া ভাঙা গলায় হয়ত সুরের সত্তা ঠিক না রেখে গান করলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত সুরের তেমন মেরুদণ্ডও রইল না, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গি এবং ছন্দ ও গায়কের প্রসাদগুণের জন্যে ভাবে গলে গেল কীর্তন-শ্রোতার সমাজ—এমন অভিজ্ঞতাও বিরল নয়। একই কথা বলা চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক গীতি সম্বন্ধে।

এ বক্তব্যটিকে আরও স্পষ্ট করে বলা যাক। বিষয়বস্তু-প্রধান গানকে কলা-রূপ দান করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু এ গানের মূল উপজীব্য হচ্ছে কথা, এর কেন্দ্র হচ্ছে ভাবনার একটি স্বতন্ত্র জগৎ। সেই ভাবনাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ, কীর্তন ইত্যাদিতে মূল লক্ষ্য হল পারমার্থিক জগৎ, পল্লীগীতি ইত্যাদিতে পারিপার্শ্বিক জগৎ ও তার আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। আমরা যখন এসব ধরণের গানে কলানৈপুণ্যের অনুসন্ধান করি, তখন আমাদের বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি যায় বদলে। সৃষ্টির মূল ভিত্তিভূমি থেকে আমরা এগুলোকে অন্য একটি মর্যাদাসম্পন্ন প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে মূল্যায়ন করি। আর্টের দৃষ্টিতে বিচার করা হয় বিষয়বস্তুতে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত না রেখে।

এবারে আসা যাক শিল্পপ্রধান গানের ক্ষেত্রে। এখানে রচয়িতার মূল লক্ষ্য

সংগীত—সংগীতের নির্বাচিত ও প্রযোজিত রূপ। অর্থাৎ সুরের জগৎ নয়, সযত্নে সংগৃহীত সুরের সঙ্গে কথার জগৎকে মিশিয়ে বৈশিষ্ট্য দান। এখানে কথা রচনায় নির্বাচন এবং বিভাজন যেমন কার্যকর হয়, তেমনি সুর-সংগ্রহে ও রচনায় সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনাও প্রয়োগ করা হয়। এ ধরণের গানকে বিষয়বস্তু-প্রধান (Thematic) না বলে কলা-সম্মত বা শিল্পরীতি-সম্মত বলা যায়।

রাগসংগীতের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে কথার স্থান নেই বললেই হয়। এই ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ 'অনির্বচনীয়' বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে বচনীয়তা লয় প্রাপ্ত হয়ে শুধু সুরই সে স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট ভাব হয়ত সুরের সত্তাকে বিস্তৃত করেছে, কিন্তু সে ভাব কোন Particular বা বিশেষকে নির্দিষ্ট করে না। শিল্প এই বিশেষের রূপ-লাভ না করা পর্যন্ত সংগীতে সৃষ্টি হয় সার্বভৌম ভাব। বিস্তৃত জীবন-আলোকে জগৎকে একটি কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ করা যায় না। নীল সমুদ্রের মহাবিস্তারের মত সে Sublime, কিন্তু একটি ঢেউ-এর মধ্যে যে গতি, রং ও রূপের ঐশ্বর্য, বিশেষের এই প্রকাশেই শিল্পকে চেনা যায়। সেই জন্যেই অনির্বচনীয়কে সম্পূর্ণ বচনীয় করে একটি পরিসরের মধ্যে তার একটি রূপ-সৃষ্টির মতোই হয় গানের শিল্পসম্মত রূপ। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে সমসাময়িক ও লোক-প্রচলিত-সংগীত ভাবনায় প্রয়োগ করলে বাংলা গানে কথার প্রাধান্য বুঝে নেওয়া যায়। রাগসংগীতকে কথার ছকে সার্থক ভাবে রূপদান স্বাভাবিক ভাবেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। এ গান রচনার কাল সুরু হয় বাংলা দেশে নিধুবাবুর টপ্পা রচনার সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে। নিধুবাবু পাঞ্জাবী টপ্পার অনুরূপ বাংলা টপ্পার সৃষ্টি করেছিলেন। শোরী, সারাসারের যে সব টপ্পা তৎকালে নিধুবাবু জানতে পেরেছিলেন, সেগুলো নগণ্য পাঞ্জাবী কথার ছকে বাঁধা ছিল। তাতে কথা শুধু সুর সৃষ্টির উপযোগী করে ব্যবহৃত ছিল। বাংলা গানে নিধুবাবু প্রেম-বৈচিত্র্যকে রচনার বিষয়বস্তু করে সুরের দিক থেকে যথোপযুক্ত টপ্পাভঙ্গি আরোপ করেন তাতে। এ ধরণের রচনায় এতদিন বাঙালী অনভিজ্ঞ ছিল। যে রচনার উপজীব্য দৈনন্দিন জীবনের একটি ঘটনা ও আবেগ, সুরপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে তাকেই রূপায়িত করা অনির্বচনীয়তা থেকে বিশেষে সুরকে পৌঁছে দেবার জন্যে।

নিধুবাবুর পরিচিত গান 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে' উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অথবা শাক্ত-ভক্তি-সংগীত থেকে মুক্ত হয়ে অথবা

আধ্যাত্মিকতার বাইরে এসে এখানে গান রচনায় নতুন যুগের সূচনা হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথমে এর বিশেষ বিশ্লেষণ করেন ডক্টর সুশীলকুমার দে। আমরা এই সাহিত্যিক বা বিষয়গত ভাবনার দিকে যাব না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে 'সুরপ্রয়োগ'। টপ্পা গানের সুরবিস্তারের কায়দা সেকালে সাধারণ কানে অমিত মাধুর্যে ধরা পড়েছিল। টপ্পা গানের তানে স্বতঃস্ফূর্ত 'গিটকারী'—কণ্ঠের দ্রুত সুরসঞ্চরণ-ক্ষমতাকে ব্যবহার করবার যে প্রবণতা দেখা যায়, তাকেই প্রয়োগ করবার সুযোগ এল। টপ্পার এই ভাবভঙ্গিকে টুকরো টুকরো করে নিধুবাবুর এই কৌশল ব্যাপকভাবে অন্যান্য গানেও প্রয়োগ করা হল। শোরী মিঞার টপ্পার দীর্ঘায়তন গিটকারী ও তার বড় তানকে ছোট করা হল। টপ্পার সাধারণ রীতিতে সহজসাধ্য প্রচলিত রাগের ব্যবহার হয়ে থাকে, সেগুলো স্বাভাবিক ভাবে গায়ক ও শ্রোতামাত্রেই গ্রহণ করতে পারে। মূল টপ্পার গায়কী ভঙ্গিতে তাল প্রয়োগে কতকটা বিলম্বিত লয়ের প্রচলন ছিল, সে দিকটায় বাংলা গান কতকটা সরল করা হয়। ফলে টপ্পাভঙ্গির সহজ প্রকরণ প্রায় অনেক প্রকারের তদানীন্তন গানে প্রযুক্ত হল। এই সুর প্রয়োগের মানসিকতাই নতুন যুগের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের ফলে এ কথাই সপ্রমাণ হয় যে, বাংলা গানের বিষয়বস্তু-প্রধান রূপটি ধীরে ধীরে শিল্প-সমন্বিত প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বিষয়বস্তুর দিকে যতই দৃষ্টি থাক না কেন, সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সংগীত প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে লাগল। যে ক্ষেত্রে সুরের কথা ভুলে মানুষ মুগ্ধচিত্তে তন্ময় হয়ে আপনার ভক্তিভাব অথবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভাব নিয়ে গান শুনে মুগ্ধ হতো, এখন যেন অধিক পরিমাণেই সেই সুরের রাজ্যে প্রবেশ করা হতে লাগল। রাগরাগিণীর বাঁধাধরা রূপটিই ছিল পূর্ববর্তী অবলম্বন। এবারে একটু স্বাতন্ত্র্য এল। শ্রোতাকে অনেক পরিমাণেই সুর-রাজ্যের দিকেই এগিয়ে দেওয়া হল। সুর বলতে আমরা এখানে রাগ-প্রকৃতির কথা ভাবছি না। সুরের গুচ্ছ বা সমষ্টিগত তানবিন্যাসের সম্বন্ধে সচেতনতার কথাই ভাবছি। এ কাজটি একদিনে এক মুহূর্তে সুরু হয়ে যায়নি, বহু রচনা ও সংগীতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপান্তর ও নতুন সংযোজনার মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। বাংলা গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিণত পরিবেশ সুর-প্রয়োগ সম্বন্ধে আরও অধিকতর সচেতনতা এনেছে, নির্বাচন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা সজাগ হয়েছে। ব্রহ্ম-সংগীত ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য গান রচনা লক্ষ্য করলে একথা বোঝা যায়।

জ্যোতি দাদার পিয়ানো যন্ত্রে ওস্তাদি গানের প্রয়োগ সম্পর্কিত প্রসঙ্গে রাগের প্রকৃতিতে যে বিপ্লব ঘটতো সে উল্লেখ থেকেও একথা প্রমাণ হয়। এইভাবে সুরের ছোট ছোট সূক্ষ্ম সঞ্চারণের কায়দা সম্বন্ধে গায়কের সজাগ হবার চেষ্টা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই hypothesis বা প্রকল্প বা ধারণাটির সম্বন্ধে তথ্য উপস্থাপিত করবার সুযোগ নেই, কারণ একটি নির্দিষ্ট সময় অথবা নির্দিষ্ট সংগীতরূপকে ধরে দেওয়া যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা অনেকে এসম্বন্ধে সজাগ হয়েছেন। একদিকে যেমন ব্রহ্মসংগীত রচনায় সুরপ্রয়োগ সম্বন্ধে একটা নতুন ভঙ্গি এসেছে, তেমনি অন্যদিকে গীতিরচয়িতা নিজে সুর প্রয়োগের কাজে এগিয়ে এসেছেন। "বিষ্ণুর গাওয়া হিন্দীগান ভেঙে সত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রহ্ম সংগীত রচনা করেন" —হিন্দুস্থানী গানকে বাংলায় রূপান্তরের এই গোড়ার খবরটি তাৎপর্য মূলক। ১৮৯৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রকাশিত "স্বরলিপি-গীতি-মালা" আটজন গীতিকারের ১৬৮টি গানের স্বরলিপি প্রকাশ স্মরণীয় পদক্ষেপ। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে রঙ্গমঞ্চেও গানের প্রয়োগ দেখা গেল। এ সম্পর্কে আকার-মাত্রিক স্বরলিপিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা গীতি-নাট্যের কিয়দংশের স্বরলিপি প্রকাশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই কারণেই, গান বিষয়বস্তুপ্রাধান্য থেকে সুরসমন্বয়ের ক্ষেত্রে সাংগীতিক মুক্তি পেল। এখানে রবীন্দ্রনাথের সুররচনা, সুরনির্বাচন, প্রযোজনা এবং গীতিভঙ্গি-ভাবনা নিয়ে এ পর্যায়ের রচনার সুরু। এক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে সুরকলি রাগসংগীত থেকে চয়ন করে বাংলা গানে প্রযুক্ত হল।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের রচনার যুগে গানের বিষয়বস্তু রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে, নিছক ভক্তিভাব এবং পৌরাণিক প্রসঙ্গ থেকে গান—প্রকৃতি, মানুষ, জীবন, জীবনের বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ভাবাবেগকে কেন্দ্র করেছে। কিন্তু বিষয়বস্তুকে সংগীতমর্যাদায় উন্নত করবার জন্যেই এ সময় বাংলা গান রাগনির্ভর হয়েও সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে চিরাচরিত পথ থেকে স্বতন্ত্র পন্থা আবিষ্কার করে নিয়েছে। এই নতুন পন্থার জন্যে রাগসংগীতের কাঠামোতে লৌকিক সংগীত এবং চলিত কীর্তন-ভঙ্গিগুলোও এসে রচয়িতার সহায়ক হল। সুরশিল্পীর সৃষ্টিতে বিষয়কে পরিমার্জিত সুরপ্রতিমায় রূপান্তরিত করা হল এ-যুগে। অর্থাৎ বিষয়বস্তু

একেবারে গানের পুরোটাই অধিকার করে রইল না। রবীন্দ্রনাথ যাকে অর্ধ-নারীশ্বর বা কথা ও সুরের বিবাহের সঙ্গে বার বার তুলনা করেছেন, ঠিক সেই পরিণয়ের যুগ এল। যদিও এখানে কথা ও বিষয়বস্তু অপ্রধান রইল না, কিন্তু অনেক স্থলে সুর-প্রয়োগে নির্বাচন-ক্রিয়া প্রধান হল। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং আংশিকভাবে অতুলপ্রসাদ এ পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করি।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম পদক্ষেপ গানের কথায় পর্বযোজনা বা কলি বিভাগে এবং পরিমাণ বেঁধে দেওয়াতে। স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগের নিয়মিত রচনার দ্বারা নতুন বাংলা গানের পর্ব একরূপ স্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত হল। রবীন্দ্রনাথ এই নিয়মে গীতিরচনাকে বিধিবদ্ধ করে ছড়িয়ে দিলেন এবং নিয়মিত ভাবে প্রচারিত হতে লাগল। কোনও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি চালু হতে হলে প্রচলিত বিষয়টি স্বভাবত সর্বজন-গ্রাহ্য হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথের রচনা এদিক থেকে সহজভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পর্বভাগকে কায়েম করেছে। কলি বিভাগকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান যায় যে মূল ধ্রুপদ ও খেয়াল-ঠুমরীর অনুরূপ চারটি কলি অথবা দুটো কলিতে গীতি রচনা ছাড়াও বহু গানে এ বাঁধা নিয়ম থেকে মুক্ত রচনাও যথেষ্টই আছে। এই রূপটি চালু হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হয় বাংলা গান রচনায়। কিন্তু সুর সংযোজনার দিক থেকে সমগ্রভাবে আমরা বিশেষ রূপের কথাই বলছি অর্থাৎ চার-কলি অথবা দু'কলির রচনা। বহু কবিতাকে সুর সংযোজনার দ্বারা গানে পরিণত করা ব্যাপারটিও এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের সংগীতে কাব্যিক পরিবেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কাব্যিক পরিবেশ-সৃষ্টি রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান গীত-লক্ষণ, পর্বভাগ বা কলি-বিভাগ থেকেও এ প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। দেখা যায় চলিত সংগীতে বহুতর রূপান্তরের মধ্যে কলি বিভাগের একটা প্রত্যক্ষ পথ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে গিয়েছেন যা পরবর্তী কালেও বাংলায় অনুসৃত হয়েছে।

এরপর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় রাগ ব্যবহারের কায়দাতে। রাগ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন না। অর্থাৎ তান অথবা তালের ভাগ, গমকের আধিক্য তাঁর গানকে ভারাক্রান্ত করে নি। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রাগের ভাবসূত্রটিকে নিলেন। প্রকৃতির প্রভাব রাগের মধ্যে যা কিছু পেলেন তার সঙ্গে মানবমনের ভাবাবেগকে গ্রন্থন করে দিলেন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, টাইম থিওরিকে (রাগগুলোকে নির্ধারিত সময়ে গান করা) সম্পূর্ণ

সমর্থন করলেন অথবা রাগলক্ষণ বজায় রাখা সম্বন্ধে দৃঢ় হলেন। রাগের বিশিষ্ট ভাবাবেগটি রবীন্দ্রনাথের কাছে বড় হল। অর্থাৎ সে ভাবেই ভৈরবী, ভূপালী, মূলতানী ইত্যাদি রাগগুলো বিশিষ্টভাবে তাঁর কাছে ধরা পড়েছে এবং ইচ্ছে অনুসারেই তার ব্যবহার করা হয়েছে। সুরের প্রকাশরীতি যেখানেই বাঁধা পথ ছেড়ে যেতে চেয়েছে, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সংমিশ্রণের জন্যে এগিয়ে গিয়েছেন। যে গানগুলোতে রাগের রূপ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত, সেগুলোর রূপও সহজ ও সাবলীল। যে সব গানে রাগরূপ অক্ষুণ্ণ আছে, সেই রবীন্দ্রসংগীতকে এখানে ধ্রুপদাঙ্গ বা খেয়ালীয় বা ঠুমরীরীতির সঙ্গে তুলনা করব না, বা অনুরূপ বলব না। হয়তো এগুলো সে রীতির দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু বাইরে কাঠামোর লক্ষণ দ্বারা এ গানগুলোর প্রকৃতি বিচার্য নয়। এগুলোকে এজন্যই রাগভঙ্গিম বা রাগ-প্রভাবিত বলে উল্লেখ করা যায়। কতকগুলো রচনায় সুরের সংমিশ্রণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সেখানেও যে রাগের ভিত্তিকে তিনি বর্জন করেছেন এমন বলা যায় না। কিন্তু প্রতিটি পংক্তির সুর প্রয়োগের কায়দা, গানের ছন্দ ও গানের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি—এসব নিয়ে সুর একটি স্বতন্ত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে।

উদাহরণ স্বরূপ, 'অল্প লইয়া থাকি তাই—' গানটিতে ছায়ানটের রূপ বিকশিত হয়েছে, কিন্তু তবু যাঁরা ছায়ানট জানেন, তাঁদের কাছে আগে রাগের কথা মনে আসে না—যেমন করে একটি খেয়াল গান শোনবার সময় হয়; মনে আসে একটি স্বতন্ত্র ভাবনা। তেমনি যেখানে সুর-সংমিশ্রণ, সেখানে স্বতন্ত্র পরিবেশ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত আরও স্পষ্ট। 'বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল আমার মনে' কি রূপ পরিগ্রহ করে কেদাররাগের একটি বিশেষ লক্ষণের নির্ভরশীলতায়, তা গান শুনে মনে আসে না, শুধু এই গানের পরিবেশটি বোঝা যায়। রাগের প্রয়োগরীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ছন্দ ও গীতির রূপকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলেই রবীন্দ্রনাথের গানের পরিবেশ বিভিন্নভাবে লক্ষণীয়।

বাউলের সুরে এবং কীর্তনের মৌলিক সুরে প্রভাবিত গানগুলোর প্রভাবেও এই প্রকারের রবীন্দ্রপরিবেশ সৃষ্টি হয়। নাটকীয় গানগুলোতে নাট্যরস সংযোজনার উদ্ভাবিত পন্থাও লক্ষ্য করা যেতে পারে। বিশেষ করে নাট্যগীতি ও নৃত্যসম্বলিত গানগুলোর কথাও উল্লেখ করা যায়। সর্বত্রই ছন্দপ্রয়োগ, সুরকলির সংযোজনা, পর্বভাগ প্রভৃতিতে এমন সরল, সহজ ও মসৃণ

সুরবিকাশের একটি নিয়ম আছে যাতে কলিগুলো থেকেই রবীন্দ্রনাথের সুরপ্রয়োগকে চিনে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রগীতির পরিবেশ সৃষ্টিতে সুর সংযোজনার নানা কায়দা বহুবিচিত্র, ছন্দগুলিও এজন্যে সহায়ক। গীতির বিষয়বস্তুর রূপানুভূতি ছন্দকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু ছন্দের গতি কোথাও কোথাও দৃঢ়বদ্ধ নয়; রবীন্দ্রসুর যেমন রাগরাগিণীর কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রকাশে রাগের বিশেষ নিয়মাধীন নয়, তেমনি ছন্দও সেদিক থেকে মুক্ত ও সহজ। এই কতকগুলো লক্ষণ একসঙ্গে মিলে রবীন্দ্রসংগীতকে একটি বিশেষ পরিবেশসৃষ্টির সহায়ক করেছে।

রবীন্দ্রনাথের গান ও রবীন্দ্রপরিবেশ প্রায় একই ভাব-প্রকাশক, সে পরিবেশে মন সমর্পিত না হলে রবীন্দ্র-সংগীতের রূপ উপলব্ধি হয় না। পথের কোণে দাঁড়িয়ে বাউল নেচে নেচে গান করছে, মুগ্ধ হয়ে শুনলাম বাউল গান, কোন সুকণ্ঠ গায়ক কোন বাংলা গানের কোন একটি কলিকে অভূতপূর্ব রূপ দিচ্ছে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে গান শোনা গেল—সত্যিকারের রবীন্দ্রসংগীতের শ্রোতা ঠিক এরূপ শ্রোতা নয়। সামগ্রিকভাবে সমগ্র গানটিকে কথার মধ্য দিয়ে শুনতে হবে। বিচ্ছিন্ন একটি কলি অথবা কলির সুর নিয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের শ্রোতা গীতিতে আকৃষ্ট হয় না। সমগ্র গানের পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করে একাত্মতা অনুভব না করতে পারলে রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃত আস্বাদন স্বীকৃত হতে পারে না। এজন্যে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক। এ সম্পর্ক না বুঝলে রবীন্দ্রনাথের সংগীতকে যেমন বোঝা যায় না, তেমনি কথা-সুর-ছন্দ-ভঙ্গি সহযোগে যে গানের একটি রীতি সৃষ্টি হয়েছে, তাকে সমগ্রভাবে বিচার না করলে রবীন্দ্র-গীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায় না।

সংক্ষেপে রবীন্দ্রসংগীত-পরিবেশ আলোচনা থেকে একটি মূল প্রশ্নে আসা যেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীত কি বিশেষ এক ধরণের গান অথবা একি সত্যি একটি শ্রেণী বা school of music? একটি ব্যক্তিত্বের নিদর্শনসূচক রচনা কিভাবে একটি শ্রেণীতে পরিণত হতে পারে, ভারতীয় সংগীতের রূপগুলো যেখানে এত ব্যাপক ও বিস্তৃত? খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী বলতে শ্রেণীগুলো বড়ই স্পষ্ট। আজকাল শিল্পক্ষেত্রেও যে বহুতর মিশ্রপ্রকৃতির বিভাগ দেখতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রসংগীত-পরিবেশ সম্বন্ধে অবহিত হলে একথা বোঝা যায়। কোন নতুন শিল্প-কলা যেমন তার নতুন রীতি, পদ্ধতি

ও পরিবেশ নিয়ে একটি বিশিষ্ট বিভাগ, রবীন্দ্রসংগীতও সেইরূপ একটি বিভাগ। সে শ্রেণীর পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত সূত্র দ্বারা। এসম্বন্ধে সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের উপযুক্ত প্রবেশপত্র চাই, এবং সংগীত ধারণায় রবীন্দ্রনাথ নিছক আত্মভাব-অনুসারী রীতির প্রবর্তক, অথবা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তি-সংবদ্ধ কিনা তা-ও ভেবে দেখা যাক।

রবীন্দ্র-সংগীত কি একটি সংগীত-শ্রেণী ?

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে একটি জিজ্ঞাসা অবাঙালীর কাছে অনেক শোনা গেছে—"রবীন্দ্রসংগীত বলতে অন্যান্য রীতির সংগীত থেকে স্বতন্ত্র একটি বিশিষ্ট সংগীত-শ্রেণী রূপে স্বীকৃত হবার কারণ কি ?" প্রশ্নটিকে একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। উত্তর ভারতীয় সংগীত রীতির নানা শ্রেণীকে প্রধানতঃ ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী বলে যেমন শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে, বাংলা 'দেশী' সংগীতের মধ্যেও তেমনি রয়েছে নানা প্রকারের শ্রেণীবিভাগ—ভক্তিমূলক গীতি, আধুনিক, পল্লীগীতি ইত্যাদি। এই সকলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান একটি বিশিষ্ট শ্রেণী কেন ? এবং অন্য শ্রেণীর গান থেকে এর স্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

প্রশ্নটি উত্থাপন করবার কারণও রয়েছে। অনেকে রবীন্দ্রনাথের গানকে ধ্রুবপদ, খেয়াল, ঠুমরী জাতীয় গানরূপে কতকগুলো শ্রেণীবিভাগ করে বোঝাতে চেষ্টা করেন। যাঁরা বাংলা ভাষা বোঝেন না তাঁদের কাছে এ শ্রেণীবিভাগ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়—কারণ, ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরীর যে ধারণা সমগ্র উত্তর ভারতে চলিত রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গান সংগীতরীতি হিসেবে সে শ্রেণীর সংগীত সম্বন্ধে কোন সার্থক ধারণার সৃষ্টি করতে পারে না। অবাঙালী সংগীত-রসিকদের এজন্যে এ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে দেখেছি। অর্থাৎ এঁরা বুঝতে পারেন না প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ দ্বারা রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষত্ব প্রতিপাদন করা যায় কি ভাবে ? অন্যদিকে আধুনিক গান ও রবীন্দ্র-সংগীত এবং এরূপ আরও কিছু গান তাঁদের কাছে সমশ্রেণীর বলেই মনে হয়। এ জন্য প্রশ্ন করতে শুনেছি, রবীন্দ্রসংগীতের রূপ যদি ধ্রুবপদ, খেয়াল ও ঠুমরী বা তারই অনুরূপ হয়ে থাকে তবে আমরা এমন ধ্রুবপদ, খেয়াল শুনব কেন যে গানের মধ্যে সে লক্ষণের পুর্ণ বিকাশ নেই ? আবার এমন প্রশ্নও শোনা যায় যে যদি আধুনিক বলে একটি বিশেষ শ্রেণীর গান চালু থেকে থাকে তবে 'রবীন্দ্রসংগীত'কে আর-একটি বিশেষ সংগীত-শ্রেণীর না বলে' তাকে এক প্রকারের 'আধুনিক' গান বলে গণ্য করা যায় না কি ?

বাংলার বাইরে একাধিক সভায় সামান্য দুটো কথায় উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে আহ্বান করা হয়েছিল। এককথায় উপস্থিত ক্ষেত্রে জানাতে হল, যেমন করে একটি ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভার নামে একটি যুগ নামাঙ্কিত করা হয়, একটি সাহিত্যভঙ্গি, শিল্পরীতি ও চিত্ররীতি নামাঙ্কিত হয়, রবীন্দ্র-সংগীত ঠিক তেমনি একটি ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত প্রতিভার সুগভীর অভিব্যক্তি। তাঁর সংগীত রচনায় বহু বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ, এবং বিশিষ্ট স্বর প্রকাশের লক্ষণের জন্যেই যাঁর নামে একটি শ্রেণীর উদ্ভব স্বীকৃত। সেক্সপীয়র, র‍্যাফেল যদি এক একটি বিশেষ রূপে বিশিষ্ট সৃষ্টি ও ভঙ্গির যুগসন্ধি সূচিত করেন, তবে রবীন্দ্র-নাথের গানও ব্যক্তি-নামাঙ্কিত একটি যুগসন্ধির সংগীতরূপ।

এই উত্তরে সকলকে কি খুশি করতে পারা গিয়েছিল? প্রমাণ দরকার, বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং বিশদ বিচার করে ব্যক্তিত্বের প্রকাশবৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান না করলে পূর্বোক্ত উক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যেখানে (উত্তর ভারতের শ্রোতা মাত্রের কাছে) বিভিন্ন সংগীতের শ্রেণী ও রীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর গান বলে প্রমাণ করা দরকার। অর্থাৎ, রবীন্দ্রসংগীত আপন বৈশিষ্ট্যে একটি বিশেষ শ্রেণী কিনা এবং সে শ্রেণীর বিস্তৃতি ও গভীরতায় বিশেষ সংগীতবিদের ও প্রতিষ্ঠানের অবলম্বন সমর্থনযোগ্য কিনা, এ সমর্থন বিশিষ্ট সংগীতরীতির পক্ষ থেকেই বিচার্য কি না?

ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ভারতীয় সংগীতকেও মূর্ত করে রেখেছে, একথা অনস্বীকার্য। সেনীঘরাণা কথাটি ধ্রুবপদ, ধামারে ব্যক্তি-চিহ্নিত। সদারংগী খেয়াল, শোরী টপ্পা, কদরপিয়া-সনদ-ঠুমরী প্রভৃতি কথাগুলি ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক উক্তি। এ ছাড়া দেশীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তুলসী-মীরা-কবীর-দাদু অথবা রাম-প্রসাদী, নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতিও বিশিষ্ট শিল্প-রূপের ব্যক্তিত্বের ভাবপ্রকাশক। এ অর্থে রবীন্দ্র-বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনামাঙ্কিত করা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকার কারণ নেই। এ অর্থে রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলগীতিও চালু রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি-সূচিত বিশেষ রীতি প্রচলিত নেই। রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপারেই একটি স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাই রবীন্দ্রসংগীত একটি প্রধান শ্রেণী-সংগীত কিনা সে আলোচনা স্বতন্ত্র ভাবে করা প্রয়োজন। এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। কীর্তন, শ্যামাবিষয়ক গান প্রাচীন বাংলা গানের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট বিভাগ,

সে সীমানার মধ্যে পদকর্তা অথবা শ্যামাবিষয়ক গানের রচয়িতাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। রবীন্দ্রগীতির প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য এমনি স্বতন্ত্র, সুর-প্রয়োগ ও কথার সম্প্রসারণ এমনি ব্যক্তিসত্তায় নির্ভরশীল যে কোন আধুনিক গোষ্ঠীভুক্ত না হয়ে রবীন্দ্র-সংগীত রচনায় ও গায়কীরীতির জন্যে আপনি স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। এর কারণ বিচার করতে হলে বুঝতে হবে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব কিভাবে সংগীতে সমন্বয় লাভ করেছে। রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের কথাও এই প্রসঙ্গে আসতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিচিত্রতা, বিস্তৃতি, গভীরতা ও ব্যক্তিগত রীতির বিপুল পরিমণ্ডলের জন্যেই এ গান শুধু ব্যক্তির প্রকাশভঙ্গির পরিচায়ক নয়, এ গান একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সংগীত।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় সংগীত, কথা ও সুর

রবীন্দ্রনাথ যে স্তর থেকে সংগীত সম্বন্ধে আত্ম-অভিব্যক্তি শুরু করেছিলেন তখনকার ভাবধারা এবং পরবর্তী কালের নিজ সংগীতের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যদিও মত কিছুটা পরিবর্তন করেছেন বলে নিজে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐক্য সর্বদা বর্তমান। প্রথম যুগের একটি কথা ধরা যাক: "আমাদের দেশে সংগীত স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুর-সমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠাম অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" অর্থাৎ "সমাজ বৃক্ষের শাখায় শুধুমাত্র অলঙ্কার স্বরূপে সংগীত নামে একটা সোনার তাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গাছের সহিত সে বাড়ে না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় না, বসন্তে তাহার মুকুল ধরে না, পাখীতে তাহার উপর বসিয়া গান গাহে না। গাছের আর কিছু করে না কেবল শোভা বর্ধন করে।" সেজন্যে এর প্রকৃষ্ট উন্নতির পন্থা: "আমাদের সংগীতও সুরবিন্যাস মাত্র; যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণ আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।"

সংগীতের ক্ষেত্রে এই উন্নতির পন্থা কি? সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবেই 'কথা'র ওপর জোর দিয়ে ছেন, সংগীতের কাব্যধর্মিতা থেকে এই প্রসঙ্গের

শুরু: "সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই।" রবীন্দ্রনাথ প্রথমে দুটোকে ভাবপ্রকাশের দুটো উপায় রূপে নির্ধারণ করে বলছেন, "কেবল অবস্থার তারতম্যে কবিতা উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়াছে ও সংগীত নিম্নশ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে।"...... "সংগীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা বলি যে, গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অনমুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই। সংগীত ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য।"

সংগীত সম্বন্ধে এই মূল ধারণার উপরেই দাঁড়ায় তাঁর রচনার পক্ষে যুক্তি। অর্থাৎ ভারতীয় সংগীতের কাঠামো ও বিকাশকে তিনি নিরীক্ষা করেন আত্মপ্রকাশের দিক থেকে। স্বভাবতই এ জিজ্ঞাসা এসে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হয়, কেন ইনি গানের জন্য একটা নব-উদ্ভাবিত পন্থা অবলম্বন করেছেন? ভারতীয় সংগীতের যে চিরাচরিত রূপ রয়েছে তার সঙ্গে তাঁর রচনার বিভিন্নতা কোথায়? ঐতিহাসিক যুক্তিতে কোন্ পন্থা অবলম্বন করলেন এবং কেন? এ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে মূল ধারণা, ভারতীয় সংগীত, সুর ও কথা, রাগরাগিণী, তাল ইত্যাদি প্রসঙ্গ সহজেই এসে পড়ে। কিন্তু মূল তত্ত্বের ভিতরে ও বাইরে লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রধান বিচার্য বিষয়টি হচ্ছে "সুর ও কথার সম্পর্ক"।

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে সংগীত ও কথার সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। রচনার পরবর্তী যুগে ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত একটি চিঠির অংশে সংগীত ও কথার সম্পর্ক সম্বন্ধে বলছেন, "সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে, সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটিকে বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁট বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বিলিয়ে দিয়েছে যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্ত হৃদয়ং তব। বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে।" এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটিকে তিনি বহুভাবে বহু উদাহরণ সহ নানাস্থানেই বলেছেন। সংগীত ও কাব্যের উদ্বাহের উক্তিটিই হচ্ছে বহু-ব্যবহৃত উপমা। দুয়ের সম্মিলন ছাড়া গানের অন্য কোন সংগীতসত্তাতে তিনি বিশ্বাসী নন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলাদেশে

সংগীতে প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান্ রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে যোগ রাখা চাই।"…"অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান ও প্রাণ ভরতি হয়েছে যেমন হয়েছে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে। কিন্তু অনুকরণ করলে নৌকাডুবি। নিজের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে না। হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি। ওর আশ্রয় না ছাড়তে পারলে ঘরজামাই-এর দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার স্বাধিকারে জোর পৌঁছয় না।"… "হিন্দুস্থানী গান আমরা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদী করবার জন্যে নয়।"

সঙ্গীত ও কথার সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে যুক্তিবদ্ধ আলোচনায় স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—"আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে, একথাটা কেন স্বীকার করতে চাও না? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে হিন্দুস্থানী সংগীতের সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে? কথাকে সরিক বলে মানতে সে নারাজ! বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী। বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী পরস্পর আপস করে নেয়, যেহেতু সেখানে একের যোগেই অন্যটি সার্থক!…কে বড় কে ছোট তার মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই মোটের উপর বলতে হয় যে কাউকে বাদ দিতে পারিনে। বাংলা সংগীতের সুরের ও কথার সেইরূপ সম্বন্ধ। হয়তো সেখানে কাব্যের প্রত্যক্ষ আধিপত্য সকলে স্বীকার করতে বাধ্য নয়। কিন্তু কাব্য ও সংগীতের মিলনে যে বিশেষ অখণ্ড রসের উৎপত্তি হয় তার মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে দেখব তার কিনারা পাওয়া যায় না।" বিশেষতঃ বাংলা গানের কথাসম্পদকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এর উৎপত্তি হিন্দুস্থানী ধারায় হয়নি, অতএব সংগীতের ক্ষেত্রে কথার দাবি একটি বিশিষ্ট দাবি। তাকে ক্ষুণ্ণ করা চলে না। "বাঙালীর …স্ব-ভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে, বললে চলবে না রাতের বেলাকার চক্রবাক দম্পতির মতো ভাষা পড়ে থাকবে নদীর পূর্বপারে আর গান থাকবে পশ্চিম পারে—**and never the twain shall meet**…বাংলায় নতুন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না।"…এ থেকে সপ্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথের রচনায় সুর ও কথার সামঞ্জস্য বিধানের বৈশিষ্ট্য তাঁর গীত-রচনারীতিকে অন্যান্য ধারা থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

সুরের প্রকাশবৈচিত্র্য

রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন আমাদের সংগীতে রয়েছে ভূমার সুর। "তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গভীরতা সমস্ত সঙ্কীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই। আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘ-মল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্তবাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্ত্যলোকের দুঃখ সুখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।" ভারতীয় পন্থায় এসব রাগ রাগিণীকে অবলম্বন করেই ভাবপ্রকাশ। কিন্তু রাগরাগিণীর প্রকৃতি পরিস্ফুট হয় 'কালোয়াতী' গানে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের কালোয়াতী গানের রাগরাগিণী, ইহার ভাবটা কি? রাগশব্দের গোড়াকার মানে রং। ভোরবেলাকার আকাশে হাওয়ায় এমন কিছু একটা আছে যেটা কেবলমাত্র বস্তু নয়, ঘটনা নয়, যেটা কেবল রস। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের অনুরাগের মিল। এই মিলের তত্ত্বটি অনির্বচনীয়। যাহা নির্বচনীয় তাহা পৃথক, আপনাতে আপনি সুনির্দিষ্ট।" "আমাদের রাগরাগিণীতে অনির্বচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড় বড় আধারে ধরিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সংগীত মানুষের মনে এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়।" এবারে বিশিষ্ট রাগের সাহায্যে উদাহরণ —"কোন একটি ভাবপ্রকাশে নির্বাক ভৈরবী একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আবেগ প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু ঠিক কাব্যের কথাটি বলতে গেলে সে বোবা।" অথচ বলতে গেলে যেমন দরকার কথার, তেমনি দরকার সুরের। বাণী ছাড়া কানাড়া হয় বোবা, "বাণীর যোগে কানাড়া একটি রস পেয়েছে তার দাম কম না।"

অতএব রবীন্দ্রনাথ অনির্বচনীয়তা ও ভূমার প্রকাশের বেড়ি থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তব জগতের মধ্যে এসে পড়তেই ব্যস্ত। আত্মপ্রকাশের জন্য মানুষ যখন ব্যাকুল হয়ে নিজের "আশা আকাঙ্ক্ষা হাসি-কান্না সমস্তকে বিচিত্ররূপ দিয়ে আর্টের অমৃতলোক সৃষ্টি করতে থাকে তখন বিশ্বলোক বা ভূমার জগৎ থেকে স্বাতন্ত্র্য আসে।" রবীন্দ্রনাথ এই আর্টের লোকে গীতিকার হয়ে রচনার মধ্য দিয়ে যেন চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে এগিয়ে যান। এই মনোভাবের জন্যে তাঁর কালোয়াতী গান ও ওস্তাদী সংগীতের তাৎপর্য উদ্ধারের নিরিখ সম্পূর্ণ সাধারণ দৃষ্টিকোণের নিরিখ বলতে হবে। এ

প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছাড়া অন্যপক্ষ থেকে বলবার কিছুমাত্র অবকাশ নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মহাদেব, নারদ এবং ভরতমুনিতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সংগীতকে এমন চরম উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতে পারি সৃষ্টি করিতে না পারি, তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।" এই ত গেল রাগ-রাগিণী-সম্বলিত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচলিত রাগসংগীতের রূপসম্বন্ধে বক্তব্য, কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথের নতুন ভঙ্গি আর একটি সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ, চিরাচরিত ভাবটি থেকে মুক্তির পথ বাংলাদেশে প্রথম প্রশস্ত হয় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে। "বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্যের চেষ্টা প্রথম দেখতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজীতে রোমান্টিক মুভমেন্ট বলে। এই স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা কেবল কাব্য ছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখা দিল। সে উদ্যমের মুখে কালোয়াতী গান আর টিকিল না। তখন সংগীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে ঐতিহাসিকতা লক্ষ্য না করেও মূল তত্ত্বটুকু বুঝে নেয়া যায়, নতুন আত্মপ্রকাশের পন্থাকে তিনি নতুন যুগের "সোনার কাঠি" বলে উল্লেখ করেছেন। সে সংগীতের রূপ প্রাচীন স্থাপত্যের মত দেখায়। "প্রাচীন স্থাপত্য যে সকল রাজা ও ধনীর বিশেষ প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াছিল তারাও নাই সেই অবস্থারও বদল হইয়াছে। কিন্তু দেশের যে জীবনযাত্রা কুঁড়ে ঘরকে অবলম্বন করে তার কোন বদল হয় নাই।" অর্থাৎ "আমাদের সংগীতও রাজসভা সম্রাট-সভায় পোষ্য পুত্রের মত আদরে বাড়িতেছিল, সে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই তাই সংগীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্ট-পুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য সংগীত, বাউলের গান এসবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় শিল্পও টিকিতে পারে না।" অতএব সংগীতের ক্ষেত্রে এই রোমান্টিকতার ডাকে রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনার পক্ষে বললেন, "যেখানে সংগীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গান হইয়াছে সর্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গান শুনিবার জন্যই এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর জন্য নয়।"

কিন্তু একথার পরেও রাগ ও রাগিণী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি বক্তব্যকে বিশেষ ভাবে না উল্লেখ করলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় হয় না—"তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই। দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ান চলে কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলবে। কেননা আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না।" এরপর আরও বলেছেন,"আমাদের গানের ভাষা-রূপে এই রাগরাগিণীর টুকরোগুলিকে পাইয়াছে। সুতরাং যে ভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই।.........আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক না কেন, রাগরাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মত তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।

একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগ ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না।"

হিন্দুস্থানী সংগীতের বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রথম যুগের রচনায় কিছু কিছু গানে যদিও গতানুগতিকতা কতকটা বজায় ছিল, অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর অবলম্বনে ধ্রুবপদী ভঙ্গিকে প্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু ওস্তাদী গানের বন্ধনমুক্তির ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মনে সর্বদাই জাগ্রত ছিল। ছেলে-বেলাকার সংগীত শিক্ষা প্রসঙ্গে বারবারই উল্লেখ করেছেন, গীত রচনার জন্যে মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে সুরজগতে ভাসতে ভালবাসতেন, সঞ্চয় করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে পিঞ্জরাবদ্ধ হতে চান নি। সেজন্যেই বলেন, "যখন আমার কিছু বয়েস হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড় ওস্তাদ এসে বসলেন, যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই, সেই জন্যে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলাম লুকিয়ে চুরিয়ে।"—"আমাদের বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের খুব চর্চা হত যে-কথা তোমরা সবাই জানো। অথচ আশ্চর্য, এ বাড়ির ছেলে হয়েও আমি কোনোদিনও ওস্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়ি নি। আড়ালে আবডালে থেকে যতটুকু শিখেছি, ততটুকুই শেখা। সংগীত শিক্ষাটা আমার সংস্কারগত ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক নয়।" কিন্তু এ সঞ্চয় থেকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপন

উদ্ভাবিত পন্থায় তাঁর নব নব সৃষ্টি বহু বছর ধরে নতুন নতুন মোড় নিয়েছে।

শিক্ষায় বাঁধাবাঁধি ছিল না বলেই রাগরাগিণীতে মিশেল আনতে রবীন্দ্রনাথের বাধেনি। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁর মুক্তি ছিল অপরিসীম। রাগরাগিণী-গুলো এজন্যে তাঁর আপনার মনের ভাবানুসারে তাঁর কাছে উঁকি মেরেছে, "ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা, ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহবেদনা, দেশ মল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন আদি নির্ঝরের কলকল্লোল, রামকেলি প্রভৃতি সকাল-বেলাকার যে সমস্ত সুর কলিকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, তার একটু আভাস মাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তটা সজীব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা দেয়, এমন একটা বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিককে ব্যাকুল করে তোলে যে, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে —এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্রের মতো। ভৈরোঁ যেন ভোর বেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ,······কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি—ভৈরব রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে আমাদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাকাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে। সত্যিইতো কিছু স্থায়ী নয়; কিন্তু প্রকৃতি কি এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটাই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে। সেইজন্য আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে পারি। ভৈরবীতে সেই চির সত্য সেই মৃত্যু-বেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে, আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা কিছু জানি তার কিছুই থাকবে না এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানি নে। ···আমাদের মুলতান রাগিণীটা এই চারটে পাঁচটে বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে—আজকের দিনটা কিছুই করা হয় নি। আজ আমি এই অপরাহ্নের ঝিকিমিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মুলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরাসুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—না সুখ না দুঃখ কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মগত বেদনা। ······আমাদের পুরবীতে কিংবা টোড়িতে বিশাল জগতের অন্তরের হাহাকার

ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতার যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।...... বর্ষার দিনের ভিতরে ভূপালী সুরের আলাপ চলেছে আমি বাইরে থেকে শুনেছি। আর কি আশ্চর্য দেখি, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ষার গান রচনা করেছি তার প্রায় সবটিতেই অদ্ভুতভাবে এসে গেছে ভূপালী সুর।"

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ কবিমনে রাগরাগিণীগুলি কিভাবে স্থান গ্রহণ করেছিল সে কথা উল্লেখ করে অনেকগুলো উক্তিই একত্র সমাবেশ করেছেন। এখানে আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, প্রকৃতির বিচিত্র ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে রাগের মূলগত স্বরূপ বর্ণনা অথবা ভাবাবেগকে কেন্দ্র করে তাৎপর্য ব্যাখ্যা হচ্ছে সম্পূর্ণ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন বিশ্লেষণ। নয়ত মেঘমল্লারের তাৎপর্য শাস্ত্রীয় মতে অভ্রংলিহ গঙ্গোত্রীর আদি নির্ঝরের কলকল্লোল নয়, মূলতান কখনো রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিঃশ্বাস নয়, শাস্ত্রীয় পুরবীতে আশানুরূপ আর্দ্রতা নেই, খাম্বাজে করুণতা নেই। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, "গুরুদেবের গান প্রাচীনের উপর ভিত্তি করে নূতন প্রকাশ মাত্র—যা ভারতে যুগে যুগে হয়ে এসেছে।" আমাদের এখানকার বক্তব্য আরও স্বতন্ত্র, তাৎপর্য ব্যাখ্যা দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে দেখা গেছে এবং প্রকৃতির কবি ব্যবহৃত রাগগুলোর প্রাকৃতরূপ আবিষ্কার করে গিয়েছেন। সেটা চিরাচরিত প্রথাসম্মত নয়, সে হচ্ছে কাব্য সৃষ্টির রীতি-সম্মত, ব্যক্তিত্বের আলোকে নতুন উদ্ভাবন, সহজাত শক্তির প্রকাশভঙ্গিতে রং-রেখা প্রয়োগের সমর্থন। শাস্ত্রীয় সংগীতেও আজকে রাগের ব্যাখ্যায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অবশ্য পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, সেকথা এখানে অবান্তর। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রদর্শিত তাৎপর্য ব্যাখ্যার মূল্য অপরিসীম। রাগসংগীত ভিত্তির কথাটি এখানে বড় নয়, বড় হবে রবীন্দ্র-সৃষ্টি পদ্ধতির কথা।

গীতি-পদ্ধতি

এরপর যে প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হতে পারে তা হচ্ছে হিন্দুস্থানী গীতিপদ্ধতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর ব্যক্তিগত রচনাপদ্ধতির রূপ বিশ্লেষণ। এ সম্পর্কে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে কবি বলেছেন, "হিন্দুস্থানী গানে যদি কাব্যকে নির্বাসন দিয়ে কেবল অর্থহীন তা-না-না করে সুরটিকে চালিয়ে দেওয়া হয়

তাহলে সেটা সে গানের পক্ষে মর্মান্তিক হয় না। যে রসসৃষ্টিতে সংগীতেরই একাধিপত্য সেখানে তান কর্তবের রাস্তাটা যতটা অবাধ, অন্যত্র, অর্থাৎ যেখানে কাব্য ও সংগীতের একাসনে রাজত্ব, সেখানে হতেই পারে না। বাংলা সংগীতের—বিশেষত আধুনিক বাংলা সংগীতের বিকাশ তো হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারায় হয় নি। আমি তো সে দাবি করছিও না। আমার আধুনিক গানকে সংগীতের একটা বিশেষ নাম দাও না।" এ প্রসঙ্গে শিক্ষা, রুচি এবং গায়কের প্রকৃতি অনুসারে কাব্যানুভূতির যেমন তারতম্য হয় বিভিন্ন লোকের মধ্যে, তেমনি গান গাইবার বেলায়ও তেমনি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে "আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সে রকম ভাবে খণ্ডবিখণ্ড করতে দেইনি। আমি যে এতে আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপ সৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার নেই তার অন্য নিয়ম।...আমার গানে আমি ত সেরকম ফাঁক রাখিনি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।"

হিন্দুস্থানী সংগীতের গীতিপদ্ধতির তুলনায় স্বকীয় গায়কী রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, "আমি ত কখনো একথা বলিনে যে কোনও বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলা গান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরী, তানের অলংকারের জন্যে তার দাবি আছে। আমি এরকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি।" কিন্তু আলোচনা সূত্রে একাধিক স্থানে রবীন্দ্রনাথ গানের মধ্যে তানের স্টিম রোলার চালানো সম্বন্ধে গায়ককে সাবধান করে দিয়েছেন। কারণ হিন্দুস্থানী গীতি-পদ্ধতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতি-পদ্ধতির কোন সম্পর্কই নেই, যদিও সুরকে এ ক্ষেত্র থেকেই সংগ্রহ করতে হয়েছে। "হিন্দুস্থানী গানের সুরকে ত আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারিই না। আমাকে ত নিজের গানের সুরের জন্যে ঐ হিন্দুস্থানী সুরের কাছেই হাত পাততে হয়েছে! আর এতে যে দোষের কিছু নেই।" এক্ষেত্রে বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ সচেতন এবং গায়কের প্রস্তুতির জন্যে হিন্দুস্থানী গীতিপদ্ধতিকে বর্জন না করে তাকে স্বীকরণের (assimilation-এর) কথাই উল্লেখ করেছেন। গায়কী রীতিতে অতিরিক্ত কারুকলাকে রবীন্দ্রনাথ কখনও সমর্থন করেন নি। শ্রীদিলীপ-কুমারের সঙ্গে আলোচনা সূত্রেই তিনি বলেছেন, "আমি গান রচনা করতে

করতে সে গান বার বার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার নেই প্রভূত কারুকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়; অতি সূক্ষ্ম, অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।"

শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ললিত সৃষ্টিতে complex structure (গঠনের জটিলত) থাকা স্বাভাবিক হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশ্লেষণ করেছেন: "আমি কেবল বলতে চাই, সরলতায় বস্তু কম বলে রস-রচনায় তার মূল্য কম একথা স্বীকার করা চলবে না, বরঞ্চ উলটো। ললিত কলার কোন একটি রচনায় প্রথম প্রশ্নটি হচ্চে এই যে, তাতে আনন্দ দিচ্ছে কিনা। যদি দিচ্ছে হয়, তা হলে তার মধ্যে উপাদানের যতই স্বল্পতা থাকবে ততই তার গৌরব। বিপুল ও প্রয়াসসাধ্য উপায়ে একজন লোক যে ফল পায় আর একজন সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পায়াস উপায়েই সেই ফল পেলে আর্টের পক্ষে সেইটে ভালো।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁর গায়কী রীতিতেই বিশেষ প্রযোজ্য।

হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রয়োগ ও প্রেরণাকে মেনে নিয়েও যেখানে সুর-বিহারের (improvisationএর) প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নির্দেশ রয়েছে, সেখানে গায়কের ব্যক্তিগত ভঙ্গি সম্বন্ধে কবির বক্তব্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, "গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? ঠেকাব কী করে? তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনে যে আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না। কারণ গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তুমি তো গোচর হবেই। তাই এক্সপ্রেশানের ভেদ থাকবেই, যাকে তুমি বলছ ইন্টারপ্রেটেশানের স্বাধীনতা। বলছিলে বিলেতেও গায়ক-বাদকের এ স্বাধীনতা মঞ্জুর। মঞ্জুর হতে বাধ্য। সাহানার মুখে আমার গান যখন শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম—বলতে হত—'আমার গান সাহানা গাইছে'।"

রবীন্দ্রনাথ structureটি জখম না হওয়া পর্যন্ত গায়কের ব্যক্তিগত ভঙ্গীকে স্বীকৃতি দিতে রাজী। "তোমার একথাও আমি স্বীকার করি যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশানে কম বেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশীর মধ্যে তফাৎ আছে এ কথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব

অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।"

অতএব দেখা যাচ্ছে গীতি-পদ্ধতিতে স্বীয় সৃষ্টির রূপ বজায় রাখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সজাগ। রবীন্দ্র-রচনায় ধ্রুপদ-ভঙ্গিম গানগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে ধারণাটি স্পষ্ট হয়। যে কোন ধ্রুপদ গানের প্রতি অক্ষর ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে সুরে উচ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে এক একটি ভাবসমগ্র শব্দ-সমষ্টিতে একসঙ্গে স্বর প্রয়োগ হয়েছে। বিচ্ছিন্ন শব্দের কোন অস্তিত্ব নেই। যথা, "দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে" গানটির যদি দাঁ…ড়া…ও…ম…ন…অ ন ন্ ত ব্র হ্মা ণ্ড মা ঝে প্রভৃতি শব্দগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যায় তা হলে হিন্দুস্থানী রীতির রচনার অনুরূপ হবে। রবীন্দ্রনাথের গানে অক্ষরগুলোর এরূপ দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা গ্রাহ্য হয় নি। এখানেই মূল ধ্রুপদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ-ভঙ্গিম গানের তারতম্য।

সহজ ও সরল অলঙ্কার-প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠের স্বাভাবিক ঐশ্বর্যের ওপরই জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীত-সমালোচকদের মতে ১৯০০ শতক পর্যন্ত রবীন্দ্রগীতির প্রথম যুগ ধরে নিলেও তাঁর প্রাক্-উনবিংশ শতকের ধ্রুপদ-প্রভাবিত গানগুলো গাইবার জন্যে কণ্ঠের ঐশ্বর্য ছাড়া অতিরিক্ত ক্লাসিক রীতিতে গীত হতে পারে কিনা বিচার্য। কারও মতে আজ সে সব গানের প্রকৃত গায়কী নেই। অর্থাৎ যেখানে ধ্রুপদী প্রকরণই হচ্ছে প্রধান, সেখানে অনুরূপ গানের ক্ষমতা ও অনুশীলনের প্রয়োজনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, বিস্ময় সৃষ্টি হয় তখনই যেখানে কাব্যকে প্রধান রেখে ধ্রুপদীরীতির প্রকৃষ্ট প্রয়োগ করা চলে না। অর্থাৎ ধ্রুপদী ব্রহ্মসংগীতেও ক্লাসিক গানের মত স্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়। গীতের মধ্যে কথা এমন ভাবে বোনা, ভক্তিমূলক ভাবনা কাব্যকে এমন গভীর ভাবে আশ্রয় করেছে যে এ গানগুলোতেও কথাসম্পদ গায়ককে তেমন স্বাধীনতা দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের গীতিরচনার উৎকর্ষ প্রথম রচনার যুগে হয়েছে কিংবা পরবর্তী যুগে, একথা বিচার্য নয়। প্রথম সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে গীতিরচনায় কথার ঐশ্বর্য এত বেশী যে তার তাৎপর্য সুরে বজায় রাখতে হলে রবীন্দ্র-পরিকল্পিত স্বাভাবিকতা ও সরলতার নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার। সে জন্যেই ব্রহ্মসংগীত এবং রবীন্দ্র-রচনার প্রথম যুগের (২০ বছর) গানগুলোকে রাগধর্মী দেখেও তাকে কালানুক্রমে ও বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা যায় কিন্তু রবীন্দ্র-

ধ্রুপদ বলে ভেবে নেওয়া যায় না। অথচ সে যুগের অনেক রচনাই ধীর গম্ভীর, চলন ভারিক্কী, সুর-প্রকরণ ধ্রুপদ গানের অনুরূপ এবং তালের দিক থেকে চৌতাল, ধামার, সুরফাক্তা (সুলতাল), তেওরা, ঝাঁপতাল, রূপক প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে। এর প্রধান কারণ গানের পদ-সমৃদ্ধি এবং ভাবগভীরতার বিচার করলেই জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের কোন পূর্বসূরী গানের রচনায় অনুরূপ গভীরতা ও কল্পনার প্রয়োগ করতে পারেন নি। স্থায়ী, অন্তরার পর সঞ্চারীতে এমন ভাবে কল্পনাকে নতুন ভাবে উজ্জীবিত করে আভোগে একটা সুন্দর ও অভাবনীয় পরিসমাপ্তি টানতে পারেন নি। মোটামুটি, ভাবের ঐশ্বর্যকে বুঝতে চেষ্টা করলেই সহজ গায়কী-রীতির কথা আপনি এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সহজ রীতিতে প্রাণবন্ততা নিশ্চয়ই আশা করেছেন এবং আরও আশা করেছেন দরদ। সেজন্য সে সব গান পাখোয়াজ সহকারে ধ্রুপদ ভঙ্গিতে গান করা ছাড়া অতিরিক্ত আরও একটি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়, সে হচ্ছে গায়কীর বৈশিষ্ট্য—যাকে বাংলা গান গাইবার পদ্ধতিতেই গান করা, বলা যায়।

প্রথম যুগের গানের রচনার পর রবীন্দ্রসংগীত ক্রমে পুরোনো রাগসঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে চলল। এখানে স্বতঃস্ফূর্ত গায়কীভঙ্গির আবিষ্কার হয়ে গেল—কীর্তনিয়া, বাউল গায়কের রীতি অনুসরণ করে। সহজ গীতিপদ্ধতি এখানে প্রকৃষ্ট রূপ পেল। ভাষার লীলাময় রূপ ও চলনের ছন্দে মহিমা ধরা পড়ে গেল, ধ্বনিশিঞ্জন কানে বাজল, কথার লালিত্যে সুর এসে যুক্ত হয়ে ভাবের মহিমা বাড়াল। পরবর্তী যুগে যে গান রচনা করলেন তার সঙ্গে শুধু শব্দটাই এল না, এল ছবি, মূর্তি, ছায়া, ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত, বীরত্ব, প্রেরণা, প্রেম এবং নিতান্ত ঘরোয়া আশা, আকাঙ্ক্ষা।

এই সংখ্যাতীত গানের জমিতে এসে যুক্ত হল অতি পরিচিত রাগগুলি—ভৈরবী, ভৈরব, আশাবরী, রামকেলি, কালেংড়া, ভীমপলশ্রী, কাফি, ছায়ানট, কেদার, হাম্বীর, দেশ, পূরবী, মুলতান, কল্যাণ, ইমন, ভূপালী, এবং এসব রাগের অংশবিশেষ (টুকরো) নানা ভাবে সম্মিলিত হল। গানের মধ্যে সমজাতীয় রাগ সংমিশ্রিত হল, কোথাও ভাবের অনুসারে সুরের একটু বিরতির সঙ্গে কোমল-ধা, আকস্মিক কড়ি-মা, শুদ্ধ-নিখাদ, কোমল গান্ধার ও কোমল নিখাদের স্পর্শ লেগে গেল। ছন্দে কার্ফা, দাদরা, ঝাঁপ, তেওরা, ঝম্পক এবং নতুন চলনের কতকগুলো তালও রবীন্দ্রনাথ অবলম্বন করলেন।

তালভাগগুলো ঋজু ও সংক্ষিপ্ত করে গানের চরণে চরণে অনেক স্থানে স্বরের কতকগুলো স্তব সৃষ্টি করে নিলেন, যে স্তরগুলো শুনলেই রবীন্দ্র-গীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

নাটকের গান রচনায় প্রধান হয়ে দাঁড়াল সহজ বাস্তব প্রকাশভঙ্গি, অনেক ক্ষেত্রে সেখানে সুর রচনায় প্রকাশভঙ্গিকে আরও অবলীল এবং প্রসাদগুণ-সমন্বিত করে তুলল। সহজ রীতির গায়কীতে খানিক পেলবতাও এল, বলা চলে। রবীন্দ্র রচনার মধ্যযুগে (১৯০০ শতককে অনেকে মেনে নিয়েছেন, যদিও রবীন্দ্রনাথের মধ্য যুগের শুরু হয়েছে আরও অনেক পূর্বে) সুরে নতুন সংগতি সৃষ্টির চেষ্টাও প্রবল হয়েছে, বিভিন্ন গ্রামের স্বরে সংগতিসৃষ্টি, মন্দ্র-মধ্য-তার স্বরের আকস্মিক জোটতৈরি প্রভৃতি কায়দাগুলোও নতুনত্বের সূচনা করেছে। কিন্তু সকল প্রকার প্রয়োগ পদ্ধতিতে ভারতীয় সুরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যায় নি, যদিও ইউরোপীয় প্রভাব কোথাও কোথাও স্পষ্ট হয়েছে।

এর পর আরও একটি প্রসঙ্গ, সংগীত-সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত, সে হচ্ছে তাল। রবীন্দ্রনাথের আমলে তাল নিয়ে মাতামাতি বড় বেশি ছিল, "গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে ?" কিন্তু, "তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ।" এই হিসাবের মাতামাতি—গানের ওস্তাদ স্বাধীন ভাবে ছাড়া পেয়ে যেখানে অতিরিক্ত স্বাধীনতা বজায় রাখতে চেয়েছেন, আর তালের ওস্তাদ (অর্থাৎ তবলচী বা পাখোয়াজী) তাঁকে নাস্তানাবুদ করতে এগিয়ে এসেছেন। "চুলচেরা হিসাব আর কন্ট্রোলার আপিসের খিটিমিটি লইয়া" রবীন্দ্রনাথের মাথাব্যথা নেই। সংগীতের প্রয়োজন বুঝে রচয়িতা নিজেই তার সীমানা বেঁধে দেবেন, যাতে রেষারেষি বন্ধ হয়—রবীন্দ্রনাথের এ ধারণাটাই প্রবল। তাই তিনি বলেন, "য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না।" এ স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ওস্তাদের হাতে সংগীত সুর-তালের কৌশল হইয়া ওঠে। এ কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।" কবিতার ছন্দ-বিকাশে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা চলে রবীন্দ্রনাথের মতে সেরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করলে সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য আসে, ছন্দ রবীন্দ্রনাথের রচনায় সে বৈচিত্র্য

সৃষ্টির পথ সুগম করেছে। এজন্যে রবীন্দ্রনাথের নতুন তাল সৃষ্টির তালিকা দিয়ে বিশ্লেষণ অনেকে করেছেন। সে সব তালে 'ছন্দ' অথবা অলঙ্কার নেই বলে এখানে উল্লেখ করা গেল না। তত্ত্বটি আমাদের দরকার।'

মোটামুটি, রবীন্দ্রনাথ সংগীত-প্রসঙ্গে যে সব কথার দ্বারা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করেছেন তা হচ্ছে :

(১) ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) সংগীত অনির্বচনীয় ও ভূমার প্রকাশ।

(২) অনির্বচনীয়তার ক্ষেত্র থেকে সাধারণ্যের জীবনে গীতকলাকে পরিস্ফুট করতে স্বাতন্ত্র্যের দরকার এবং নতুন পন্থায় সুরসৃষ্টিই হবে গানের কলারূপ।

(৩) প্রাচীন শাস্ত্রীয় গানে অনির্বচনীয়তা সুরের বাঁধা ভাব-আবেগের কাঠামোতে নিবদ্ধ, কিন্তু তিনি মনে করেন জীবনের কথা ও ভাবপ্রকাশের অবলম্বন হয় সুর প্রয়োগের স্বাধীনতায় এবং ছন্দমুক্তিতে, সংগীত সেখানেই সার্থক।

(৪) রাগ-রাগিণীর চেয়ে কথা ও কাব্য সমৃদ্ধি অর্জন করেছে অনেক বেশি এবং ভাবপ্রকাশে জীবনকে চিত্রিত করবার ক্ষমতা তার অধিক।

(৫) সে জন্যে কবি গীত-রচয়িতা হয়ে কথা ও সুরের সমন্বয়ের সুযোগ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন।

(৬) সুর সংযোজনার গোড়ায় তিনি ধ্রুপদী রীতিকে অবলম্বন করেছিলেন—শাস্ত্রীয় সংগীত-জগতের প্রতি সামগ্রিক বা comprehensive দৃষ্টি নিয়ে। ভেতরের কচকচিতে তিনি প্রবেশ করেন নি, বাইরে থেকেই সহজভাবে অবলম্বন করেছিলেন।

(৭) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত রাগ-রাগিণীগুলোকে তিনি মুক্তভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন বাংলা গানের সৃষ্টি প্রাকৃত পল্লী ও সহজ জীবনের লোকগীতি থেকে, হিন্দুস্থানী পদ্ধতি থেকে নয়। হিন্দুস্থানী পদ্ধতি গানকে সংস্কার করতে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বাংলা গান রচনার পক্ষে তার প্রাধান্য নেই। রাগরাগিণী কথাকে ঠেলে দিয়ে বাংলা গানকে সার্থক করতে পারে না।

(৮) রাগ-রাগিণীর "টুকরো"গুলির ওপরই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। স্তরে স্তরে টুকরোগুলো সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ গীত রচনায় খুশি হয়েছেন। সমগ্র রাগ বিকাশের দিকে লক্ষ্য মোটেই দেন নি।

(৯) কীর্তন, পূর্ববঙ্গের পল্লীগীতি ও বাউল এসে মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে রচনায় নতুন ভিত সৃষ্টি করল।

(১০) অলঙ্কারের আতিশয্য গানে স্বীকৃত হল না, তানের 'ষ্টিম রোলার'-কে বর্জন এবং সুকণ্ঠের সহজ দরদ প্রয়োগের প্রসঙ্গ এল।

(১১) তালের খিটিমিটি থেকে মুক্তি-কামনায় দৃঢ়বদ্ধতা থেকে ছন্দকে মুক্তি দেওয়া হল।

(১২) এরপরে বিষয়বস্তু অথবা সুর অনুসারে শ্রেণীবিভাগের প্রসঙ্গও আসে। শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে আসে ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিবর্তনের প্রসঙ্গ।

এ পর্যন্ত সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রতত্ত্ব বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের দ্বারাই করা হয়েছে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সংগীত-রীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে আপন পন্থা সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তাকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখা দরকার। হিন্দুস্থানী গানের প্রকৃতির ব্যাখ্যান রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের গায়কী রীতিতে আজ বিপুল বিপ্লব ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ যে রীতি থেকে মুক্তি চেয়েছেন, সে তাঁর ব্যক্তিগত রচনার দিক থেকে সত্য, হিন্দুস্থানী গীতপদ্ধতি সমালোচনায় প্রযুক্ত হতে পারে না-এ-কথা বাস্তবদৃষ্টিসমন্বিত সংগীত-সমালোচক মাত্রই বলবেন

রবীন্দ্রনাথের গানের অজস্রতা এবং বিপুল কাব্য-সমৃদ্ধি সম্বন্ধে এখানে বলবার প্রয়োজন বোধ করি না। বিষয়টি স্বতন্ত্র। আমাদের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা যেমন প্রতিদিন থেকে স্বতন্ত্র তেমনি তাঁর প্রায় প্রতিটি গানের চিত্র, ভাবৈশ্বর্য, সুরসংগতি ও অনুভূতি স্বতন্ত্র। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুরসংযোজনায় বাস্তব-দৃষ্টির বিশ্লেষণ করলেই এর বিচার চলে।

রবীন্দ্রনাথ কথার স্বাচ্ছন্দ্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি, কারণ কবিমনই তাঁর কাছে বড়। এ জন্যেই, গোড়ার দিকের রবীন্দ্রসংগীত ধ্রুপদী রীতিতে রচিত হলেও, ধ্রুপদ-অঙ্গ সেখানে লক্ষণীয় নয়। শ্রেণীবিভাগে যাঁরা গান-গুলোকে শাস্ত্রীয়-সংগীতের রীতিতে বিভাগ করে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন, তাঁরাই ভুল করেন। এ ভুলটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশেষ করে অবাঙ্গালীর কাছে। ওঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের সমৃদ্ধি বুঝতে পেরে যদিও বা রবীন্দ্রসংগীত বুঝতে ও শুনতে ভালবাসেন, কিন্তু ক্লাসিক রীতির শ্রেণীবিভাগে তাঁদের মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও নতুন তালের গান, হিন্দীভাঙা বিদেশী-প্রভাবের শ্রেণীবিভাগগুলোই এ ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এর কারণ হচ্ছে

এই যে, যিনি রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গাইছেন তিনি ধ্রুপদ গাইবার ভঙ্গির সঙ্গে মোটেও পরিচিত ন'ন অথবা যিনি ধ্রুপদ গায়ক তিনি রবীন্দ্রপ্রযোজিত সুর ও কথার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন না। একাধিক ক্ষেত্রে খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের রবীন্দ্রগীতি শুনে এ শ্রেণী বিভাগ অনুসারে গান গাওয়া ব্যর্থ মনে হয়েছে। এজন্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুরপ্রয়োগের স্বাতন্ত্র্যকে লক্ষ্য করে শ্রেণীবিভাগ আরও যুক্তিসংবদ্ধ হওয়া দরকার, যদিও মূল সুর প্রয়োগের প্রেরণা সম্বন্ধে, ইতিহাস হিসাবে এবং আলোচনার তথ্য হিসাবে এ সকলই জানার প্রয়োজন সমধিক। বিষয়বস্তু, ভাব, কালানুক্রমিক রচনা-বৈশিষ্ট্য, কাব্যিক রীতির পরিবর্তনের বিচারে শ্রেণীবিভাগ এবং কোথাও কোথাও গীতিপদ্ধতি অনুসারে শ্রেণী-বিভাগই যথেষ্ট, ক্লাসিক পন্থায় প্রাথমিক ছাত্রদের শিক্ষাই চলতে পারে।

সমস্ত আলোচনার দ্বারা একথা প্রমাণ করতে পারা যায় যে রচনারীতির জন্যেই রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। রবীন্দ্রসংগীত গাইবার ভঙ্গিটি হবে সহজ ও প্রাকৃত। গানের অংশ-গুলো সাজাবার বিশেষ স্তর ও নিয়ম-প্রণালী আছে। দেখা যায়, কণ্ঠভঙ্গিকে মোলায়েম করে স্বাভাবিকতা রক্ষা না করলে রবীন্দ্রগীতি ঠিকভাবে গাওয়া হয় না (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। উচ্চারণের পদ্ধতিতেও নির্দিষ্ট রীতি আছে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের রচনার কায়দা সংখ্যাতীত গানের মধ্য দিয়ে বহু কাল ধরে প্রকাশিত হয়ে একটি বিশিষ্ট প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। এই ধারাবাহিকতাকে বুঝে নেবার জন্যে বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীত-সমালোচকগণ ক্রমবিকাশ অথবা ক্রম-পরিবর্তন লক্ষ্য করে রবীন্দ্রসংগীতকে কতকগুলো স্তর বা পর্যায়ে বিভাগ করেছেন। অনেক পর্যায়ের এবং স্তরের গানের বৈচিত্র্য নিয়েই রবীন্দ্র-সংগীত একটি বিশিষ্ট সংগীত-রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্তর বা পর্যায় বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রসংগীত রচনার সময়কাল প্রায় ছয় দশকেরও কিছু বেশি। এই সময়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বিচিত্র ক্রম-পরিবর্তন। ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করে অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতের নানান্ স্তর

বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর নিত্য নূতন ভাঙা-গড়া এবং বহুমুখী রচনার বহু পথ সর্বত্রই গতানুগতিক রীতি থেকে স্বতন্ত্র। এই বিভিন্ন পর্যায়ের রচনাগুলো সবমিলে পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত, একক রবীন্দ্রশৈলীর কথা প্রমাণিত করে। স্তর-বিভাগগুলো এইরূপ—শ্রীস্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে :

(ক) প্রথম স্তর—ধর্মসংগীত, ধ্রুপদী চঙের গান—প্রচলিত ধারার অনুবর্তন, রাগ ও তালের অনুকরণ অব্যাহত। তখন রচনার মধ্যে তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার দিকে—সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কথার মাধ্যমে উচ্চাংগ তথা ক্লাসিকাল সংগীত পরিবেশনের দিকে।

(খ) দ্বিতীয় স্তর : য়ুরোপীয় ধারার অনুকরণে ভারতীয় সুরের প্রবর্তন যা রূপায়িত হল "বাল্মীকি প্রতিভা" গীতিনাট্যে। আইরিশ মেলডিজ, তেলেনা ও টপ্পা, কিছু কিছু রাগদারী কথা। এখানে বাক্যানুসারী হোল সুর, সুরের স্বাধীনতার ওপর প্রভাব বিস্তার করল কথা বা সাহিত্য। রামপ্রসাদী ও য়ুরোপীয় সুরের আধিপত্য এখানেই লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর যেন অখণ্ড একটি যুগের অবিচ্ছেদ্য দুটি দিক। এবং এ যুগের বৈশিষ্ট্যে সাহিত্য ও কাব্যসুষমার প্রাধান্যকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

(গ) তৃতীয় স্তরে এল পুরোপুরি বাংলা দেশের প্রভাব। তখন সুরের প্রাধান্য দিলো দেখা, আর কথা থাকলো যেন বাহক ও অনুচর রূপে। বিষ্ণুপুরী ধ্রুবপদ গানের ধারাকে এই স্তরের গান করেছিল নিয়ন্ত্রিত।

[এই মত সম্বন্ধে মন্তব্য : বিষ্ণুপুরী গানের ধারা হিন্দুস্থানী ধ্রুপদেরই একটি ধারা। তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ ধ্রুপদ রীতিকে নিয়ন্ত্রণ। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ ভঙ্গির বাহকেরা কি একথা স্বীকার করেন? রবীন্দ্রনাথ কি পূর্ণধ্রুপদ রচনা করেছেন? তিনি অলঙ্কারকে স্বীকার করেন নি। অলঙ্কার ছাড়া ধ্রুপদের রূপটি পূর্ণধ্রুপদ বলা যায় কিনা তা আলোচ্য। তা ছাড়া কোন কোন স্থলে "অনুকরণের" কথাও বলা হয়েছে। "অনুকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ" দুটো একসঙ্গে বলা উচিত কিনা ভেবে দেখা দরকার।]

(ঘ) চতুর্থ স্তরে সৃষ্টি হল কাব্যধর্মী গান। কথা ও সুরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রবীন্দ্রনাথের সংগীতে তখন দেখা দিলো ভাবের প্রাধান্য। নৃত্য-নাট্য রচনা, চিত্রবহুল গানের রূপায়ণ এবং জাতীয় সংগীতের অভ্যুদয়। পল্লী-সুরের প্রয়োগ। গানে বিচিত্র নৃত্যছন্দের ভঙ্গিমা।

(ঙ) গীতি রচনার পঞ্চম স্তরে দেখা দিল প্রধানতঃ শান্তরসাত্মক গান—উদাস-করুণ কবির মন তখন রঞ্জিত হয়েছিল অতীন্দ্রিয় লোকের অপার্থিব সুষমায়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীতের চারটি স্তর লক্ষ্য করেছেন :

(ক) প্রথমস্তরে রবীন্দ্রনাথের খানদানি ঘরোয়ানা চীজের আশ্রয় নিয়ে গান রচনা, (খ) দ্বিতীয় যুগে খানদানী কাঠামোর ভেতরেই একটু সুর ও তালের নতুনত্ব, কিন্তু পুরোনো কাঠামোতে রং বদলেছে এবং অলঙ্কার নতুন রকমে সাজিয়েছেন, (গ) তৃতীয় স্তরে এল ভাটিয়ালী, বাউল গান প্রভৃতি রাগ-সংগীতের সংগে দেশীয় সংমিশ্রণ, (ঘ) চতুর্থ যুগটির কীর্তি অসাম। গানগুলির মধ্যে সুসংযত নিয়ম-কানুন ও উদারতার ভাব—"শেষের গানগুলো সম্পূর্ণ ইস্‌থেটিক।" ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রস্মৃতিতে বলেছেন, "অনেকে তাঁর প্রথম বয়সের গান বেশি পছন্দ করেন, তার ভাষা ও ভাব সরল ও মর্মস্পর্শী বোলে। তিনি নিজে আমাকে বলেছেন : 'আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকারগুলি ইস্‌থেটিক।"

শ্রীসৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর গ্রন্থে চার স্তরের বিভাগ স্বীকার করে নিয়েছেন।

শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা "রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা" গ্রন্থে তিনটি স্তরের পরিকল্পনা করেছেন। গঠন-বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই স্তর-বিভাগ :

(১) ১৮৮১ থেকে ১৯০০ (২) ১৯০১ থেকে ১৯২০ এবং (৩) ১৯২১ থেকে ১৯৪১।

এই তিনটি স্তর-বিভাগের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা : প্রথমে আদ্য অথবা শিক্ষানবীশ কাল, দ্বিতীয়ে মধ্য যুগ অথবা রাগসংগীত বা হিন্দুস্থানী সংগীতের উপাদান নিয়ে কাঠামোর উপর আতিশয্য ও অলঙ্কারের বাহুল্য বর্জন করে গান রচনা এবং তৃতীয় স্তরে বা শেষ যুগে অনুভূতি-প্রধান, রাগ-রাগিণী ও কাব্য-রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম।

স্তর-ভাগ অথবা পর্যায়-বিভেদ সম্বন্ধে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ স্থানে স্থানে বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুসারে প্রসঙ্গক্রমে নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। শ্রীস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন যে স্তর-ভাগের ওপর তেমন বিশেষ করে নির্ভর করা চলে না। তবে স্তর-ভাগগুলো সংগীত-বোধের ও সুর-প্রয়োগের ক্রমবিকাশ এবং ক্রমপরিবর্তন দেখাতে সাহায্য করে সন্দেহ নেই। যাঁরা

সংগীতকে রাগসংগীতের সূত্র বা লক্ষণ দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের স্তর বা পর্যায় বিভাগগুলো তিনটি যুগের চিত্রে বিভিন্ন ধারায় বোঝাতে পারলেই সুবিধে হতে পারে বলে মনে হয়। প্রথম যুগের গানে যে-ধ্রুপদী রূপই অনুসৃত হোক না কেন, কোথাও 'অনুকরণ' শব্দটি ব্যবহার করা উপযুক্ত মনে হয় না। বরং রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদভঙ্গিকে হজম করে স্বচিন্তিত ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে রূপদান করেছেন বলা যায়, কারণ ধ্রুপদভঙ্গির গানগুলোকে নানান কারণে সম্পূর্ণ ধ্রুপদ (অলঙ্কৃত) রূপে গাইবার অধিকার রবীন্দ্রনাথ দেন নি। এ গানে মীড়, গমক, বাট, মূড়কী, ঝটকা ও নানান স্বর প্রয়োগের প্রত্যুৎপন্ন (Extempore) কায়দার ব্যবহার স্বীকৃত নয়। অলঙ্কারকে পুর্ণরূপে স্বীকার করা যায় না বলেই রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদচালের রচনাগুলোও স্বতন্ত্র ভাবেই শেখার ও গাওয়ার দরকার হয়। প্রথম যুগের গান রবীন্দ্রনাথের কাছে "ইমোশনাল" হোক বা ধ্রুবপদের স্থায়ী অন্তরা থেকে সুরকে আহরণ করে নিজের মতে প্রয়োগ করাই হোক, কোথাও কথার গাঁথুনি শ্লথ অথবা কাব্যগুণ থেকে মুক্ত, মামুলী গীত নয়। তাছাড়া প্রথম যুগেই সংগীতের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা বৈচিত্র্যের সার্থক experiment করেননি একথাও বলা চলে না। স্তরবিভাগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ ধরণের কোন ইঙ্গিত দেন নি, বরং সামগ্রিক ভাবে তাঁর ব্যক্তিগত সংগীত-মতকে বিশ্লেষণ করেছেন—বিষয়বস্তু এবং কথার প্রতি লক্ষ্য রেখে। এইজন্যে, তাঁর গানের শ্রেণীবিভাগে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলোও এসম্পর্কে বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মোটামুটি রবীন্দ্রসংগীতের গঠন-প্রকৃতিতে ক্রমপরিবর্তন এবং বিভিন্ন সংগীতরূপের স্তর বা বিভিন্ন পর্যায় বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্ররূপে বিকশিত হয়েছে। বিশেষ ছকে ফেলে রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনা বা অনুশীলন সেজন্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতে সুরপ্রয়োগের বহুমুখিতার বিচারই এই সব পর্যায়ের বা স্তরের মধ্য দিয়েই স্বীকৃত। শিক্ষার সময়ে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ধ্রুপদরূপের গানগুলো ধ্রুপদের মত মৌলিক রীতিতে অভ্যাস হয়ত চলতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর ও কথা উচ্চারণ, অলঙ্কার-প্রয়োগ, ভাব-বৈচিত্র্য স্বতন্ত্র গায়কীর দাবী করে। এজন্যে দেখা যায় বহু আলোচনা, নির্দেশনা ও উৎসাহ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানকে মৌলিক ধ্রুপদের মতো সাজিয়ে ভুল করা যায়না। শ্রীস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ ও ধামার গানগুলিতে রাগরূপ, রস, ভাব, গাম্ভীর্য ও লালিত্য পুরোমাত্রায় বজায় আছে, যদিও প্রকাশভঙ্গীতে পার্থক্য রয়েছে।" এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলতে পারি, প্রকাশভঙ্গি গানের প্রাণ, "Form is the soul" এবং সেজন্য প্রকাশভঙ্গির পার্থক্যের জন্যেই সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি ও রূপটিকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্র-সমসাময়িকগণ

দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্রলালের গান আজকের দৃষ্টিতে রবি-প্রদীপ্ত যুগের আর একটি বিশিষ্ট জ্যোতিষ্কের দীপ্তির অনুরূপ। রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে যেখানে রজনীকান্ত তাঁর গানের বিষয়বস্তুপ্রাধান্য এবং সুরসংযোজনা ইত্যাদিতে সহজ-সরলতার জন্য একটি আসন করে নিয়েছেন,সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্য একটি কারণে গীতরচনায় সার্থকতা লাভ করেছেন। গীতরচনা প্রথমে নাটকের প্রধান একটি দিক হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করে। কিন্তু তারও অতিরিক্ত—নব-জাগ্রত দেশপ্রীতির উপযুক্ত গীতিসৃষ্টির জন্যে নতুন ধরণের সুর-সংযোজনার প্রয়োজন হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের এ দিকটি যুগান্তকারী রূপ ধারণ করে। জাতীয়তা-বোধ মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় সুরপ্রয়োগের একটি রীতি উদ্ভাবন করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তখনও সুরসংগতি বা harmonisation-এর পন্থা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিন্তু সমবেত কণ্ঠে বীরত্বদ্যোতক গান রচনার স্পৃহা তাঁর ইতিহাসপ্রবণ মনটিতে প্রবল বেগ সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের মনে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাবও বিশেষ ছিল। শুধু সুরসংযোজনার বিচারে ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়োজন সামান্য। কয়েকটি গানের রচনা-রীতিই এ বিশ্লেষণের একমাত্র তথ্য। বিশেষ কয়েকটি গান, যথা—(১) ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা (২) ভারত আমার ভারত আমার (৩) বঙ্গ আমার জননী আমার (৪) যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ—এ পর্যায়ে বিচার্য। দেখা যেতে পারে যে গানগুলোর সুর আবেগ-প্রকাশের উপযোগী মুক্ত-কণ্ঠের দাবী করেছিল। জাতীয়তাবোধ যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল, এ ধরণের চারণ কণ্ঠের সুর-প্রযোজনাও কতকটা মুক্ত মনের সৃষ্টি। শুধুমাত্র একথা বলা শ্রেয় যে জাতীয়তা[illegible] এ গানগুলো একদিকে নাটকীয়তার অভিঘাতের সৃষ্টি, অন্য[illegible] প্রেরণায় দিশী [illegible]তির সুর-সংযোজনার প্রভাব বিবর্জিত—যদিও এর [illegible] দেশের মাটিতে। আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে গানগুলো প্রতি পর্বে সুরের [illegible]জনায় সমবেত কণ্ঠে গীত হবার উপযুক্ততা প্রমাণিত

করে, প্রতি পংক্তির অংশে অংশে সুরগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে। গীতি-রচনা—চিরাচরিত পদ্ধতিতে রাগরীতিকে তথাকথিত উপায়ে স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগে সংরক্ষণ, বক্তব্যকে সুরকলির দ্বারা প্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয়তার আবেগকে সুরের বেগ ও শক্তি দান করবার জন্যে সুরের উপযুক্ত স্তব ও সুবকলি কল্পনা করেন। এ কল্পনার পরিসরটি সামান্য ও সীমিত, কিন্তু এর প্রভাব অপরিসীম; তা ছাড়া গীতি রচনার একটি দিকে ঐতিহাসিক প্রারম্ভ। এ গানের বিষয়বস্তুতে সুরের কলি ও পর্ব যোজনার জন্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত মৌলিক। এ অর্থে আমরা দেখব সমসাময়িক রজনীকান্তের রচনায় অনুরূপ মৌলিকতা নেই। অর্থাৎ আজও গীতি-ভঙ্গি অথবা সুর-রচনার দু-একটি ক্ষেত্রে বলা যায় 'হাঁ, এ হচ্চে দ্বিজেন্দ্রলাল।' রবীন্দ্র-সমসাময়িক কালে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকে জনগণের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে অন্যের গাইবার objective ধরণের সুর-রচনা বলা যায়।

এখানে সুরসৃষ্টিতে গভীরতা, সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতি থাকা সম্ভব নয়। গান যেমন আত্মভাবপ্রসারী নয়, কথাগুলোর গায়নপদ্ধতি সাধাসিধে এবং বর্ণনাত্মক, বিন্যস্ত, সুরকলিগুলো ঠিক তেমনি। এজন্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের সুর নাটকীয় প্রক্রিয়ার ফল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রঙ্গরসিকতা এবং হাসির গানের দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্তকেও প্রভাবিত করেছিলেন। হাস্যরস-সৃষ্টিতে রাগসংগীতের সুরপ্রয়োগের তেমন কোন সুযোগ নেই। রাগ-সংগীতের প্রতি পদক্ষেপেই গায়ক ও শ্রোতার মন রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত 'অনির্বচনীয়তা'র দিকে স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই চলে যায়। এক্ষেত্রে আবেগ-গুলোর বিস্তৃত বিভাগ করে পরীক্ষণের সুযোগ আছে। কিন্তু হাস্যরসের বেলায় তা অবাস্তব। অবশ্য আজকের যুগে রাগ-সংগীতে বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের নানা পন্থা ও রীতি পরিস্ফুট হয়েছে, সে বিষয়টি স্বতন্ত্র ভাবে বিচার্য। কিন্তু হাস্যরসোদ্দীপক গান বিষয়বস্তু-প্রধান বলেই, তাতে সুর সংযোজনার পরিসর সংকীর্ণ এবং ভঙ্গিপ্রধান। রাগের মধ্যে ঔদাসীন্য, দুঃখ, ব্যথা, ক্লান্তি প্রভৃতি ভাবগুলোর নির্দিষ্ট রচনীয় প্রকাশ নেই; এজন্যে রাগগুলো আবেগসৃষ্টিতে যে ভাবে সহায়ক হয়, ক্রোধ বা হাস্য প্রকাশে সেরূপ হতে পারে না, এ জন্যেই এই ভাবগুলোতে ভঙ্গির প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ দু'একটি জায়গায় ভঙ্গিকেও হাস্যরসের কাজে লাগিয়েছেন। যথা, 'হেঁচ চো'-কে

গানের মধ্যে প্রয়োগ একটু নাটকীয় রীতি বলা যায়। অর্থাৎ হাস্যরসের গানে সুরদানে প্রকাশভঙ্গির আতিশয্য ছাড়া আর তেমন মৌলিকতার উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সুরের মাধুর্য ও সূক্ষ্মতা মানবমনকে যে পরিমণ্ডলে নিয়ে যায়, সেখানে কি হাসি সৃষ্টি হতে পারে না? দুটো অসম সুরের আকস্মিক ও অতর্কিত বিন্যাস করে বিশিষ্ট গায়ক শ্রোতার মধ্যে হাসির সৃষ্টি করতে পারেন হয়ত। কিন্তু সে সূক্ষ্মতা ও কলানৈপুণ্য, হাস্যরস সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র।

ধরা যাক, পেটুকতা, চৌর্য, হঠকারিতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলোর সঙ্গে সৎবৃত্তির একটা বিরোধ আছে। এই বিষয়বস্তুতে যদি কীর্তনের সুর প্রয়োগ করা যায় তবে হয়ত স্বভাবতই একধরণের রসিকতার সৃষ্টি হতে পারে শুধু বিপরীত ভাব-স্থাপনার দ্বারা। দ্বিজেন্দ্রলাল তা করেছেন এবং রজনীকান্ত তাঁর দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। এ অর্থে দ্বিজেন্দ্রলাল যতটা মৌলিক, রজনীকান্ত ততটা মৌলিক নন। কিন্তু তবুও এ কথা বলা চলে যে সাহিত্যের এবং ব্যবহারিক সংগীতের দিক থেকে হাসির গানের মূল্য যা-ই থাক না কেন, সংগীতের দিক থেকে এর মূল্য সামান্য। হাসির উদ্দেশ্যে সুরসংযোজনার পন্থা যে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, এমন কথা বলা চলে না। পল্লী-গীতির একটি অংশে স্থূল রসিকতা বিশেষ অঞ্চলে দেখা যেতে পারে। ৺সুকুমার রায়ের রচনায় সুর প্রয়োগ করে সার্থক হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে (গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং আকাশবাণীর লঘুসংগীত বিভাগে)। লৌকিক গীতিতে বহু পর্যায়ের রসিকতা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের প্রয়োগ হয়ে থাকে। ভাঁড়ামোর ব্যাপারটিতেও সুরপ্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়। কবিগানে স্থূল হাসি প্রকাশের ক্ষেত্রটি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কিন্তু লৌকিক গীতিই প্রধানতঃ এই ভাবটির অবলম্বন। ভক্তিমূলক রচনায় রামপ্রসাদের সূক্ষ্মরসিকতাও লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিন্তু তাতেও সুরের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। অর্থাৎ হাস্যরসাত্মক গান বিষয়বস্তু-প্রধান বলেই সংগীতাংশে দরকার হয় ভঙ্গি। সুর সংযোজনা বা সঙ্গীত প্রকাশের বিশেষ রীতির পরিসরের মধ্যে তা আসে না। এ প্রকৃতির হাস্যরস বা রসিকতা সংগীতের বিষয়বস্তু হতে পারে কিন্তু কতটা সংগীত হতে পারে তা বিচার্য।

মোটামুটি সংগীতের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকতা দেশাত্মবোধক

সংগীতের পর্ব ও সুরকলি বিন্যাসের উদ্ভাবনীতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-জ্যোতিষ্কের দীপ্তি অসামান্য ও অনন্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের জগতে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। গানে হাস্যরস সৃষ্টির মূলে যে আকস্মিকতা রয়েছে, তারও মূলে আছে নাটকীয় মনোবৃত্তি। ভাবতীয় সংগীতের সুরজগৎটা আত্মকেন্দ্রিক বলে এর মৌলিকতা আমরা সহসা বুঝে উঠতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের প্রবল lyric (গীতিকবিতা)-এর বন্যায় সে সময়ে যে ভাবে মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের সীমিত পরিসরের এ নাটকীয় গুণগুলিকে বিশ্লেষণ করে বুঝবার সুযোগ তেমন ভাবে হয়ে ওঠে নি।[১] অন্যদিকে রাগভাঙ্গিম গানগুলোর তেমন প্রসারও হয় নি।

---

১ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে শ্রীদিলীপকুমার রায়:

(১) ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উক্তির দ্বারা সমর্থিত—"তাঁর গানের মধ্যে য়ুরোপীয় আমেজ যদি কিছু এসে থাকে তাতে দোষের কিছুই থাকতে পারে না, যদি তার মধ্য দিয়ে একটা নতুন রস আপন মর্যাদায় ফুটে ওঠে।"

(২) টপখেয়াল ভঙ্গি দ্বিজেন্দ্রলাল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছ থেকে শেখেন, দুজনে ছিলেন বাল্যবন্ধু। (সপ্তম পরিচ্ছেদে টপ্পা'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)

(৩) রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা তিন শ্রেণীর গানই রচনা করেছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল প্রবণতা ছিল ধ্রুপদের দিকে আর দ্বিজেন্দ্রলালের খেয়ালের দিকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৪) দ্বিজেন্দ্রলালের কতিপয় গান রাগভঙ্গিম (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

শ্রীস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন: (১) দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনায় বিলিতি সুরের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা মৌলিক, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেরণা অনুবাদ-প্রবণ, (২) হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চেয়ে কৌতুক রসের প্রযোগ করেছেন বেশি, (৩) কোরাস্ বা সমবেত কণ্ঠের বাংলা গানের আধুনিক রীতির প্রথম প্রবর্তক, (৪) বীররস সমাবেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, (৫) দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলায় টপখেয়াল রীতির প্রবর্তক কথাটি অযৌক্তিক। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বেও টপখেয়ালের বহুল প্রচার ছিল। ডক্টর অমিয়নাথ সান্যালের মত সমর্থন করে ইনি বলেন, টপখেয়ালের রীতি প্রবর্তনের উৎস সন্ধান করা যায় শ্রীঅঘোর চক্রবর্তী থেকে। রবীন্দ্র-সমসাময়িকগণ ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়ান। (রবীন্দ্র প্রতিভার দান)

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে 'বাংলার গীতিকার' গ্রন্থে বর্ণিত কয়েকটি লক্ষণ: (১) পাশ্চাত্য সংগীতের সার্থক প্রয়োগ এবং সে জন্যে সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁকে একঘরে করবার চেষ্টা

রজনীকান্ত

রবীন্দ্র-সমসাময়িক গীতি-রচয়িতাদের মধ্যে রজনীকান্ত সেনের গানের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে সুরসংযোজনার ক্ষমতা রজনীকান্তের রচনার প্রধান গুণ নয়, স্বকীয় সংগীতপ্রতিভা রজনীকান্তের গান রচনার মূলে ছিল একথা নানা জীবন-কথায় ও স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। তন্ময় হয়ে যাঁরা রজনীকান্তের গান শুনেছেন তাঁদের কথা থেকেই বোঝা যায় স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-প্রতিভার অভিব্যক্তি রজনীকান্তের performance বা প্রকাশ-শক্তিতেই বিশেষ ছিল। সেই সুকণ্ঠের রেশ প্রসারিত হয়ে জনচিত্ত জয় করেছিল। সেইরূপ সুকণ্ঠের মজা এই যে, সে অভিব্যক্তি যদি প্রকৃত মনজয়ী কথাকে অবলম্বন করতে পারে, তবে কোন না কোন রূপে সে কালজয়ী হয়ে বেঁচে থাকে। বহু পল্লীগীতি মালিকানার সাক্ষ্য বহন করে না, কিন্তু হয়ত কোন কালজয়ী কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়ে আজও নানা ভাবে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। সংগীতের ক্ষেত্রে আজ সূক্ষ্মতা ও জটিলতা এসেছে, সেজন্যে সহজ উদাত্ত কণ্ঠের প্রকাশে মহিমা ধরা পড়ে না, বিশেষ করে গানের যান্ত্রিক প্রকরণে সহজ সরল অভিব্যক্তি কানে ধরা পড়বার সুযোগ হয় না। বহুবর্ণের বৈচিত্র্যের দরুণ এরূপ ব্যক্তি-প্রতিভার অসামান্যতা সহসা লক্ষ্য করা যায় না। তাই আজ আর রজনীকান্তের মত প্রতিভার জন্ম সম্ভব নয়, সম্ভব হলেও সূক্ষ্মতা ও জটিলতার পাকে পড়ে নতুন রূপে ধরা না পড়লে গীতিরচনা স্বীকৃত হতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্র-সমসাময়িক যুগে বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় নি, সংগীতের ক্ষেত্রে সুরকার গীতিকার এবং গায়কীর ক্ষেত্রগুলো স্বতন্ত্র হয় নি। সেজন্যে রজনীকান্ত রবীন্দ্র-আলোতে উদ্ভাসিত আকাশে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মাত্র। কিন্তু তবুও দীপ্তির কারণ ব্যাখ্যা করা দরকার।

(পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত আকর্ষণের স্বপক্ষে উক্তি "বিলাতে প্রবাসে নানা বন্ধুর নিকট ছোটখাট ইংরাজি গান শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম, বাঃ, এ মন্দই বা কি? ক্রমে তাহার অনুরাগী হইয়া আরও শুনিতে চাহিতাম এবং শেষে আমার ইংরাজি গান শিখিবার প্রবৃত্তি হইল"), (২) আবেগপ্রবণতা ও মর্মস্পর্শী আকুলতা, (৩) দৃপ্তভঙ্গী ও সুর বিস্তারের সহজ রূপ (কারণ, তাঁর টপ-খেয়ালজাতীয় গানের মূলে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিদ্যমান।) (৪) বাংলা সংগীত গঠনের পর্যায়ে একজন প্রধান সুরস্রষ্টা—শুধু স্বদেশী সংগীত এবং হাসির গানের রচয়িতা নন, (৫) দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের প্রকৃত রূপটি থিয়েটারের জন্যে অথবা রঙ্গালয়ের বিকৃতির ফলে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। (শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র)

রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গীত-পরিবেশের কথা বলেছি। সেখানে কথার ঐশ্বর্যের সঙ্গে বহু বিচিত্র সুরের ঐশ্বর্য সংমিশ্রিত হয়েছে এবং একটি রূপ-সমগ্রতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু রজনীকান্তের রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সরলতা। কাব্যিক রীতি থেকে মুক্ত কথার সহজ সরলতার মূল্য গানের জগতে অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের গানের পাশাপাশি সেজন্যে যেমন সহজ পল্লীগীতি শোনবার শ্রোতা রয়েছে, তেমনি সাধারণ ও সহজ ভাব প্রকাশক গান অনুসরণ করবার চেষ্টাও শ্রোতামাত্রের মধ্যে স্বাভাবিক। সাধারণ সংগীতের ক্ষেত্রে বাগ বৈদগ্ধ্য বা কাব্যিক ভাবপ্রকাশের সুযোগ অতি সামান্য। কাব্যিক রী'র কথা-রচনায় সুরসংযোগ সাধারণের মন সহজে আকৃষ্ট করতে পারে না। যদি কাব্যকে গান বলে চালান যেত তবে সব কবিতাই গান হতে পারত। সুর-প্রয়োগের জন্যেই গীতিরচনার আঙ্গিকের সৃষ্টি এবং সেখানে সহজ-সরলতাও একটি বিশেষ দাবী।

সমসাময়িক রুচি অনুসারে কতকগুলো চিরন্তন আবেদনের সহজ অভিব্যক্তি-সমন্বিত গান সাধারণতঃ সহজ চলিত সুরে অভিব্যক্ত হতে দেখা যায়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয়ই প্রধান, সুর শুধু প্রকাশের অবলম্বন কিন্তু তার আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য নগণ্য। রজনীকান্তের গানে সুরের আঙ্গিক অপ্রধান। রজনীকান্তের রচনার ভক্তিমূলকতা, দেশপ্রীতি এবং জীবনসমন্বিত গীতি ছাড়া মৌলিকতা স্ফূর্ত হয়েছে হাস্যরসাত্মক গানে ও বিদ্রূপাত্মক রচনায়। এ ধরণের রচনায় সুরসংযোজনার বৈশিষ্ট্য তেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে না, এ কথা পূর্বেই বলেছি। কাজেই রজনীকান্তের গানের সহজ, সরল অভিব্যক্তি এবং প্রচলিত সুর-প্রকরণের বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে রজনীকান্তের সংগীতের আকর্ষণ শুধু সরল সুর সংযোজনার পরিচ্ছদের অন্তরালে ঋজু এবং জটিলতাহীন প্রত্যক্ষ ভাবসৌন্দর্যের আকর্ষণ। উদাহরণ স্বরূপ যে গানগুলো সাধারণ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত, সেগুলোই ধরা যাক: (১) পাতকী বলিয়ে কিগো, (২) তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে, (৩) তোমারি দেওয়া প্রাণে, (৪) আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, (৫) কবে তৃষিত এ মরু (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এই গানগুলোর সহজ সরল আবেদন প্রচলিত সাধারণ ভাবের অনুষঙ্গী বলেই এদের কথার সহজ বিষয়বস্তুতেই আকর্ষণ বেশি হয়, কিন্তু সুরের বৈচিত্র্যের দিক থেকে এগুলো সরল, পরিচিত অর্থাৎ, সুরের অতি সাধারণ সংবেদন মাত্র। রজনীকান্তের

গানে সুরের প্রযোজনায় তেমন কোন ব্যক্তিত্বের আরোপ হয় নি। রজনীকান্ত রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের যুগের গীতি-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম ঐতিহাসিক সত্তা এবং আজ সে গানের নির্দিষ্ট আসন রয়েছে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে। ইতিহাস প্রকাশ করছে, রবীন্দ্রনাথের রচনার কাব্যিক এবং কলাসম্মত ভাষা ও সুরের উদ্ভাবের পাশাপাশি, স্বতন্ত্র ধরণের সহজ-সরল-ঋজুভঙ্গির কথা ও সুরের একটি বিশিষ্ট আসন হয়েছিল—গীতিকারের বিষয়বস্তুর মৌলিকতার জন্যে। এজন্যে রজনীকান্ত বিশেষভাবেই স্বভাবকবি, সুরসম্পদ তাঁর জীবদ্দশার কান্তি ও ঐশ্বর্য। এ যুগে সে কান্তির ছায়া অনুসরণ করে আমরা তাঁর ব্যক্তিত্বকে বুঝতে পারছি। অনেকটা ঐতিহাসিক এবং অতীতের প্রতি সুস্থ সম্মানবোধ নিয়ে রজনীকান্তের গান শোনা আজ আমাদের কর্তব্য।

অতুলপ্রসাদ

অতুলপ্রসাদের সংগীত-জগৎটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র। রজনীকান্তের আবেগপ্রবণতা এবং দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় বৃত্তি অতুলপ্রসাদে নেই। অতুলপ্রসাদের মৌলিক সংগীতপ্রীতিই গীতিরচনার মূল আবেদন। সংগীত-কলার প্রতি অতুলপ্রসাদের পক্ষপাত থাকায় তাঁর গানের মূল আবেদনটা হয়েছে সুর-জনিত, কথার রচনা সেজন্যে সহজ ভাবপ্রকাশমূলক। অতুলপ্রসাদ যেখানে সমসাময়িক দেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন সেখানে অবশ্য চলিত পন্থায় গান রচিত হয়েছে। শুধু ভারতীয় সত্তার প্রতি প্রীতি, বাঙালীয়ানার প্রতি আকর্ষণ, ভাষার প্রতি ভাবতন্ময়তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্র-অনুসৃত সুররচনার পন্থা তিনি এসব ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন।

অতুলপ্রসাদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল হিন্দুস্থানী গানের লঘুখেয়াল, ঠুমরী ও দাদরার সঙ্গীতরূপগুলোর সঙ্গে এবং তাকে সহজ ভাবেই প্রয়োগ করেছেন। সুরকলিগুলো সাদাসিধা ভাবে রূপান্তরিত করেছেন, বাংলা কথার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। অর্থাৎ সুরকলির যুক্তিসংগত প্রয়োগে কথার সঙ্গে সমতার সৃষ্টি করেছেন। অতুলপ্রসাদের সংগীত রচনার আরম্ভ সুর-প্রবণতা থেকে হলেও কাব্যিক ফ্রেমটি তিনি শক্ত বাঁধনে বেঁধেছিলেন। এজন্যে অতুলপ্রসাদের অনেক গানেই কাব্যিক ভাবপ্রবাহকে বাধা দিয়ে সুর বিস্তার

করা যায় না। যদিও কোন গানে সুরকে হয়ত বন্ধন থেকে মুক্ত করবার কতকটা পথ প্রশস্ত করে রেখে গেছেন কিন্তু গায়ক মাত্রেই সেই স্বাধীনতা গ্রহণের জন্যে চেষ্টা করেন না। দাদ্‌রার রীতিতে রচিত একটি অতি-পরিচিত গান "ওগো নিঠুর দরদী তুমি একি খেলছ অনুখন" ধরা যাক। ঠুমরী ও দাদ্‌রা প্রেমের গান। আবেগের ছোট ছোট অনুভাবগুলো যে সুরের কলিতে ভঙ্গির দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকে 'বোল' বলা হয়ে থাকে। দাদ্‌রা গানের উপযুক্ত বোল তৈরির সুযোগ এ গানটিতে স্পষ্ট ভাবেই রয়েছে, কিন্তু সুর-সহযোগে এরূপ ভাববিস্তৃতিতে অতুলপ্রসাদের গানের গায়করা অভ্যস্ত নন। অতুল-প্রসাদের শেষ জীবনের রচনা "ডাকে কোয়েলা বারে বারে" গৌড়মল্লার রাগে রূপায়িত; মনে পড়ে, স্বরলিপিসহ 'বিচিত্রা'তে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গানের সময় তুনি খেয়ালের রূপদান করতে কোন গায়ককে দেখা যায় নি। 'সে ডাকে আমারে' ভাতখণ্ডেজীর 'ভবানী দয়ানী'র ছায়া—কিন্তু, কেউ সেভাবে গান করে না। ভৈরবী অথবা খাম্বাজের ঠুমরী-রীতির প্রযোজনা সত্ত্বেও অনুরূপ গানগুলো কোন গায়কীতে সে রূপ পেয়েছে বলে জানি না। অন্ততঃ আজকালের রাগ-প্রধান রীতির রূপদানও তাতে অজ্ঞাত। এর কারণ দুটো, অতুলপ্রসাদের গীতিরচনাও কাব্যিক-রীতি-প্রভাবিত, রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত নন। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের গানের সম্বন্ধে প্রতিটি কথা অতুলপ্রসাদের গানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ বাংলা গানে, বাংলা রচনাকে সুর-সম্পূর্ণ করে হিন্দুস্থানী গানের মত করে তোলা সম্ভব নয়, তাতে বাংলার ভঙ্গি রক্ষিত হয় না। কিন্তু, একথা সত্য যে অতুলপ্রসাদ সুর রচনায় লক্ষ্ণৌতে প্রচলিত সাধারণ রাগসংগীতের রীতি প্রয়োগ করেছেন। দুয়ের সমন্বয়ে অনেক স্থানে রাগের রূপ বা ঠুমরীর কায়দা পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ হয়েছে। তবে, গানগুলোকে সেভাবে গাওয়া হয় না, কারণ কথা ও শব্দ রচনা গীতরীতিতে প্রাধান্য লাভ করে। তবুও বলব, কথা ও সুরের সমন্বয়ে অনেক স্থানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতিচ্ছবি সম্ভব হয়েছে। এসব গানের গায়কীতে স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ যথেষ্টই রয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মতো বাউলের সুরও অতুলপ্রসাদের সার্থক অবলম্বন হয়েছে।

অতুলপ্রসাদের সংগীতের বিশ্লেষণে যে কথা বিশেষ করে বলা যায় তা হলো হিন্দুস্থানী গীতি-পদ্ধতিকে মৌলিক রূপে বজায় রেখে যে বাংলা ভাষায়

রূপান্তরিত করা যায়, এ পরীক্ষায় তিনিই প্রথম সার্থক হলেন। কিন্তু একটি ইঙ্গিত অতুলপ্রসাদের মধ্যেও স্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যায় যে হিন্দুস্থানী রাগানুগ গান রূপান্তরিত করলেও, এই ধরণের বাংলা গানে সুরবিস্তারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়, সামান্য পরিমাণে মুক্তি পাওয়াই সম্ভব। এই সামান্য মুক্তি রাগ-প্রভাবিত এবং ঠুমরী-প্রভাবিত এসব গানে আশা করা যায়। অতুলপ্রসাদের গীতিরচনা রজনীকান্তের মত কবি-মন-প্রণোদিত নয়, অর্থাৎ প্রাথমিক প্রধান উৎস 'সুর' বলেই সংগীতের দিক থেকে এ গান আরও বৈচিত্র্য-প্রধান। এজন্যেই আজও অতুলপ্রসাদের গান রবীন্দ্রনাথের গানের পাশাপাশি চালু আছে। মাত্র দুটো দেশপ্রেমের গানের সুরে অতুলপ্রসাদ সুর-প্রযোজনার একটি মৌলিক শক্তিকেন্দ্র সঞ্চয় করে রেখে গেছেন। বলা হয়ে থাকে "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী" ইতালীয় গানের সুরে রূপায়িত, কিন্তু সে যাই হোক, আজকে এ গানটির মধ্যে সুরের নতুন রূপ ধরা পড়ছে। সুরপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এ গানটির মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক গানের রীতির দিক থেকে পূর্বসূরীর কৃতি বলে স্বীকার করা যেতে পারে। রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে এ তুলনায় অন্যান্যের রচনার বৈশিষ্ট্য রয়েছে শুধু তাঁদের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে; রজনীকান্তের এবং দ্বিজেন্দ্রলালের সাধারণ গান অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রীতির পরিচায়ক মাত্র।

বিষয়বস্তু-প্রধান গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের মৌলিকতা যেমন বৃহৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশক এবং সুরযোজনার মৌলিকতাও তাতে যেমন উজ্জ্বল, অতুলপ্রসাদের রচনার মৌলিকতা তেমনি হিন্দুস্থানী রীতির বাংলা গানের প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত। অতুলপ্রসাদের গান কতকটা আধুনিক যুগের গোড়ার রচনার মতই অধুনা-প্রচলিত সুর সংযোজনার দিক। অতুলপ্রসাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার পরিবেশসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নেই, কোন সুরভঙ্গিতে অতুলপ্রসাদের রীতি বলেও কোন বিশিষ্ট রূপের নির্দেশ দেওয়া চলে না, কিন্তু গানের মধ্যে এখনও প্রাণ-স্পন্দন রয়েছে। এই জীবনের লক্ষণটি অতুলপ্রসাদের গানের মূল্যবান প্রকৃতি। রাগসংগীত ব্যবহারের তাৎপর্য আজ আমাদের কাছে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা দিয়েছে। এ বিষয়ে অতুলপ্রসাদই প্রাথমিক দৌত্য করেছেন। ধারাটি নজরুলের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্ফুট। অথচ অতুলপ্রসাদের আপনার কাব্যিক পরিমণ্ডলটিও গৌণ মনে হয় না, যে জন্যে রবীন্দ্রসংগীত-গায়কেরাই বিশেষ করে অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে থাকেন।

কতকটা সে জন্যেও তাঁর রাগ-সম্বলিত গানগুলোতেও রাগরূপ প্রকট করা হয় না, কথা-সম্পদই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

কথা-সম্পদের মধ্যে অতুলপ্রসাদের আর একটি অপূর্ব গুণ গীতি রচনার দিক থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। ২০৪টি গীতি রচনার মধ্যে অতুলপ্রসাদ যে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার একটি বৈশিষ্ট্য—গানের প্রথম কলির আবেদনটিই গানেব কেন্দ্রস্থল। অতুলপ্রসাদ কতকগুলো সহজ ও সার্থক প্রথম কলি বাংলা গানে উপহার দিয়েছেন। এরূপ সামান্য সংখ্যক গীতি রচনার মধ্যে এরূপ ব্যক্তিত্বেব প্রতিষ্ঠা এবং সংগীত-সত্তার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি আর কোথাও হয় নি। গানগুলি শক্তিমান সুর-অভিব্যক্তির ধারকরূপে অতুলনীয়। জনপ্রিয়তা ও কথা-সম্পদেব সহজ আকর্ষণী শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত অতুলপ্রসাদের গান অনেক কারণেই কাব্যসংগীতের একটি বিশিষ্ট সারিতে স্থান লাভ করে যেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা রজনীকান্তের গান পৌঁছয় না। মোটামুটি, আজ যেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িকদের ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়ে স্মরণ করছি এবং আনুষ্ঠানিক প্রযোজনে গানকে প্রয়োগও করছি, সেখানে সে গানগুলোকে নতুন যুগের আঙ্গিকে রূপায়িত করা দরকার। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রীতিমূলক গানগুলোকে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতে বাজালে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাবে চিনে নেওয়া যায়। রজনীকান্তের একটি কি দুটি গানকেও সে-রূপদান করা যেতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদের দেশপ্রীতিমূলক গানের আধুনিকতম রূপায়ণ সহজ বলেই তা আজও চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বিচার্য। পরাধীনতার যুগে দেশপ্রীতিমূলক সংগীতের যে মূল্য ছিল, আজকের যুগে সে গানের অনুরূপ মূল্য নেই, সে জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ও পরিবেশ ব্যতীত এ ধরণের সংগীতেব বিষয়বস্তু সহজভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না। আধুনিক কালে জনমনকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও উন্নতিকামিতার দিকে প্রভাবিত করবার জন্যে কার্যক্ষেত্রে এইপ্রকার গানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে সুর সৃষ্টি এবং সংগীত রচনা কতটা সম্ভব তা বিচার্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের কয়েকটি গান অত্যন্ত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে এবং নতুন যন্ত্র-সংগীত-সহযোগিতার দ্বারা কতকটা রূপান্তরিত হয়েছে।

অতুলপ্রসাদের কতকগুলো গানেব গায়কী রীতিতে আরো স্বাধীনতার প্রয়োজন। এসমস্ত গানে রাগরূপকে প্রাধান্য দিয়ে, গীতির কাব্যরূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রয়োজন বিশেষে খেয়াল বা ঠুমরী রীতি প্রয়োগ দরকার। অর্থাৎ রাগানুগ

গানগুলোতে যথোপযুক্ত পরিমাণে রাগপ্রধান রীতি এবং ঠুমরী রীতি প্রযুক্ত হলেই ভাল। এ গানগুলোর গায়কীকে রবীন্দ্র-পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে পারলেই স্বাতন্ত্র্য আরও স্পষ্ট হবে।[১]

নজরুল

বাংলা সংগীতের মধ্যযুগে ও আধুনিক গানের পূর্ব যুগে, বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত, যিনি গীতিকার তিনিই সুরকার ছিলেন। ব্যক্তিনামাঙ্কিত এই পূর্বতন যুগ বলতে বুঝি রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের যুগ। এঁদের গীতি রচনার বিচিত্র ধারার সঙ্গে আধুনিক গানের নতুন গীতিপন্থার মধ্যবর্তী সেতুস্বরূপ রয়েছেন সুরকার কাজি নজরুল ইসলাম। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে গীতিকার ও সুরকারের দায়িত্বের স্বাতন্ত্র্যে।

---

১ অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে শ্রীদিলীপ কুমার রায়:

(১) কোন কোন বিশুদ্ধ কাব্যরসিক একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন এই যুক্তিতে যে তাঁর গানের কাব্য-সম্পদ প্রথম-শ্রেণীর ছিল না। এঁরা ভ্রান্ত। কারণ কোন দেশেই গান নির্ভেজাল কাব্য নয়। অনেক বিশ্ববিশ্রুত গানই কাব্য হিসেবে যে প্রথম শ্রেণীর কাব্য নয়, এ কথা সকলেই জানেন।

(২) অতুলপ্রসাদের গানে তার কাব্যকে সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। ...সুর ও কবিত্ব দুয়ে মিলে রমণীয় হয়েছে।

(৩) অতুলপ্রসাদের গানের অবিসংবাদিত সম্পদ এই যে তাতে গানভঙ্গি অত্যন্ত সহজ সরল, স্বতঃস্ফূর্ত—sponteneity—শ্রেষ্ঠ শিল্পের একটি নিত্য আনুষঙ্গিক মস্ত ঐশ্বর্য।

(৪) সব গানেই যে অকৃত্রিমতা ঝলমল করছে তা বলি না—the greatness of a man is the greatness of his greatest moments—কাব্য বা গান সম্বন্ধেও সে কথা।

(৫) ঠুমরীভঙ্গির গানে—হৃদয়াবেগের সুষমা, বাক্‌সৌন্দর্যের সৌকুমার্য এবং সহজ আনন্দ-বেদনার আবেদনে প্রস্ফুটিত লক্ষ্মীশ্রী আছে—তাকে বলতেই হয় খাঁটি—authentic শ্রেষ্ঠ ঠুমরী চালের প্রবর্তনা প্রথম অতুলপ্রসাদই করেন।

অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা উল্লেখযোগ্য: (১) সুরের সরল স্বাভাবিক গতি ও সুগভীর অনুভূতি (২) পরিব্যাপ্ত করুণ-রসের বৈচিত্র্য (৩) সুরের মধ্যে ব্যক্তিত্ব সঞ্চার (৪) রাগ-সংগীতের ধারা অনুসরণ (৫) ধ্রুপদাঙ্গ রীতির অভাব (৬) কীর্তনাঙ্গ ও বাউল সুরের মনোহর প্রয়োগ (৮) অতুলনীয় স্বদেশী-সংগীত সৃষ্টি। কিন্তু শ্রীমিত্র বলেন, অতুলপ্রসাদের গানে আজকালকার গায়কদের আদুরে ও ন্যাকামির ভাব প্রকাশ অতুলপ্রসাদের মূল রচনা-প্রকৃতির পরিপন্থী।

অর্থাৎ গীতিকার ও সুরকার দুজনার রচনার পরিমণ্ডল স্বতন্ত্র, কিন্তু একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। নজরুলের গান আঙ্গিকের বিচারে বিশেষ ভাবেই আধুনিক, অথচ কবিকৃতির দিক থেকে নজরুল রবীন্দ্র-সমসাময়িকের পর্যায়ে ; তাঁর গান অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়-বস্তু-নির্ভর ও কাব্যিক। আধুনিকপূর্বযুগের গানের কথায় বিষয়বস্তুই অনেকক্ষেত্রে সংগীতের রূপ-নির্ধারক, সুরের তেমন স্বাতন্ত্র্য নেই—বিশেষ করে সুর কোন একটি বিশিষ্ট আইডিয়ার সৃষ্টি করে কিনা বোঝা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে সুর-রচনায় ব্যক্তিগত ভাবনার সংযোগ দেখা যায় এবং সুরের প্রকৃতি বিষয়বস্তুকে বুঝিয়ে দিতে পারে, যথা, দেশাত্মবোধক-গানের সুরের গঠন। অনেক ক্ষেত্রে গান প্রথা অনুযায়ী রাগ-রূপ হওয়ায় কথাবস্তুর মূল ভাবকে সুরের মধ্য দিয়েও কতকটা বুঝে নেওয়া যায়। যথা, দিন-শেষের ভাবে পুরবীর আরোপ, চটুল গানে পিলু অথবা মিশ্র খাম্বাজের প্রয়োগ। রাগ-রাগিণীর সময়-কাল ধারণার ওপর নির্ভরশীলতা হয়ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না অনেক রাগেই তিনি ব্যক্তিগত ভাবের আরোপ করে নিয়েছেন। কিন্তু সুরের বৈশিষ্ট্যে যে ভাবই ধরা থাক আধুনিক-পুর্ব যুগের গানের লক্ষণে ভাষা ও কাব্যিক বিষয়বস্তুর প্রাধান্য অনস্বীকার্য।

গীত রচনায় অতুলপ্রসাদ মূলত সুরভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কথাসম্পদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ রচনাগুলোতে এমনই কাব্যিক রীতি অনুসৃত হয়েছে যে অনেক গানের দ্বারা রবীন্দ্র-সংগীতের অনুরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। যে গানগুলো ঠুম্‌রী দাদ্‌রা অথবা খেয়ালের অনুরূপ তার প্রায় সবগুলোই মূল রাগ-সংগীতের ভঙ্গি সৃষ্টি করে না, অন্তত অতুলপ্রসাদী গানের গায়কীতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাতে রাগের মৌলিক ভঙ্গিকে বুঝে নেওয়া যায়। কাজেই কাব্যসম্পদ থেকে মুক্ত সুর রচনা ও সংযোজনার স্বাতন্ত্র্য আধুনিক গানের বিশেষ দাবি। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে গীতি রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুরজগৎ কল্পনা, সুরসংযোজনা ও প্রযোজনা রচয়িতার পক্ষে বিশেষ ধরণের কর্মক্ষমতার দাবী করে। সুর-রচনায় অভিনবত্ব উদ্ভাবন রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত পন্থায় নিজস্ব রচনার নানান স্তর আছে, যাতে তাঁরই ব্যক্তিগত রচনারীতির লক্ষণ অনুসরণ করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে তার দ্বারা চেনা যায় সহজে। আধুনিক যুগের সুর রচনা ব্যক্তির ভাবনা ও কবির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সুরের কলি, ছন্দ এবং গায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবনের চিন্তা ও তারই অনুরূপ গীতি-

নির্বাচন আধুনিক গানের গোড়ার কথা। নজরুলের আগমনের সঙ্গে ঠিক এমনি একটি দৃষ্টিভঙ্গি এল গানের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এমন ধরণের রচনা এক আশ্চর্য কথা। রবীন্দ্র-নাথের সংগীত রচনার শেষ যুগেই নজরুল মুক্তি লাভ করেছিলেন এবং আধুনিক গানের পথ সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজ গান রচনার যুগে তিনি নিজে আধুনিক ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান সংগীতে আধুনিক শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। কথা-রচনার সঙ্গে সুর-রচনায় এবং সুরকে বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হলে, স্বতন্ত্র ধরণের আঙ্গিক অবলম্বন করা দরকার। এই নতুন আঙ্গিকই আধুনিক গানের মূল কথা। কথার সহজ সরলতা এবং বিষয়বস্তুর বাস্তবমুখিতা সুর-সংযোজনার আঙ্গিককে স্বাতন্ত্র্য দান করে। এই ধরণের উপযুক্ত সুরের প্রযোজনায় সুরকারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

আধুনিক গানে সুর-সৃজনের ভাবনা এবং রচনাকে অধিকতর বাস্তব-মুখী করবার চেষ্টা স্বীকার করে নিয়েও আরও একটি দিক থেকে যায়, তা হচ্ছে গানের ভঙ্গি নির্দেশ। আসলে শ্রোতার মনোভাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে সহজ সরল অভিব্যক্তির দরকার, জীবনকে সোজাসুজি উপস্থিত করবার অনুরূপ সুরের পরিকল্পনা করা স্বাভাবিক। দেখা যাচ্ছে এই উদ্দেশ্যে সুরকার গীতি বেছে নিয়ে অত্যন্ত সহজ অভিব্যক্তিই বড় করে ভাবেন। সুরক্ষেত্র থেকেই আধুনিক গানের সুরপ্রযোজনার বিচার শুরু, কথা থেকে নয়।

নজরুলের মনটির গঠন-অভিব্যক্তিতে একটি লক্ষণ স্পষ্ট—উচ্ছ্বসিত আবেগ-প্রবণতা। তাঁর সুর-ভাবনাতেও এ লক্ষণ সুস্পষ্ট। এখানে সুরের ভাবনা বলতে রাগসংগীতের কথা বলছি না। যে সুর অবলম্বন করে অথবা যে সুর প্রকাশের ভঙ্গিকে নিয়ে গানে প্রয়োগ করলে গানের মধ্যে বক্তব্য তীব্র হতে পারে এটা সেই সুর। দ্বিতীয়তঃ, এই ভাবনা নজরুলকে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে দিলে না, প্রতিটি স্বরকলি ও সুরের স্তরকে স্বতন্ত্রভাবে ভাববার জন্যে অবকাশও রইল না। সুরের এই স্বতঃস্ফূর্ত সংযোজনা ও প্রযোজনায় বাস্তব-প্রবণতাও অভিব্যক্ত হল। এই জন্যেই, নজরুল থেকে আধুনিক গানের যুগের গোড়াপত্তন—একথা কখনো অস্বীকার করা যায় না। আবার এ কথাও বলা দরকার যে নজরুল আধুনিক গানের স্রষ্টা

নন। আধুনিকতা কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে শুরু হয় নি এবং কোন একটি বিশেষ গানের সঙ্গে এর প্রারম্ভ সূচিত হয় না। যখন বাস্তবমুখী গানের অভিব্যক্তির দরকার হল, আত্মভাবপ্রধান কবির কৃতি থেকে গান কতকটা মুক্ত হয়ে সহজ সরস অভিব্যক্তি দাবী করল, নজরুল তখনই এগিয়ে এসেছেন। নজরুলের প্রতিভা প্রথমে চলিত বাংলা গানের গতানুগতিকতার বিরোধী রূপ উপস্থিত করল। অর্থাৎ সহজ ব্যক্তিগত আবেগ যুগের অগ্নিসম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিলে এবং প্রাণের বেগ গানের রীতিকে বৈচিত্র্য দান করে নতুন পদ্ধতি সৃষ্টির সম্ভাবনা জানালে।

১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে নজরুলের প্রকাশ ও বিস্তার লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু, একথা স্বীকার করেও গীতসৃষ্টিতে ধারা প্রবর্তনের দায়িত্ব আরোপ করা যায় মোটামুটি ১৯৩০ সন থেকে। গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং রেডিওযোগে সাধারণের মধ্যে গান প্রচারিত হতে শুরু হল। নজরুল সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন, অর্থাৎ নজরুলের মধ্যে যুগের দাবী অনুসারে সুরকারের অভিব্যক্তি হল। দুর্গম গিরি কান্তার মরু লঙ্ঘনকারী শক্তিমানের বক্ষপঞ্জর থেকে স্বতঃ-উৎসারিত সুর সহজভাবে প্রকাশিত হল। নজরুলের গীতি-প্রবণতায় প্রথম যুগ থেকেই একটি লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়েছিল, সে হচ্ছে উল্লাস। জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না হলে এমন উল্লাস ও আকৃতি বেপরোয়া গতিতে স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না। সাধারণভাবে মনে হতে পারে সুরের অভিব্যক্তি, গীতিকার অথবা সুরকারের সংগীতজ্ঞানের স্ফূর্তি রাগরাগিণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারিগরী-প্রয়োগমাত্র ; এজন্যে দুটো মাত্র উপাদান ক্রিয়াশীল—একটিতে রাগ-রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুরের কলি সঞ্চয় এবং অন্যটিতে তার যথাযথ বিন্যাস। কিন্তু নজরুলের সুরকার মনটিকে বিশ্লেষণ করলে এর অতিরিক্ত উপাদান লক্ষ্য করা যাবে। সুরসংযোজনা কারিগরী মাত্র নয়, সুরকলির সৃষ্টি ও বিন্যাস মনেরই সৃষ্টি, অন্তঃস্থ আবেগ উন্মাদনা এবং উল্লাস-প্রবণতা অশান্ত মনের বেগ-প্রবাহ। অনেক ক্ষেত্রে রাগের রূপ বাছাই করবার ও ভাববার সময় যেন নেই, ছন্দের হিন্দোলে গতি সৃষ্টি করে সুরকে সহজ ভাবেই উৎসারিত করা ওর যেন প্রধান কর্তব্য। এর ফলে ছন্দোময় হাল্কা সুরও সহজেই প্রকাশিত হল। গানকে কাব্যিক গুরুত্ব থেকে মুক্ত করে দেবার অনুরূপ পন্থা নজরুল অবলম্বন করলেন।

এতক্ষণ আবেগপ্রবণতার সঙ্গে জীবনের দাবী সম্মিলিত হয়ে কি ভাবে

সুরকারের মনটিকে বাস্তবমুখী করে তুলেছে সেকথা বলেছি। আধুনিকতার আর একটি দিক হচ্ছে লৌকিক গীতি-ভঙ্গির উপস্থাপনা ও পরিচালনা। এটা কোন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব-প্রকাশভঙ্গি নয়। রামপ্রসাদী গান বলতে, নিধুবাবুর গান বলতে অথবা রবীন্দ্রসংগীত বলতে আমরা বিশিষ্ট গীত-রীতি বুঝি। কিন্তু আধুনিক বলতে এমন নির্দিষ্ট রীতিকে দাঁড় করান যায় না। প্রথমে, আধুনিক রীতির ব্যাপ্তি সমধিক। দ্বিতীয়তঃ, সুর-রচয়িতার মন আত্মগত নয়, সুরকে আপনার প্রয়োজনে প্রয়োগ করবার চেষ্টা তাতে নেই, প্রয়োগ কতকটা বহির্মুখী। শ্রোতার মনোরঞ্জনের দাবী এবং বাস্তব ভাবের নানা বৈচিত্র্য-প্রকাশের দাবীকে স্বীকার করেই সুর রচনা ও সংযোজনা হয়ে থাকে। সেজন্যে কথার সহজ প্রকাশ, ছন্দোবৈচিত্র্যের নানারূপ হাল্কা রস সংযোগ এবং অবলীল গীতি-ভঙ্গির প্রয়োগ, বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় গানের রূপান্তর, প্রভৃতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নজরুলের আবেগপ্রবণ ভাষা অনেকস্থলে সুর-চিন্তার সঙ্কেত হয়ে দাঁড়ায়। গানের ভঙ্গিকে গতি দান করবার উপযুক্ত ভাষা রচিত হয়। অবশ্য কথার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করবার ক্ষেত্রটি স্বতন্ত্র। কিন্তু এখানে একটি কথা বলা দরকার, অধিকাংশ কথা রচনায় শব্দ নির্বাচন এবং ছন্দ সৃষ্টিতে গীতিকারের অন্যান্য গুণের মধ্যে গতি-প্রবণতাই প্রধান লক্ষণ। নজরুলের ভাব ও ভাষা ভারিক্কী হয়ে গানের সহজ অভিব্যক্তিকে বাধা দেয় নি। পাঠের সময়ে অনেক গান এজন্যে কোথাও দুর্বল মনে হতে পারে, কিন্তু গতিপ্রবণতা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ। গীতি সমালোচনা করতে সমালোচককে রচনার গীতি-মূলকতা বা লিরিক-বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে দেখা যায়, কেউ 'সুরধর্মিতার' কথা উল্লেখ করেন। কবিতার বিচারে এসব বিশেষ অর্থবোধক হতে পারে, কিন্তু গানের ক্ষেত্রে এ অতিকথন এবং গানে কথার সামান্য বিস্তারও পরিত্যাজ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ কবিতাকে গীতিপ্রবণ, ধ্বনি-প্রধান অথবা সুর-প্রধান বললে অর্থবোধক হয়, কিন্তু গীতির গুণ বিশ্লেষণে এসব উক্তির প্রয়োজন নেই। গীতি রচনা অন্যান্য গুণে অসাধারণ হয়। নজরুলের রচনা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে গীতি-রচনায় ও শব্দ-যোজনায় যে মৌলিক গতিশক্তি আছে, সুরভঙ্গি তাতে সহজ ও সাবলীল হয়ে উঠেছে। এই সম্পূর্ণ ক্রিয়াকে 'গতি' বলা যায়। নজরুল মৌলিক সুরভঙ্গি (যেখান থেকে সুর সংগ্রহ করেছেন) পরিবর্তিত করে নেন নি, গোড়া থেকেই কথা প্রয়োগে ও বাণী রচনায় মৌলিক সুরের

(কোথাও রাগের) সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর নজর রেখেছেন। এখানে সুরসংগতি সৃষ্টি হয়েছে, রাগরূপ রক্ষিত হয়েছে। লৌকিক রীতির গানে, রীতিটি পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং কথা-রচনার বৈশিষ্ট্যে সুরের মৌলিক রূপটি অবলীলাক্রমে এসে পড়েছে। এক্ষেত্রে গীতিকে কাব্যের সূত্র দ্বারা বিচার করা চলে না, একথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু নজরুল গীতি-গঠনের মধ্যে গীতির রূপ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এখানে নজরুলের প্রধান গুণ সুরসঙ্গতি রক্ষা, সুরের সঙ্গে কথার সামঞ্জস্য বিধান।

নজরুলের প্রধান প্রধান গানে মৌলিক পরিকল্পিত সুরের অংশ বা সুরের বিশিষ্ট কলিই মনের আশ্রয় হয় নি। কোন সুরকে সমগ্রভাবে গ্রহণ না করে থাকতে পারেন নি, সম্পূর্ণ রূপটির দিকেই মন সজাগ। সুরকার-রূপে বহির্জগতের সুরের বৈচিত্র্যে নজরুলের দৃষ্টি মুক্ত। যেখানে কোন একটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের গান বিশেষ গানের ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন, নজরুল তাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে প্রকৃত রূপে মৌলিকতা বজায় রেখেই উপস্থাপিত করেছেন। গজল, আরবীয় সুর সম্বন্ধে যেমন এই objective দৃষ্টিভঙ্গির কথাটি খাটে আবার রাগ প্রয়োগের মধ্যেও এ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেখানে ভৈরবী এসেছে, ভৈরবীর পুরো রূপটি কানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সুর প্রয়োগে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন অংশকে নজরুল গ্রহণ করেননি। আধুনিক গান খণ্ড-বিচ্ছিন্ন অংশের সংযোজনকে অনেক ক্ষেত্রেই অবলম্বন করে। রচনার দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরে রবীন্দ্রনাথ রাগের অংশ, টুকরো ইত্যাদি বড় করে দেখেছেন। নজরুল এক্ষেত্রে মৌলিক রীতি ও মৌলিক রাগের প্রতি আস্থাবান। রবীন্দ্রনাথ এসব স্থলে ব্যক্তিগত রীতি প্রয়োগ করেছেন। অতুলপ্রসাদের অনেক রচনার মূলে নজরুলের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু গীতি রচনার কায়দায়, শব্দ নির্বাচনে ও ভাবসংগতি স্থাপনে ও গায়কীর জন্যে অতুলপ্রসাদের গানগুলোতে এসেছে কাব্যিক রীতি। তাই তা শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রত্যক্ষ রূপান্তর হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

আঞ্চলিক ও অবাঙালী গীতি-রীতিকে রূপান্তরিত করতে হলে এবং মৌলিক-ভঙ্গিটি সৃষ্টি করতে হলে গীতি-রচনায় যে ঋজুতা এবং কথার যে দৃঢ় বন্ধন দরকার হয় নজরুলে তা সম্ভব হয়েছে। নজরুলের হিন্দুস্থানী সংগীতপ্রীতি গীতি রচনার এই অঙ্গটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বলে মনে হয়। সাধারণতঃ, রাগাশ্রিত গান রচনায় দু' একটি কলি অনুসরণ

করে কাঠামোটিকে ঠিক রাখা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এর কারণ গীতি রচনায় কায়দায় সরলতার যেমন অভাব, তেমনি ভাব-সন্নিবেশের আধিক্য এবং সুর-সংযোজনাতে প্রতিকূল শব্দ ব্যবহার। কিন্তু নজরুলের রচনা সফল হয়েছে শব্দ-নির্বাচন এবং ভাব-সন্নিবেশের কায়দায়। হাল্কা রসের পরিবেশনে প্রসাদগুণ বড় বিশেষ লক্ষণীয়। লোক-প্রচলিত সুরের রূপান্তরে নজরুলের অভিনবত্বও অনস্বীকার্য। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দুটো দিক স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে দেখা যায় কথা রচনার সময়ে নজরুলের মানসিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সুরজগতের ওপর, সুর সংযোজনার পরিপূর্ণ ধারণায়। তাতে অবশ্য কথা রচনার ক্রটিও থেকে যেতে পারে। অন্যদিকে নজরুল রাগের সমগ্রতা উপলব্ধি করতে পারেন রাগসংগীতের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণের দ্বারা, রাগপ্রীতি মূলত মনটাকে বিশেষ অংশের প্রতি আকৃষ্ট না করিয়ে সম্পূর্ণ রাগটিকেই ধরে দেয়। সংগীততত্ত্ব সম্বন্ধে নজরুলের ভাববার অবকাশ সামান্য, সংগীত শুনে মুগ্ধ হয়ে অনুরূপ গান রচনাই প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের মত তাৎপর্য ব্যাখ্যার অবকাশ বা মানসিকতাও তাঁর নেই। সংগীতকারের অথবা গায়কের দৃষ্টি যেমন রাগের প্রতি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকে, গায়কের মন যেমন সুরের সঙ্গে সুরের সম্পর্ক, সুর বিস্তারের সূক্ষ্মতা ও মাধুর্য, তানের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতিতে নিবদ্ধ থাকে, নজরুলের দৃষ্টিও ঠিক অনুরূপ। Details-এ বা একসঙ্গে সুরের ক্ষুদ্র খণ্ড-কারিগরীতে অথবা বিস্তৃততর অংশে মন আশ্রিত থাকার দরুণ তাঁর মনটিতে প্রযোজনার ভাবনা প্রধান হয়েছে। এজন্যে গীতি-রচনার ও সুর-সংযোজনার বহু বৈচিত্র্যে নজরুল উল্লসিত। একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে তাঁকে বাঁধা যায় না। কতকগুলো বিশিষ্ট ধরণের লক্ষণ দ্বারা তাঁকে বিশেষ করে উনিশশো তিরিশের পূর্বধারার গীতি-রচয়িতার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। নজরুলের এই মানসিকতাকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলা যেতে পারে। সুর-প্রযোজনার উপযুক্ত objective ভাবনা তাঁর গীতিরচনার মূলে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে নজরুল যেন অনেকটা যোগস্থাপন করেছেন।

এ পর্যন্ত নজরুলের রচনা সম্বন্ধে যে কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করা হল তাকে সংক্ষেপে বলা যায়: (১) বাস্তবমুখিতা (২) সুর-সংযোজনা সম্বন্ধে সচেতনতা (৩) সুরের ভাবনা-মূলক প্রেরণা (৪) গানের ভঙ্গিতে গতিপ্রবণতা (৫) কথা ও সুরের সংগতি সাধন এবং সুরের প্রয়োজনে শব্দ নির্বাচন (৬) সুরে গায়কীরীতি বা রাগের মৌলিক রূপের সংরক্ষণ (৭) হিন্দুস্থানী অথবা বিদেশী

গানের প্রত্যক্ষ রূপান্তর। এই লক্ষণগুলো বিচার করলে একথা প্রমাণিত হবে যে নজরুল ভাষাকে সুরের অবলম্বন ও সঙ্কেত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এমনও কাব্যিক বিচারে রচনা হয়ত অনেক স্থলেই দুর্বল, ভাব দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। রচনার বিষয়বস্তু বহু গানে গভীরতার দিকে যায় না, ভাবানুভূতির মর্মস্থলে সহজে আঘাত করে না এবং শব্দ থেকে ভাবপ্রতীক সৃষ্টি করে না। কিন্তু শব্দ নির্বাচনের দক্ষতা ও কৌশল কবিতাকে সার্থক গানরূপে গড়ে তোলে। বিশেষ করে গজল জাতীয় গানগুলোর সুরের অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ যে পরিবেশ রচনা করেছে এমনটি আর কখনো হয়নি। এজন্য নজরুলিয়া কথাটির ব্যবহারে নজরুলের গজলের রূপকে বোঝাত। সুরের প্রতি লক্ষ্য থাকায় গীতি রচনার সৌষম্য সর্বথা রক্ষা করা অনেকস্থলে সম্ভব নাও হতে পারে। নজরুলের মধ্যে বিশিষ্ট সুরের অংশ, সুরকলি বাসা বাঁধেনি, নজরুল সুরকে ভেঙে আপন প্রয়োজনে প্রয়োগ করেন নি যেমন পূর্বসূরীরা করেছেন। যেখানে পিলু এসেছে সেখানে পুরো পিলুর বিশিষ্ট ঠুমরীর অথবা দাদরার কায়দাটি রূপ পেয়েছে। গ্রামোফোন রেকর্ডে জ্ঞান গোস্বামী অথবা শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের গাওয়া গানগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে। রাগের বিস্তারে, তানে, ঠুমরীর বোল তৈরিতে কোন বাধা নেই। অন্যদিকে ভৈরবীতে 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর'—ভাষাতিরিক্ত রাগ-জগৎ সৃষ্টি করে না, কিন্তু এরূপ অনেক গান সহজে মনে চটুল সুখ সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের গানে নিজস্ব pattern বা সুরকলি আছে, নজরুলের মধ্যে সুর-প্রয়োগের এই ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত। অর্থাৎ নজরুল সম্পূর্ণ সুরপ্রকৃতিকে চিন্তা করবার অনুরূপ প্রেরণা না লাভ করলে সংগীতকে ভাষা ও ভাবে রূপান্তরিত করতে পারেন না; কথা রচনা করে তাতে অনুরূপ সুর সংযোগ, কথার ওপর মনঃসংযোগ এবং সুরের অংশের প্র.ত লক্ষ্য যেখানে বেশী, নজরুল সে পর্যায়ের রচয়িতা নন।

এ সম্পর্কে সংগীতের দিক থেকে একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে: বিভিন্ন দেশের লোক-গীতির মধ্যে একটা হাল্কা ভাব আছে। সাধারণ লঘু বা লোক-প্রচলিত সংগীতের মধ্যে প্রেমের ভাবাতিশয্যের প্রকাশেও চটুল ভঙ্গি বর্তমান। নজরুলের মন এই সহজ ভাবের সঙ্গে একাত্ম। রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িকদের মধ্যে যে ভাব-গভীরতা বর্তমান, নজরুলের মন সুযোগ অনুসারে সেই লোক থেকে বাস্তবতায় নেমে এসে হাল্কা আনন্দের প্রস্রবণে ভেসেছে। সেখানে দর্শনের গভীরতার চেয়ে গুল-বাগিচার পাখিটির নৃত্যের মর্যাদা সমধিক।

এখানে পূর্বতন ধারায় ছেদচিহ্ন টেনে দিয়ে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন নজরুল। প্রেমের গানের মধ্যে চটুলতা সে যুগে গ্রাহ্য ছিল না এবং হৃদয়ের চাঞ্চল্য প্রকাশক সুরভঙ্গি সম্বন্ধে অবহেলাও নিশ্চয়ই ছিল। নজরুল বিভিন্ন ভাষার গানের ভঙ্গিকে বাংলায় নিয়ে আসতে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করেন। যে কোন সুরভঙ্গিকে রূপান্তরিত করে বাংলা গানে পরিণত করা বড় কথা নয়। রূপান্তর যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু উপযুক্ত ভাব ও ভাষার সঙ্গে সুরের সংযোগ স্থাপন নজরুলের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। সেজন্যে দাদরা গজল ঠুমরী কাজরী চৈতী এবং খেয়ালের ভঙ্গিগুলো গানের মধ্যে সহজেই এসে পড়েছে। কাজটি নজরুলের অনেকটা objective কারু-কর্ম, আধুনিক রচনার দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত। কবিত্বের দাবী নিয়ে নজরুল সংগীতকে নিজের করে নেন নি। নজরুলের গানের এই প্রয়োগ-রীতি সাংগীতিক, কাব্যিক নয়।

নজরুলের সাংগীতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বৈচিত্র্যে এবং নিঃস্পৃহ সুরসংযোজনায়, অর্থাৎ রাগরূপের মাধুর্যকে বুঝে নিয়ে তাকে পরিপূর্ণ রূপদানের চেষ্টায়। অন্য দিকে পল্লীগীতি অথবা চলিত সুরের রূপটিকে সঞ্চিত করে রাখা ইত্যাদির চেষ্টায় রচনাতে নজরুলকে নতুন কলি সৃষ্টি করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে সুর-লক্ষণের দ্বারা এজন্যে যেমন চেনা যায়, এবং কতকাংশে অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালকেও, নজরুল সেখানে বহুপ্রসারী এবং অপরিচিত থেকে যান। যেখানে নজরুল অন্য ভাষার ভাব ও ভঙ্গিকে রূপান্তরিত করেছেন, সেখানে তাঁর প্রতিভা দীপ্ত সূর্যের মতো। কিন্তু নজরুল সেখানেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করে অনেকটা নিঃস্পৃহ বা objective হয়েছেন, একথা বলেছি। ব্যক্তিগত স্টাইলের পরিসরও সীমিত। সংগীত রচনা থেকে নজরুলকে চিনে নেওয়া দুঃসাধ্য, যদিও তেমন কিছু কিছু রচনা যে নেই তা নয়। গজল তো নজরুলিয়া বলে উল্লেখ করা হত। খণ্ড ও ক্ষুদ্র সুরকলি নিয়ে নজরুলের কোন সঙ্কীর্ণতা নেই। সেজন্যে নজরুলের রচনায় গায়কীর প্রয়োগের দ্বারা বিশেষ মুক্তি দিতে পারে, যেরূপ মুক্তি সাধারণ খেয়াল, ঠুমরী, পল্লীগীতি এবং অন্যান্য গানে পাওয়া যায়। এর কারণ, গানগুলোতে গায়কীর কোন দৃঢবদ্ধতা নেই। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ শুধু সুরের সমগ্রতা সৃষ্টিতে। নজরুলের সাধারণ গীতি-লক্ষণে কোন বিশিষ্ট স্টাইলের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু তা হলেও সুরের কাঠামো বাঁধা এরূপ অনেক গানও আছে এবং এ গানগুলোতে গায়কের স্বাধীনতা অবলম্বনের সুযোগ নেই, রচয়িতার ব্যক্তিত্ব সুনির্দিষ্ট। কিন্তু বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এসবও

বিশিষ্ট ধরণের রচনা বলে উল্লেখ করা যায়। নজরুলের রচনার অসংখ্যতার কথা অনেকেই উল্লেখ করেন। কিন্তু রচনার সংখ্যার চেয়েও নজরুলের উদ্ভবের মূল্য অসামান্য। বাংলায় আধুনিক ও রাগপ্রধান গান এবং দ্রুত ভঙ্গির ও বিভিন্ন লয়ের গান রচনা একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। হয়ত নজরুল না হলে আধুনিক নানা প্রকার গানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হত না।

নজরুলের গীতিরচনার বিশ্লেষণ নানারূপে করা হয়ে থাকে। রচনার সংখ্যাও তিন হাজার বলে জানা যায়। কিন্তু তিন হাজারের সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা তাঁর সংগীতসত্তার বিশিষ্ট রূপটিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই, তাঁর গানের মূল মানসিকতার কথা উল্লেখ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে নজরুলের সুর রচনার কায়দাটি পুর্বধারা থেকে অনেকটাই বদলে গেছে এবং রচনার রূপটিতে গানের সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সঙ্গে নজরুলের প্রতিভা উন্মোচিত হয়েছে। পুর্বধারার সঙ্গে কবি হিসেবে নজরুল সংযোগ রক্ষা করেছেন। রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের যুগের মূল কাব্যিক রীতি থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন নন। কিন্তু নজরুলের রচনা আত্মকেন্দ্রিক নয়, শ্রোতার কানের প্রতি এবং সুরের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি প্রথম নিবদ্ধ, এরপর পুরো রাগের সুরজগৎ। মন সুরের রূপে ও বৈচিত্র্যে কেন্দ্রীভূত। প্রতিক্ষেত্রেই আহরণী বৃত্তি নজরুলকে সজাগ করেছে, এজন্য কোন উপাদানকেই তিনি বর্জন করেন নি, বরং সমস্ত কিছুকে উপযুক্ত প্রয়োগের চেষ্টায় নজরুল প্রযোজক বৃত্তিতে সার্থক হয়েছেন। (সুরকার নজরুল সম্বন্ধে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

তাই বলছি নজরুল আধুনিকতার অগ্রদূত। আধুনিকতা অর্থে অত্যন্ত আধুনিক কোন বিশিষ্ট গান নয়, আধুনিক সংগীতের আঙ্গিকের পথিকৃৎ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক গান

গানে আধুনিকতা কি একটি অবিশ্রান্ত সংগীতরূপ? কারণ, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাচীন মতের অনুসারে আধুনিক সংগীত সৃষ্টি স্বীকৃত নয়। তাই এ সম্বন্ধে সন্দেহ অত্যন্ত প্রবল হয়ে জাগে। অর্থাৎ, প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্প হিসাবে এর রীতি এবং রূপ কোনও নির্দিষ্ট মানে বিচার করা চলে কি?

যে কোন শিল্পরূপের সমসাময়িক প্রবহমাণ ভাবধারা তাকে আধুনিক করে তোলে। সমসাময়িক রীতিনীতির জন্যে, জীবনের প্রয়োজনে এবং যে কোন মনোভাব রূপায়ণের নবসৃষ্ট কায়দার জন্যে শিল্পে আধুনিকতা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু, কেন এরূপ হয়? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে সেই এক কথাই বলা চলে—'সমসাময়িক প্রয়োজন'। সমসাময়িক প্রয়োজনে চিত্রে, কবিতায় এবং অন্যান্য সুকুমার শিল্পে যেমন আধুনিকতা প্রশ্রয় পায়, সংগীতেও তেমনি করেই হয় আধুনিকতার উদ্ভব। কিন্তু সংগীতকে যে অর্থে এখানে আধুনিক বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, সে অর্থে সকল শিল্পকর্মকেই আধুনিক বলা চলে না। প্রতি যুগের সমসাময়িক ভাবাপন্ন রচনাকে সে যুগের আধুনিক বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক গান এখানে একটি বিশেষ অর্থে আধুনিক, সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য নয়।

আমরা জানি, মৌলিক শিল্পসৃষ্টি সমসাময়িক জীবনকে অবলম্বন করে। অতীতের শিল্পবস্তুতেও যে সমসাময়িক মন স্ফূর্ত হয় নি—এ কথা বলা যায় না। জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা যে কোন শিল্পবস্তুতে অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়ে। সংগীতের এরূপ রূপদান নিয়েই আধুনিক গানের সৃষ্টি, সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি সিনেমা থেকে একটি গান আওড়াতে আওড়াতে বাড়ী ফেরে এবং পরদিন আরও বিশেষ করে আবৃত্তি করে, সেই লোকটিকে পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে যে গানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার সাংসারিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ মনের সঙ্গতি থাকাই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। এই সব গানে জীবনের প্রতিফলন সহজভাবে দর্শককে আকৃষ্ট করে, কিন্তু পূর্বেই বলেছি আজকের গানের আধুনিকতাকে জীবনের এই সহজ প্রতিফলনের দিক থেকেই বিশ্লেষণ করা চলে না।

আধুনিকতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বিচার করে আধুনিক গানের রূপ নির্ধারণ করা চলতে পারে।

পূর্বেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে আধুনিক গান সমসাময়িক মনোভাবের ধারক। তা হলে যে কোন কালের গান সে-কালের আধুনিক কিনা? বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বর্তমান আধুনিক গানে বহু দেশের সুর-মিশ্রণ, নতুন উদ্ভাবিত সুর-সমন্বয়, সমবেত কণ্ঠের গান, নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টির চেষ্টা, টুকরো টুকরো সুরচিত্র সংযোজন, আবহ সংগীতের ব্যবহার প্রভৃতি বহুতর লক্ষণ অত্যন্ত নতুন ও স্পষ্ট। এসব দেখে মনে হয় এক ধরণের মানসিকতাই আধুনিক গানের পেছনে আছে। সেজন্যেই বলা যায়, বর্তমান বিচার্য আধুনিক গান প্রাচীন বা মার্গ অথবা দেশী সংগীতরীতিকে অবলম্বন করে চলে না, অন্তত আধুনিক গানে সে লক্ষণ নেই। অথচ অন্য যে কোন কালের সমসাময়িক গানে প্রাচীন বা মার্গ এবং দেশী সংগীতরীতির রচনা পুরোপুরিই রয়েছে। একশত বৎসর পূর্বে নিধুবাবুর গান সেকালের আধুনিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রাচীন বা প্রচলিত দেশী সংগীতরীতিকে অবলম্বন করেই তার সৃষ্টি। তা ছাড়া আধুনিক কালের গানের বিষয়বস্তুতেও সামাজিক অথবা ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কে বৈচিত্র্য যে ভাবে বিকাশ লাভ করেছে, পূর্বে যে কোন যুগে তা ঘটবার সুযোগ হয় নি। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে বস্তু-নির্বাচন এবং সংগীতরীতি এই দুটো দিক থেকেই আধুনিক গান শব্দটি একটি 'নাম'। সমসাময়িক সৃষ্টি বলেই সে আধুনিক নয়। এ হচ্ছে আধুনিক নামক একটি বিশিষ্ট সংগীতরীতি, এযুগেই যার সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক মনের চাহিদা অনুযায়ী যে গীত মুখে মুখে বা মনে বিস্তৃত হয়ে আত্মপরিতৃপ্তি নিয়ে আসে তার অবলম্বন কি শুধু সুর বা সংগীতরস? যে সংগীত অত্যন্ত সহজে মনের মধ্যে স্পষ্ট ছবি বা কর্মের (actionএর) কথা বলে দেয় সে হচ্ছে সংগীতাংশের ধারক, একটি বিশিষ্ট মনোভাবের কাব্যরূপ। উদাহরণ: কিছুকাল পূর্বে একটি আধুনিক গীত লোকের মনে বিশেষ ছাপ এঁকেছিল:

"উড়ছে এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।"

মনে পড়ছে শূন্যাকাশে মুক্তির চিত্রে, পায়রার ডানার শক্তিতে প্রবল

উত্থান-পতনে গীতটি সাধারণের মনে দোলা লাগিয়েছে। মূলত এটি একটি কবিতা। কবিতাটির রচনার মধ্যে বস্তু-নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু তাতে সুর-প্রয়োগে ও গান হবার কায়দাতে চমকপ্রদ স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। এই সূত্রে বলতে চেষ্টা করছি যে ভাবরূপ এবং সুরের সমন্বয়—এ দুটো দিক স্বতন্ত্রভাবেই বুঝে নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। আধুনিক গানও তাতেই বোঝা যাবে।

এ সম্পর্কে প্রথমে কাব্যরূপ বা কবিতাংশকে 'গীতি কবিতা' না বলে 'গীতি' শব্দটি ব্যবহার করা যাক, আর এক্ষেত্রে 'গান' বলতে বুঝব 'গীতি'র ক্রিয়াশীল অংশ অর্থাৎ 'সংগীতরূপ'। অর্থাৎ 'গীতি' অর্থে লিরিক এবং 'গান' অর্থে সম্পূর্ণ সুরপ্রযুক্ত বস্তুটি। লিরিককে বাংলায় গীতি-কবিতা বলা হয়। অন্য দিকে 'গীত' শব্দটিতে হিন্দী আধুনিক গান বোঝায়। এজন্যে গীতি শব্দটিই ব্যবহারের উপযুক্ত মনে করি।

গীতি

শুধু গীতি সম্বন্ধে এখন আমাদের প্রথম বক্তব্য।

কোন গুণে একটি গীতি, কবিতা না হয়ে, গান হবার উপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়? এ প্রশ্নের উত্তরে, গীতির প্রথম লক্ষণ দেখা যাক। গীতির প্রথম কলি হচ্ছে গানের মূল কেন্দ্র। গানের সময় দেখতে পাওয়া যায় যে ঘুরে ঘুরেই গীতির প্রথম কলিকে বার বার গান করা হয়। এর পর প্রথম কলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির একটু ভাববিস্তৃতির সঙ্গে আরও কলি গাওয়া যায়। কিন্তু ভাবের দিক থেকে প্রথম কলি যেমন প্রস্তাবনা, গানের পরিসমাপ্তিও তেমনি ইঙ্গিত। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম কলিই একটি গানকে বিশেষ ভাবে উপভোগ্য করে তোলে। ইংরেজিতে যাকে burden বা refrain বলা হয়ে থাকে (ধুয়ো নয়), গীতির সে প্রথমাংশটির রচনার সাধারণ প্রকৃতিই বিশেষ লক্ষ্য করা দরকার। কারণ, গীতির প্রথমাংশই যদি একটি বিষয়বস্তুর সৌরকেন্দ্র হয় তবে তার চতুর্দিকের রেখা ও গ্রহকে কি তার গঠন বলা যায়? গানের প্রথম কলি শ্রোতার মনকে একটি বিশেষ পরিমণ্ডলে নিয়ে যায়, পরবর্তী বিকাশ সেই পরিমণ্ডলের সঙ্গে, তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনুভূতির চেষ্টার সঙ্গেই সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে উদাহরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। গীতিরচনায় দেখা যায় পরবর্তী বিকাশ প্রথম কলির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত, কোন প্রকারেই গৌণ নয়।

এবারে কবিতা ও গীতির পার্থক্যের কথা।

সুর-সংযোজনের প্রয়োজনে কবিতার গীতিরূপটি একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিকে রচিত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভাব-সংক্ষিপ্ততা, সরলতা এবং আইডিয়ার বা ভাব-বিশেষের পরিপূর্ণতা নিয়েই গীতি রচিত হয়। প্রথম কলিতে গীতি ভাব-সম্পূর্ণ। গীতির দেহ শুধু প্রথমাংশের বিস্তৃত বিকাশ। যে কোন গীতি পর্যালোচনা করলে এই লক্ষণটি পরিস্ফুট হবে। কবিতা গীতির চেয়ে পরিসরে অনেক ছোটও হতে পারে কিন্তু রচনায় যে সরলতা দরকার এবং অবস্থাবিশেষে যেরূপ নিরলঙ্কার হওয়া প্রয়োজন, কবিতা তা হতে পারে না। কারণ কবিতা ভাবমুহূর্তের শব্দসম্পূর্ণ প্রকাশ, একটি ভাবমুহূর্ত থেকে আর একটি ভাবমুহূর্তে যাবার পথও তাতে মুক্ত। সুর সংযোজনার প্রয়োজন তাতে নেই। আধুনিক কবিতা গীতিরচনা পদ্ধতি থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছে। সেখানে বুদ্ধির গম্য বা অগম্য ভাব বা হৃদয়ের উদ্বেলিত বৃত্তিকে, রূপকল্পের দ্বারা বা ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রকাশ করে পূর্ণতা দান করা যায়। সেখানে সুর-সংযোজনার প্রয়োজন থাকে না। কবিতার ভাব সম্পূর্ণতা আর কোন শিল্পরীতির প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল নয়।

যেহেতু গীতি-রচনার উদ্দেশ্য সুর প্রয়োগের দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ, গীতি সেজন্যেই স্বকীয় রূপে ভাষা-দেহটি যথোপযুক্ত করে নেয়। কোন ভাল গীতি একটি সক্রিয় গানে পরিণত হতে গিয়ে—হবে প্রথম-কলি-সর্বস্ব ভাববস্তু, একটি ধূমকেতুর মতো—যার পেছনে শরীরটা লেজের মতো। দ্বিতীয় হচ্ছে ছন্দ। বর্তমান কবিতা ও কাব্যের প্রকৃতি অনুসারে কাব্য ভাষার প্রবহমাণ রূপের একটি দিক। সেখানে ছন্দের কোন বাঁধাবাঁধি থাকে না। আজকাল কবিতাতে ভাব-সম্পূর্ণ প্রকাশভঙ্গি নির্বাচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত ও রূপকল্প কবিতাকে ছন্দ-ভঙ্গি থেকে মুক্তি দেয় এবং মনন ও অনুভূতিতে হয় আরও সূক্ষ্ম কবিতা। তত্ত্বের দিক থেকে মনে হয় গীতির সহজ রচনা এবং ছন্দোবদ্ধ রূপ যেন কবিতার বিপরীত বস্তু। কিন্তু সহজ রচনাও একটি বিশিষ্ট কবিশক্তি দাবী করে। সহজ সৃষ্টি নিতান্ত সহজ নয়। রচনার ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গির নৈপুণ্যে প্রকাশিত বস্তু সহজ হতে পারে কিন্তু রচনায় ব্যক্তির মনের ছোঁয়া, বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত সঙ্কেত দেয়। এজন্যে গানের আবেদন ভাষা-ঐশ্বর্যে কখনো নয়, এর অতিরিক্ত আর একটি রাজ্যে। কাব্য বা কবিতা সেদিক থেকে ভাষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। কথার প্রয়োগই তাকে সার্থক করে তোলে।

কিন্তু, কবিতাকে কি সার্থক গানে পরিণত করা যায় না? ধরা যাক একটি মাত্র ইঙ্গিত বা একটি মাত্র রূপকল্প অবলম্বন করে গীতির প্রথম কলি তৈরি হল, গীতির পরিপূর্ণ অংশে আরও একটি রূপকল্পের বিকাশ হল, তাকে কি গান করা যেতে পারে না? এর উত্তর হচ্ছে, গদ্যকেও বা বর্ণনাত্মক রচনাকেও সুর করে গান করা যায়। কবিতা ছন্দোবদ্ধ হলে, তাতে সুর প্রয়োগ করে গাওয়া যায়। কীর্তনের গদ্যাংশকে বা বর্ণনাত্মক ভাষাকেও গান করতে দেখা যায়। গীতিকা বা ballad (গাথা) মোটামুটি বর্ণনাত্মক রচনা, তাতেও সুর প্রয়োগের দ্বারা জনপ্রিয় গানে পরিণত হতে দেখা যায়। আধুনিক কবিতা, এমনকি ছন্দোবদ্ধ কবিতা হলেও অথবা রূপকল্প অবলম্বন করা হলেও তাতে সুর প্রয়োগ দুঃসাধ্য বলে মনে হয় না। কিন্তু আধুনিক কবিতার পাঠকের মতো চিন্তায় ফাঁকা ভর্তি করবার সুযোগ গানে হতে পারে না। মোটামুটি, গীতি রচনাতে ভাববস্তু থেকে পরবর্তী ভাবে, রূপ থেকে পরবর্তী রূপে গতি অত্যন্ত সহজ হওয়া চাই। অর্থাৎ আধুনিক গীতি যে কোন আঙ্গিকে রচনা করলেও, তার কেন্দ্রীভূত ভাব-সরলতা, সহজ বিকাশ এবং ছন্দোবদ্ধতা থাকা নিশ্চিত।

কবিতাকে গানের রূপে চালাতে পারা যায় কিনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা গানে পরিণত হয়েছে। 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে', 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'—প্রভৃতি গীতি নয়, এগুলো কবিতা। রবীন্দ্রনাথের রচনা ছন্দোবদ্ধ, সংগীতধর্মী। বাক্য প্রয়োগে, শব্দের ব্যবহারে সুরের ওজনের সঙ্গে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না। এজন্যে কিছু সংখ্যক রবীন্দ্র-কবিতাতে সুর প্রয়োগ করলেও গীতি ও কবিতার ব্যবধান হয়ত বোঝা যায় না। কিন্তু বোঝা যায় রচনাতে কাব্য-প্রতিকৃতির অত্যন্ত স্পষ্টতা দেখে। কবিতার প্রতিকৃতির সঙ্গে গীতি-প্রকৃতির মূলগত পার্থক্য স্পষ্ট করেই চিনে নেওয়া যায়। আজকের দিনে কবিতার ভাব ও কাব্যিক পরিমণ্ডলকে সুরের দ্বারা প্রসারিত করতে পারা যায় না। অর্থাৎ যেমন করে গদ্যকে সুর করে আবৃত্তি করা যায়, কিন্তু সে গদ্য যেমন গীতি হয় না, তেমনি সুরের সাহায্যে কবিতার আবৃত্তিও তেমনি গান হয় না। কবিতার ভাষার বৈশিষ্ট্যে কবিতা পাঠকের পক্ষে বুদ্ধিদৃপ্ত, রসাপ্লুত শ্রবণ-শক্তি এবং রসঘন সহানুভূতির দাবী করে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে গানের প্রসঙ্গে শ্রোতার কাছে তেমন দাবী নেই, তাঁর মন থাকবে অনেকটা সংস্কার-মুক্ত অবস্থায়। অত্যন্ত সহজ ভাবও গানে গভীর ভাবদ্যোতক হতে পারে।

সুর-সংযোজনার প্রয়োজনে গীতির প্রধান বাহন ছন্দ, একথা পূর্বেই বলেছি। ছন্দের বৈচিত্র্য বাছাই শব্দ ব্যবহারের দাবী করে। তাছাড়া ছন্দ গীতি-কলিকে সংহত ও সংবদ্ধ করে। এই সংবদ্ধতাতেই সুর প্রয়োগের সুবিধে হয়। গীতিকারের কাছে শব্দ রচনার কাঠামোটি বাঁধা হয়ে যায়। অর্থাৎ কবিতা রচনায় যে মুক্ত মানসিক বৃত্তি কার্যকরী হয়, গীতি রচনায় তা হয় না। এজন্যে বোধ হয় গীতি রচনা এবং কবিতা রচনার মধ্যে আজকাল একটা আশমান জমিন ব্যবধানের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন ভাষায় আজও কাব্যামোদী সাধারণের অনুভূতিতে কাব্যিক চেতনা জাগ্রত হয় কবিতার সুর-সংযোজিত আবৃত্তির দ্বারা। সে রচনা কবিতাও নয় গীতিও নয় এবং গানও নয়—সবার সম্মিলনে আনন্দ উপভোগের একটি আচরিত কাব্যিক প্রথা মাত্র।

গীতি যখন সুর-সংযোগের দ্বারা পরিপূর্ণ গানের রূপ লাভ করে তখন গানে একটি সরল, এমন কি সহজ কল্পনাপ্রবণ চিত্রও প্রিয় বা প্রিয়তর হয়ে সাধারণের মনোহরণ করতে পারে। মনে করে দেখা যাক, 'ফিরে চল আপন ঘরে', 'কে নিবি ফুল,' 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজায় বনে'—গানগুলোর প্রথম কলিতে এমন কী তাৎপর্যপুর্ণ কবিত্ব আছে যে এর জন্যে পাঠক বা শ্রোতার মনের প্রস্তুতি দরকার? তেমনি আরও বহুতর রচনা উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, সর্বত্রই দেখা যাবে গীতিতে প্রথম কলির রচনায় ভাবসম্পূর্ণতা, স্পষ্টতা ও সরলতা প্রত্যক্ষ ভাবেই বজায় থাকে। বলা বাহুল্য, এ ধরণের রচনাই সুর সংযোজনার পথ সুগম করে রাখে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি রচনা উদাহরণ রূপে ব্যবহার করা চলে এবং রবীন্দ্র-রচনা থেকে আরও সপ্রমাণ হয় যে গীতির সরল সীমানায় বাংলা রচনার কাব্যিক উৎকর্ষ সীমাহীন হতে পারে।

আমরা জানি যে, কোন পদ্যাংশ বা গদ্যকে সুর দিয়ে গাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাতেও সুর প্রয়োগ করা যেতে পারে। সুর প্রয়োগের রীতি সুরকারের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, একথাই প্রমাণ হয়। কিন্তু এসব রচনা যেমন গীতি নয়, তেমনি যে কোন সুর-প্রযুক্ত গানকেই গান বলা যায় না। অর্থাৎ গীতিকে গানে পরিণত করবার আঙ্গিকও এ সম্পর্কে বিচার্য। গীতি রচনার আলোচনায় মোটামুটি একথাই বুঝতে পেরেছি যে সব কবিতাই 'গীতি' হতে পারে না। রচনার দিক থেকে 'গীতি'কে কয়েকটি রীতি মেনে চলতে হয়। এই মেনে চলার আইন কেউ বেঁধে দেয় না; সুর-প্রয়োগের প্রয়োজনে, গানের

প্রয়োজনে আপনি বাঁধা হয়ে যায়। সুর-সংযোজনা গীতি-রচনার পরিণত অবস্থা এবং 'গানে' রূপ প্রকাশ হচ্ছে এর পূর্ণ রূপ। নাটক যেমন দৃশ্য, মঞ্চ ও অভিনয়ে পরিণতি এবং পূর্ণতা লাভ করে, তেমনি গীতিও 'গানে' পরিণত হবার পরে পূর্ণ রূপ লাভ করে।

এ পর্যন্ত সাধারণ ভাবে গীতি রচনা সম্বন্ধে বলা গেল। কিন্তু যাকে আধুনিক গান বলে উল্লেখ করছি তার সঙ্গে প্রাচীন রচনার কার্যকারণের সঙ্গে কিছু বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত (রবীন্দ্রযুগ পর্যন্তই ধরে নেওয়া যাক) গানকে কবির সাংগীতিক সত্তার বিকাশ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়। একটি কারণ, গীতি-রচনার প্রয়োজন অনুভব করতেন কবি নিজে, তাঁর কণ্ঠাশ্রিত সুর-রচনার তাগিদে। বৈষ্ণব কবি, কীর্তন-রচয়িতা, শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা, ভজনকার, নিধুবাবু, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুল—এসকলের গীতি-রচনা তাঁদের সঙ্গীত-সত্তার বিকাশের প্রয়োজনেই হয়েছে। কাজেই এসব ক্ষেত্রে যিনি গীতি-রচয়িতা তিনিই সুরকার এবং তাঁর মধ্যেই রচনার সংগীতরূপের ব্যক্তিত্ব নিহিত।

আধুনিক যুগের গান শুরু হয়েছে তিনটে স্বতন্ত্র দায়িত্ব নিয়ে। একটি গীতি রচনা, দ্বিতীয়টি সুর সংযোজনা এবং তৃতীয় হচ্ছে গান বা গায়কের কর্ম নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এ যেন শ্রম-বিভাগ (division of labour) অথবা যুগোপযোগী বিশেষজ্ঞতার (specialisation-এর) ব্যাপার। প্রথমে জিজ্ঞাসা করছি এর উল্টো কথাটি কি সত্য যে আজকাল আর মানুষের মধ্যে গীতি রচনা ও সুর প্রয়োগের ক্ষমতা একসঙ্গে পাওয়া যায় না বলেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে ? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, আধুনিক কালে সংগীত রূপায়ণের একটি জটিলতর অবস্থা এসেছে বলেই দায়িত্ব এমন বিভক্ত। বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনের (specialisation) প্রসঙ্গে তো বটেই। ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সূক্ষ্মতর প্রয়োগের জন্যই এ পথ। যিনি গীত রচয়িতা তাঁর পক্ষে সংগীতের সূক্ষ্মতর সংযোজনার অভিজ্ঞতা না থাকাও সম্ভব এবং সুরকারের মনেও ব্যবহার্য বাক্য সম্বন্ধে ভাবনা ও সৃজনীশক্তির স্বাভাবিক বৃত্তির উন্মেষ নাও হতে পারে। সেজন্য আজকের গানে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক তিনের স্বতন্ত্র দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক গান বুঝতে গেলে এই তিনের সমন্বয় ভাল করে বুঝতে হবে।

গীতি রচনার উদ্দেশ্য এবং রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা

করা গেল। এ সম্পর্কে মৌলিক গীতিরচনার কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে কায়দায় রচনা সত্যি গানের উপযুক্ত হতে পারে সে ইঙ্গিতও কতকটা দেওয়া হয়েছে। শব্দ নির্বাচন সম্বন্ধে সাধারণ কতকগুলো কথা বলা যেতে পারে, সর্বক্ষেত্রে শব্দাদির প্রয়োগ সম্বন্ধে অবশ্য দৃঢ়ভাবে বলা যায় না এবং শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন সঠিক নির্দেশ দেওয়াও চলে না। রচনা কতকটা সুরকারের বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে চলে। যেমন ধরা যাক ক্রিয়াপদের ব্যবহার, যুক্তবর্ণের ব্যবহার, বড় বড শব্দের ব্যবহার অনেকাংশেই সঙ্কুচিত করবার দরকার হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে শব্দের সরল-প্রকরণ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। সুরধারণক্ষম শব্দ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই গীতি-রচয়িতার বড় গুণ। অন্ততঃ, গীতি-রচয়িতার কবিত্বশক্তি কখনোই এসব প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে নয়। এমনও দেখা যেতে পারে যে গীতের প্রথম কলির চেয়ে গীত-দেহে কাব্যিক প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গান হিসেবে রচনাটি কতটা সফল, স্থূলভাবে বিচার করলে এই গানের সাফল্য সহজ শব্দ নির্বাচনের ওপরও নির্ভর করছে। রবীন্দ্রনাথের গীতি-রচনার কাব্যিক উৎকর্ষের জন্যে বহু বিভিন্ন প্রকারের শব্দের সার্থক ব্যবহারের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। কিন্তু, ব্যবহারের স্থান ও ক্ষেত্র নির্বাচন, ওজন বোধ এবং শব্দের প্রকৃতির পারম্পর্য রক্ষা রবীন্দ্র-গীতিকে যেমন একদিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে, অন্যদিকে রয়েছে তাতে ব্যক্তিগত স্পর্শ অর্থাৎ মহিমময় কাব্যিক সৌকর্যের কৃতি। আধুনিক গীতিতে শব্দ-ব্যবহারে, ক্রিয়াপদ সংযোজনায়, সংযুক্তবর্ণের ব্যবহার ইত্যাদিতে অনায়াস সুর-কলি প্রয়োগের সুবিধে বিশেষভাবে থাকা দরকার। কারণ, আধুনিক গীতি-রচনার লক্ষ্য হচ্ছে জীবন, জীবনের রূপ দেবার পরিসর সংক্ষিপ্ত, এজন্য শব্দ-নির্বাচনের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত বলে মনে হতে পারে। গীতি-রচয়িতার কাছে এ সীমা বাধা-স্বরূপ নয়। মনে হয়, শব্দনির্বাচন কতকটা বিষয়বস্তুর ওপর এবং অনেকাংশে সুর-প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল।

আজকের গানকে "কাব্য-সংগীত" রূপে উল্লেখ করা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ কাব্য বলতে যে বিশেষ অর্থ বোঝা যায়, সে-অর্থে সর্বসাধারণের কানে বাছাই গান রূপে গৃহীত গীতিকে অনেক সময়ে কাব্য বলা চলে না। যে অর্থে বাংলায় রবীন্দ্রসংগীত বিপুল কথার ঐশ্বর্য নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যগীতি হয়েছে সে অর্থে রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের রচনায় অধিকাংশই দুর্বল। নজরুল বিপুল সংখ্যক গান রচনা করেছেন, কিন্তু তার সবগুলোই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে কি? গানের

এমন কোন রচয়িতার নাম করা যায় না। অতুলপ্রসাদের গান আজও জনপ্রিয়, কিন্তু তাঁর রচনায় দুর্বলতার অভিযোগের কথা বলতে গিয়ে শ্রীদিলীপকুমার রায় লিখেছেন, "যে সব কাব্যরসিক গানকে নিছক কাব্যের দিক থেকে বিচার করেন তাঁদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে- শুধু গানরসিকদের এই মূল উপলব্ধিটি না থাকার দরুণ, যে কোনো দেশেই গান নির্ভেজাল কাব্য নয়—অনেক বিশ্ববিশ্রুত গানই নিছক কাব্য হিসেবে যে প্রথম শ্রেণীর কাব্য নয় সেকথা সবাই জানেন।" সুরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কাব্যদ্বারা গানের বিচার চলে না—"অবশ্য সাসুন্দর বা শ্রীহীন শব্দ বা কবিত্বের দৈন্য থাকলে নিশ্চয়ই তা আক্ষেপজনক।"

আজকের দিনের গীতি এই মুহূর্তেরই সৃষ্টি। জীবন দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই চলছে। গীতি এই পরিবর্তিত ঘটনার নির্যাস আহরণ করে নেয়। প্রেমের গান চিরন্তন আবেগের বিকাশ, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেমের বিষয়বস্তু প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে আধুনিক গীতি যেন জীবনকে স্পর্শ করতে চায়। এবং তেমনি সুর সংযোজনাও সে দিকে ঝুঁকে পড়তে চেষ্টা করে। প্রেম চিত্রে কল্পনাপ্রবণতা হয় তরলীকৃত, জীবন গতির ধারক, বৃহত্তর কল্পনা হয়ত লঘু থেকে লঘুতর হয়ে যায় সুর প্রয়োগের কায়দায়। আধুনিক গীতির বিশেষ বিষয়বস্তু প্রেম। জীবনের গতিতে যেমন নর ও নারীর সম্পর্ক-বৈচিত্র্য বহু বিচিত্র ঘটনার মধ্যে রূপ লাভ করে এবং সে সব বিষয়বস্তু বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন শিল্প ও সাহিত্যে প্রকাশিত হয়, গানে এখনো বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হতে পারেনি। পূর্বে শুধু আবেগানুভূতির প্রকাশ করের ভঙ্গিতেই সহজ ছিল, আধুনিক গীতিতে সেই বহু বৈচিত্র্যের ঘটনাবহুল বাস্তব প্রকাশ সম্ভাবনাময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনো বাস্তবজীবন-ছবির ব্যবহার গীতিতে স্পষ্ট না হয়ে প্রকৃতির ছবির সঙ্গে সংমিশ্রণ হচ্ছে। ওদিকে গীতিতে প্রকৃতির ব্যবহারও তেমনি বাস্তব ভাবের উপযোগী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জীবনের কর্মপ্রবণতা, অনবসর শিল্পপ্রবণতা, অভাব, অভিযোগ, অনভিপ্রেত দুর্ভোগ, বহুমুখী জীবন-সমস্যাও গীতি রচনায় প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই এ যুগে গীতির প্রথম কলির বিস্তারের সঙ্গে গীতিদেহে নানা বাস্তবপ্রসঙ্গের ইঙ্গিত দেখা যায়। কাহিনীকে গীতিরূপ দান, ঘটনামূলক কাহিনীতে সুর সংযোজনা করে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও আধুনিক গানের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আরও একটি স্পষ্ট প্রমাণ বলা যেতে পারে। এমনি একটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যেই ত সত্যেন্দ্রনাথ

দত্তের "পাল্কীর গান" কবিতাটিতে সুর সংযোজনা। "গাঁয়ের বধূ", "রাণার" প্রভৃতি আধুনিক সংযোজনাও উল্লেখযোগ্য। শুধু এদিক দিয়েই নয়, আধুনিক গানে "যুক্তসঙ্গীত" বা "যৌথ গানের" রীতিও কতকটা নতুন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথে এ রীতির প্রারম্ভ। কিন্তু আজকে এ রীতির সার্থকতা সুরকার বা সুর-প্রযোজকের প্রযোজনার বিশেষ অপেক্ষা রাখে। আমাদের মূল সংগীত-প্রকৃতিতে একের ভাব প্রকাশই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, ভারতীয় সংগীত-ব্যক্তিধর্মী, ব্যক্তি মনের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য রাগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। এজন্যে ভারতীয় গান অনির্বচনীয়তার সন্ধান দেয়, ধ্যানী মনে তন্ময়তার সৃষ্টি করে। এমন কি কীর্তন গানও ব্যক্তি মনের পারমার্থিক অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্যেই গীত হয়। নেহাৎ লোকসংগীত বা প্রাকৃত অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট কিছু কিছু লৌকিক নৃত্যগীত ছাড়া ভারতীয় ভাবের দিক থেকে সংগীত বাস্তবতার পরিপন্থী। বাস্তবের ক্ষেত্রে নেমে এসে বড় জোর আবেগানুভূতির প্রকাশেই আমাদের গান সম্পূর্ণ হয়। ঠুমরী, টপ্পা, বা বহু লোকগীতির আলোচনা করলেও এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে। সত্যিকার যুক্তসংগীতে থাকে জীবনের স্পর্শ, দুয়ের কথোপকথন, ত্রয়ীর মিলিত কণ্ঠে সুখদুঃখের কথা, বহুর সমবেত বীরত্বব্যঞ্জক গানে জীবনকে সহজেই প্রতিফলিত করতে পারা যায়। এজন্যে কোরাস, ড্যুয়েট, ট্রায়ো—প্রভৃতির প্রয়োগে, গীতি-রচনায় এই যুগ বৈচিত্র্য দাবী করছে। সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এরূপ বহুমুখিতা এযুগের বাস্তবজীবন-প্রয়োগে নতুন রীতি উদ্ভাবন করতে চায়।

আজকের গীতি-রচয়িতা সম্বন্ধে এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। যদিও ধরে নেওয়া হচ্চে যে সুরকারের দায়িত্ব স্বতন্ত্র এবং সুরকার গীতি-নির্বাচন করেই সুরপ্রয়োগে ব্রতী হন এবং উপযোগী কণ্ঠের কথা ভাবেন। গীতি-রচয়িতার দায়িত্ব হচ্চে সুরপ্রয়োগ সম্বন্ধে সজাগ থেকে রচনাকে সুরকারের গ্রহণযোগ্য করা। কারণ শব্দপ্রয়োগ, ছন্দের ব্যবহার ও উপযুক্ত কলি রচনার জন্যে সুর সম্বন্ধে সচেতনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুরের রাজ্য থেকে স্বভাবতঃই গীতি-রচয়িতা (কবি) মুক্ত নয়, যদিও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুর-রচনা বা সুর-প্রয়োগ বিদ্যায় পারদর্শিতা না-থাকাই সম্ভব। সুর-সংযোজনায় নতুন রীতি উদ্ভাবন সুর-সংযোজকের কাজ। গীতি-রচয়িতা হয়ত বহুমুখী সুর-সংযোজনার কথা ভাবতেও পারছেন না।

এইসব কারণে সুরকারের উদ্ভব। গীতি পরীক্ষণ, উপযোগী সুরের কলি উদ্ভাবন, উপযুক্ত যন্ত্রসংগীত সহযোগিতার প্রযোজন এবং উপযুক্ত কণ্ঠের নির্বাচন —এই সব সম্মিলিত হয়ে সুরকারের আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। এ রাজ্যটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দরকার। তা হলেই আধুনিক গানের স্বরূপ আরও বোঝা যাবে।

সুরকার

আধুনিক গানের গঠনের মূলে থাকে দ্বৈত শিল্পীর কারিগরী। প্রথম গীতি-রচয়িতা, যিনি কথাতে সুরের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন এবং অন্যজন সুরকার, যিনি ভাষা ও কাব্যিক তাৎপর্যকে বুঝে নিয়ে কথাকে সুরে রূপান্তরিত করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই এই দু'জন ব্যক্তির মধ্যে দুটো গুণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কবির মধ্যে সুরবোধ এবং সুরকারের মধ্যে কাব্যবোধ। দুয়ের সম্মিলিত ক্ষমতা নিয়েই পূর্ববর্তী যুগের কবিরা সংগীতকাররূপে জন্মেছিলেন। কিন্তু গানে সুরপ্রয়োগে সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য এসেছে বলে আধুনিক গানের প্রতিটি উপাদানের সম্বন্ধে সংগীতকারকে ভাবতে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ আধুনিক গানে এইরূপ দাবীর জন্যেই সুরকারের সৃষ্টি হয়েছে। সুরকার বা সংগীত-প্রযোজক আপন মনের তাগিদে সুরকলি সঞ্চয় করেন এবং গীতিরূপের কথা ভাবেন। সুর-প্রযোজকের এ কাজটির মূলে কি কোন ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে?

শ্রীদিলীপকুমার রায় ১৩৩৮ সনে লিখেছেন "কিন্তু আমরা চাই সুরকারকে —কম্পোজারকে। এ যুগের তৃষ্ণা—সুরকারের তৃষ্ণা। প্রত্যেক যুগেরই একটা যুগধর্ম আছে। আগের যুগেও একধরণের সুরকার ছিল বই কি? মার্গসংগীতে প্রতি গুণীই কমবেশি সুরকার, যেহেতু তাঁদের তানকর্তবে রাগের পর নব নব রূপ নব নব ব্যঞ্জনা তাঁরা দেখান তো বটেই। কিন্তু তবু তাঁদের ধ্বনি-স্থাপত্যে কারুকলার অভাব না থাকলেও—ঠিক অনিবার্যতা যাকে বলে তা নেই, এবং সুরসৃষ্টিতে স্থাপত্যের অনিবার্যতা না থাকলে যথার্থ সুরকার পদবী দাবী করা চলে না।

অবশ্য বলাই বেশি, প্রশ্নটা সুরকার হওয়া না-হওয়া নিয়ে নয়; প্রশ্নটা হল আসলে সৃষ্টির উৎকর্ষ নিয়ে। সুরকারকে আমরা আজ চাই এইজন্যে যে, গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এক তাঁর হাতেই সম্ভব—গায়কের হাতে নয়: কি না

সুরকারই হচ্ছেন সুরলোকের সম্রাট, সুরশিল্পীও (executant) একশ্রেণীর স্রষ্টাজ্যোতিষ্ক বটে। কিন্তু সুরকারের নক্ষত্রলোকে তার ঠাঁই নেই, একথা প্রতি সংগীত-অনুরাগী মাত্রেই মানেন সব সভ্য দেশে—না মেনে উপায় নেই।—এ বিষয়ে য়ুরোপের মানদণ্ডই ঠিক—তারা বরাবরই সুরকারকে করেছে ব্রাহ্মণ, সুর-শিল্পীকে করেছে ক্ষত্রিয়—ব্রাহ্মণের আজ্ঞাবহ। অর্থাৎ সুরের মুনি যা বলেন সুরের গুণীকে তা-ই পালন করতে হবে।

তা হলে দাঁড়াচ্ছে যে, সুরকারের নির্দেশই পরম ও চরম। কিন্তু কখন?—না যখন তিনি ধ্যান-দৃষ্টিতে যা দেখলেন, ধ্যানশ্রুতিতে যা শুনলেন তাকেই ফুটিয়ে তুলতে চান। আমরা দেখেছি খেয়াল-ঠুংরীতে ধ্যানদৃষ্টি বা ধ্যান-শ্রুতির এ অনিবার্যতা নেই—কেননা সেকালে সুররা এভাবে দেখতে বা শুনতে শেখেন নি। এ প্রবণতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি হাল আমলে—এ যুগে। কেননা, এ-ই হল যুগের ধর্ম—এ-ই সুরলীলা অতিপ্রত্যক্ষ উপলব্ধি—concreteness of melodic realisation

তাই আধুনিকতর বাংলা গানের সুরকার পরম সার্থকতা পেতে চাইছেন: শুধু কাব্যের গুণে নয়—কাব্যের সঙ্গে আনবার সমন্বয়ে, সুষমায় সামঞ্জস্যে। একথা বললে অবশ্য সেটা সহনীয় কথা হবে যে যাই বিচ গড়া হোক না কেন—তাকে মঞ্জুর করতে হবে সৃষ্টিমার্গক বলোত্তীর্ণ বলে মেনে নিয়ে। তা নয়।

কম্পোজিশান কাকে বলে তাই আমরা ঠিক মত এযাবৎ জানতাম না—সবে আভাষ পেতে সুরু করেছি একে বলে 'গান'।”—(সাঙ্গীতিকী)

যে কোন গীতিতে সুর প্রযোজনা করতে হলে রাগ সংগীত বা লোক-সংগীতের অনুসরণ করে সুর প্রয়োগ করা দরকার, একথা আমরা জানি। আজকাল কাজটি অবশ্য সুরপ্রযোজক মাত্রেই করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অতুলপ্রসাদ সেন ছোট ছোট দাদরা, ঠুমরী ও খেয়ালের ভঙ্গিতে সুর প্রয়োগের জন্যে কিছু গান রচনা করেছিলেন। নজরুল কিছু গান রচনা করেছিলেন বিশিষ্ট দেশী অথবা বিদেশী সুর প্রয়োগ করার জন্যে। অর্থাৎ গীতিতে সুরসংযোজনা ও প্রযোজনার জন্যে এবং সুরকারের প্রয়োজন লক্ষ্য করে এই গীতি রচনা। এ ক্ষেত্রে গীতিকারের রচনা মুখ্যতঃ সুরকারের জন্যে, যদিও এ দুজন গীতিরচয়িতার মধ্যে সুর প্রযোজনার ক্ষমতা ছিল এবং দুজনেই সুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। এর পরবর্তী আরও একজন গীতিকার, অজয়

ভট্টাচার্য, যিনি গীতি রচনা করেছিলেন স্বতন্ত্র সুরকারের প্রয়োজনে, অর্থাৎ হিমাংশু দত্ত তাতে সুর সংযোজনা করলেন। এক্ষেত্রে সুরপ্রযোজক স্পষ্টতই স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ, সুরকারের সাধনার মূল লক্ষ্য সুরের উপযুক্ত কথার অনুসন্ধান এবং সুর প্রয়োগের কায়দা উদ্ভাবন এবং সবশেষে অভিনব সুর সংযোজনা। অর্থাৎ স্থূলভাবে দেখা যায়, নতুন সুর সৃষ্টির দ্বারা শ্রোতাকে আকৃষ্ট করবার কায়দাতে সুরকারের লক্ষ্য, নতুনত্বের ভিত্তিভূমি প্রধানতঃ রাগসংগীত অথবা লোকসংগীত, কিন্তু এর অর্থ নতুন সুর বা রাগ সৃষ্টি নয়, নতুন সংযোজন, সুরকলি নির্বাচন ও প্রয়োগ। নতুনের প্রয়োজনে আজকের সুরকার আধুনিক গানকে নিয়ে এই ভিত্তির ওপর নতুন সুর সৌধরূপে স্থাপন করেছেন।

মোটামুটি ধরে নেয়া যেতে পারে—প্রায় ১৯৩০ সাল থেকেই এর সুরু। এ সময় থেকেই সুর রচনার সঙ্গে বাদ্য সংগীতেরও বিশেষ রচনার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ তিরিশ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সেই একই পদ্ধতিতে উদ্ভাবন, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, অন্বীক্ষণ ও নিরীক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা গানের সুর প্রয়োগের কাজ চলেছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে সূক্ষ্মতা ও জটিলতার জন্যে, একথা উল্লেখ করা যায়। যে কোন গীতিতে সুর সংযোজনার সঙ্গে প্রতিটি শব্দের গায়ন পদ্ধতি, দমের সংকোচন, সুরের উৎক্ষেপণ, গীতির কলিতে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার, কোথাও আবহ-সংগীত ব্যবহার প্রভৃতি উপাদানগুলি উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক। সুর সংযোজনায় এসব বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা ও ভাবনার প্রয়োজন হয়। এ ধরণের ভাবনা ও অনুরূপ কাজের সুরু আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছরের পূর্বে। সে সময় থেকে গ্রামোফোন রেকর্ড ও রেডিওর জন্যে গীতি-রচনা ও সুর-প্রযোজনার কর্তব্য স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ ব্যক্তির ওপর আরোপ করা হতে থাকে। কিছুকাল পরে সবাক চলচ্চিত্রের জন্যে, সংগীত রচনাও প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সে সময় থেকেই আধুনিক গানের সুরু। এর পূর্ব থেকে রোমান্টিক, আধ্যাত্মিক ও জাতীয়তাবাদের ভাবে প্রভাবিত কবি আধুনিক গানের প্রাথমিক অবস্থার সৃষ্টি করেন। প্রায় উনিশশো ত্রিশের অধ্যায় থেকেই গীতিতে সুরকলির প্রয়োগ, সুরের নানা রূপের উপাদান সঙ্কলন, যন্ত্রসংগীতের প্রয়োগ-কৌশল প্রভৃতির কাজে সুর-প্রযোজক এগিয়ে এলেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের বিভিন্ন কায়দা যেমন কবিদের প্রভাবিত করেছিল তেমনি সুরপ্রয়োগের কল্পনাও নতুনের

সন্ধান দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নানা বিদেশী সুরও সুরকারদের মনকে প্রভাবিত করল।

এ ভাবেই সমসাময়িক রচনার দায়িত্ব দুয়ের ওপরে স্বতঃই আরোপ করা হয়ে গেল: গীতিকার গীতি রচনা করে সুরের ইঙ্গিত দিয়ে রচনাটি সুর-প্রযোজকের হাতে দিলেন। সুর-প্রযোজক সে কাজের জন্যে তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হলেন:

প্রথমে, গানের প্রতিটি ভাববস্তুর জন্যে উপযুক্ত সুর-কলির রচনা এবং ভাবের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য বিধান;

দ্বিতীয়, সুর প্রযোজনার সঙ্গে বিশেষভাবে রচিত যন্ত্র সংগীতের সহযোগিতায় সুর প্রয়োগে সমৃদ্ধি দান; এবং

তৃতীয়, প্রকাশ শক্তির প্রতি লক্ষ্য করে গায়ক নির্বাচন ও সংগীতের প্রত্যক্ষ পরিচালনা।

এ তিনটি কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ করলেই সুরকারের মানসবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। পূর্বে, রচনাকে সুরমণ্ডিত করবার জন্যে কবি যেন তাঁর সুরসত্তাকে এগিয়ে দিতেন, তেমনি কবির পথও ছিল কতকটা বাঁধা, রাগসংগীতের পথ। যথা, অতুলপ্রসাদ ঠুমরী, দাদরা বা খেয়ালের অনুরূপ গীতিতে সুরসংযোজনা করলেন, নজরুলও অনুরূপ কায়দাতে খেয়াল-ভাঙা এবং গজলের পদ্ধতিতে বাংলা গানের সৃষ্টি করলেন। এ সম্পর্কে এর পূর্বেকার রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত পন্থার কথাও স্মরণ করা যেতে পারে।

কিন্তু আধুনিক গীতিতে সুরপ্রযোজনার পদ্ধতি আরও খুঁটিনাটি বিষয়ে এগিয়ে গিয়েছে: যথা সুরকলির উদ্ভাবন, স্বরসঙ্গতির সৃষ্টি, বিভিন্ন স্বরসমষ্টির সমন্বয়-সাধন, ইত্যাদি। এ পথ ব্যাপক এবং বাঁধারীতির পথ নয়, এ হল ক্ষুদ্র ও খণ্ডকে এক সামঞ্জস্যে মণ্ডিত করবার পন্থা। আমরা জানি, সমস্ত গানের সুরের গঠনে একটি পরিকল্পনা, রাগরাগিণীর অবিমিশ্র ভাবকল্প রূপের সৃষ্টি, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেদনাত্মক অথবা উদাস করা রাগ নির্বাচন অথবা পল্লীসুরের ভাব ও রূপের প্রয়োগে গানরচনায় পূর্বের সুরকার কবি, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং আরও অনেকে নানান কাজ করেছেন। ভারতীয় রাগ-সংগীত ব্যক্তিধর্মী এজন্যে, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, আকুতি, বিরহ, দুঃখ, বেদনা, এমনকি অনির্বচনীয়তার সন্ধানেও সুরের প্রয়োগ গীতরচয়িতাদের কল্পনায় স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

আধুনিক সুরপ্রযোজক পরীক্ষণ সুরু করলেন নতুন দুটো দিক থেকে: প্রথমত, শ্রোতার মনোরঞ্জন এবং দ্বিতীয়ত, সেই কারণেই সম্পূর্ণ আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে লক্ষ্য না রেখে কতকটা পরতন্ত্র রুচি বা শ্রোতার মানসিক আকর্ষণ অনুযায়ী সুরের রচনার দিকে ঝুঁকে পড়া। আধুনিক গান সুরের এই তদ্‌গত বা objective আচরণেরই ফল। এই মনোভাবের ফলে প্রচলিত রাগের গঠন বজায় রাখার কোন উদ্দেশ্যই সুর-কাব্যের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়, সংগীত-কলি রচনায় নবীন উদ্ভাবনের নেশাই তাঁদের প্রবল হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রচলিত রাগের গঠন ও বাঁধা সংগীতকলি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবার সম্ভাবনা সুরকারদের মধ্যে স্বভাবতই এসে পড়ে। কারণ, যে কোন রাগের রূপ বা রস কতকটা একীভূত, একই ভাব সমগ্রতায় বাঁধা। যথা, কেদার বা মুলতানী রাগের যে রস আমাদের জানা আছে, তাতে আমাদের সংস্কার অনুসারে বিশেষ সময়ের লক্ষণযুক্ত বিশেষ আবেগের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আধুনিক সুরকার হয়ত এই দুটো স্বতন্ত্র ধরণের, অথবা এমন কি দুটো বিরুদ্ধ ধরণের রাগ থেকে দুটো কলি সংগ্রহ করে, কবিতার ভাব অনুযায়ী তাকে একটি সূত্রে গেঁথে দিতেও পারেন, অথবা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে পল্লব সংগ্রহ করে একটি উপভোগ্য গানের তোড়া রচনা করতে পারেন। এমন রচনাকে তো তথাকথিত সংগীত-রীতির বিশ্লেষণ দ্বারা বিচার করা চলতে পারে না। সুরের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য, নির্বাচন, গ্রন্থন এবং সম্পূর্ণ বস্তুকে একটি সমগ্র রূপদান হচ্ছে সুরকারের দায়িত্ব। সুর-প্রযোজক হয়ত এ রচনায় নিয়মশৃঙ্খলার একটি পন্থা আবিষ্কার করেছেন। ইনি অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃত করতে পারেন, অজ্ঞাত সুরকলিকে উদ্ভাবন করে গীতিতে প্রয়োগ করতে পারেন, অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধর্মী বৈদেশিক অথবা বিভিন্ন দেশের লোক-সংগীতের অদ্ভুত সুরকলিকার সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোজন করতে পারেন এবং গানের কায়দাতে বস্তুনিষ্ঠতা প্রকাশ করতে পারেন। এইসব খুঁটিনাটি details বা বহুতর উপাদান সম্পর্কে ভাববার সময় ও মানসিকতা কবি বা গীতি-রচয়িতার মধ্যে থাকা সর্বদা সম্ভব নয়। এজন্যেই আধুনিক গানের এই দুটো দিক স্বতন্ত্র ভাবে বিচার্য—অর্থাৎ গীতি-রচনা একজনের দায়িত্ব এবং সুর-সংযোজনা ও প্রযোজনা অন্যজনার।

এজন্যেই আধুনিক গানের মূল্যায়নে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিতে বা রাগসংগীতের তথ্য ও সংজ্ঞা অনুসারে বিচারের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিচারের মাপকাঠি নির্ভর করবে সুর-প্রযোজকের গীতি ও কণ্ঠ নির্বাচন এবং সুরক'

শক্তি, গ্রন্থনা, সামঞ্জস্য-বিধান ও সংগতি-সংরক্ষণে। আধুনিক গানে কোথাও রাগরূপ রক্ষিত হবে কিনা তা বিশেষ বিচার্য নয়, গান করবার কায়দায়ও প্রচলিত প্রকাশভঙ্গি আজকাল বজায় নেই, কিন্তু তা'বলে আধুনিক গান ব্যর্থ হয় না। বরং সুর-প্রযোজকের objective দৃষ্টিভঙ্গি রচনার কারিগরী ও সৌকুমার্য সৃষ্টির সহায়ক কি না, এ প্রশ্নই মনে জেগে ওঠে। পূর্ববর্তী যুগের সংগীত-রচয়িতাদের গীতি রচনার মূলে ছিল তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সংগীত প্রেরণা, কিন্তু গীতি-প্রযোজক বা সুরকারের প্রতি পদক্ষেপে থাকে তাঁর নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের কাজ। কারণ, সুর-প্রযোজক নিজে গান করবার জন্যে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, সুরকারের দায়িত্ব হচ্ছে প্রকাশের পন্থা প্রবর্তন করে নিজে শ্রোতার স্থান গ্রহণ করা। কাজেই, সুর-সংযোজনার জন্যে উপযুক্ততা অর্জন করতে হলে সুরপ্রযোজক হবেন সংগীতের অভিব্যক্তিতে অভিজ্ঞ, বর্তমান রুচি ও রসবোধে সপ্রতিভ এবং ভাবাবোধের ক্ষমতায় বিশিষ্ট ও কাব্যরসের অধিকারী। দেখা যাচ্ছে আধুনিক সংগীত প্রযোজক specialisation-এর অলঙ্করণে অলঙ্কৃত। আমরা সুর-প্রযোজনার কাজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বুঝে নিতে পারি :

১) স্বর-গ্রন্থনার পন্থা উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ,

২) বিভিন্ন দেশ ও প্রদেশের ভিন্ন রীতির সঙ্গীতে আগ্রহ, গ্রহণ ও স্বীকরণের (assimilation) চেষ্টা,

৩) সুর সংযোজনায় নানা ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিতের এবং বিস্ময়সৃষ্টির (surprise) কায়দা উদ্ভাবন,

৪) একঘেয়েমি দূর করে ভাবানুগ সুরপল্লব তৈরি,

৫) ছন্দে বৈচিত্র্য সাধন,

৬) সুর গ্রন্থনায় পরিবেশ ও সংঘাত সৃষ্টির (climax) চেষ্টা,

৭) গীত অনুযায়ী কণ্ঠ নির্বাচন অথবা, কণ্ঠের গুণ অনুযায়ী সুর-সংযোজন এবং

৮) যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং orchestral piece রচনার দক্ষতা ও গীতের পরিবেশ রচনার চেষ্টা।

এমনও হতে পারে যে এক-একজন সুরকারের মধ্যে এক একটি গুণ বিশেষরূপে পরিস্ফুট। একটি ভাল আধুনিক গান রচনার মূলে সুর-

প্রযোজকের এমনি বহুমুখী কর্মকুশলতা লক্ষ্য করলে আধুনিক গানের সমালোচনার পন্থা সঠিক নির্দেশ করা চলে।

স্বর-রচন য় প্রযোজকদের মধ্যে এক বা বহুতর গুণাবলীর প্রকাশই স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিগত তিন চার দশকের গানে যাঁরা সুর দিয়েছেন এবং যাঁরা বিগত হয়েছেন তাঁদের কয়েকজনার কয়েকটি ব্যক্তিগত কৃতির কথা উল্লেখ করছি। হিমাংশু দত্ত বহু বিখ্যাত গানে রাগরীতিকে রক্ষা করে গীতিতে রাগের বিশেষাংশকে গানের কলিতে তাৎপর্যমূলক করেছেন, শৈলেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত দ্রুতছন্দের সমীক্ষণে দেশী ও বিদেশী স্বরপল্লবের প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন, সুধীরলাল চক্রবর্তী সুরের আকস্মিক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে উচ্চস্বর এবং নিম্ন বা মধ্য স্বরের সামঞ্জস্য বিধানে এবং ছন্দ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং অনুপম ঘটক বিভিন্ন স্বরের সঙ্গতি এবং বিভিন্ন কণ্ঠের স্বতন্ত্র স্বরের ঐক্য সৃষ্টি ক'রে (Harmonisation) আধুনিক গানে নতুন পরীক্ষণ করেছেন। এঁরা কেউ আজ বেঁচে নেই, কিন্তু এঁদের সুর-সংযোজনায় যে বিশেষ লক্ষণ দেখেছি তাই উল্লেখ করলাম। তা ছাড়া এ যুগের সুর প্রযোজনায় নজরুলের দানও যথেষ্ট, বৈদেশিক গানের পদ্ধতিতে আধুনিক-গানের প্রয়োগ, রাগসঙ্গীত থেকে পল্লব সংগ্রহ করে অনুরূপ গীতরচনা করে সুর প্রয়োগ, ছন্দের এবং সুরের নানান প্রয়োগ-বৈচিত্র্য, যুক্তসংগীতের পন্থা উদ্ভাবনের জন্যে উপযুক্ত গীত রচনা করে তাতে সুর প্রযোজনা প্রভৃতি নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি ও সক্রিয় সহযোগিতা আধুনিক গীতি-প্রযোজকের বা সুরকারের মর্যাদায় নজরুলকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কবিগণ সুরকার হিসেবে সর্বদা যে সুরের নানা শাখা পল্লব বিবেচনা করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংযোজন করতে পেরেছেন একথা বলা যায় না। সে সময় ও অভিজ্ঞতার বিস্তৃত সুযোগ অনেকের হয়েছে এরূপ বলা চলে না। এজন্যে চিরায়ত সংগীত অবলম্বন বা অনুকরণই সহজ পন্থা ছিল।

যাঁদের নাম করা হোল, এঁরা সকলে আধুনিক সংগীতের সুর প্রয়োগে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন সে সব এখানে বক্তব্য নয়। বক্তব্য হচ্ছে : যে ধরণের চেষ্টা এঁদের করতে দেখা গেছে এবং সুর-সংযোজনায় কোন কোন ক্ষেত্রে যে মৌলিক রচনাশক্তি এঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে, আধুনিক গানের সমালোচনা করতে বসে এইসব বিষয়কেই বিচার্য বস্তু বলে গ্রহণ করা উচিত ; যেখানেই আধুনিক গানের বিরূপ সমালোচনা দেখা যায়, সেখানে মূল লক্ষ্য

থাকে 'কথাবস্তু বা গীতি', সঙ্গে সঙ্গে গানের অন্তঃস্থ সুরপ্রকৃতি সম্বন্ধে শুধু সুরের প্রকৃতি, অর্থাৎ হাল্কাভাব বা গভীরতাব ছায়াপাত সম্বন্ধে উক্তি করা হয়। আমরা বলছি, সুরসংযোজনা প্রযোজনার কাজ উল্লেখ করে আধুনিক সংগীত আলোচনাব প্রয়োজন। একথাও বলা দবকার যে এঁদেব সমসাময়িক বা পরবর্তী কালেব যাঁরা আজও আধুনিক গানের সুবসংযোজনা ও প্রযোজনাব কাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবে যাচ্ছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যে আরও অধিকতর কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যায়। বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পর্শও অনেকের রচনার মধ্যেই রয়েছে, রচনা ও প্রযোজনায় হয় অনুরূপ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন। হয়ত সমসাময়িক কোন কোন সুর-সংযোজক শিল্পসৃষ্টিতে বিস্ময়ের সন্ধান দিয়েছেন। কিছু আলোচনা গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেওয়া গেছে। এখানে শুধু আধুনিক গান বিচারেব principles বা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা উদ্দেশ্য।

আধুনিক গানেব বিরূপ সমালোচনার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের উত্থাপন করা যেতে পারে।

(১) সুবকাব বা সুর-প্রযোজক তাঁব নব উদ্ভাবিত সুরকলির প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা কি চিরাচবিত সংগীত-রীতির বিরুদ্ধ কোন বস্তুব অবতারণা করেন?

(২) এঁরা কি প্রচলিত রাগসংগীত বা দেশী সংগীতকে রূপান্তরিত বা বিকৃত করে রুচি ও রসবোধের দিক থেকে ভ্রষ্ট শিল্প সৃষ্টি করেন। এবং

(৩) রবীন্দ্র সংগীতের মতো এমন সার্থক, অপরূপ কাব্যগীতিতে রাগ-পরিকল্পিত এবং দেশী রীতি অনুযায়ী সুর প্রয়োগের পর, স্বতন্ত্র সুরের কারিগরী কি শিল্পের দিক থেকে অবান্তর?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। যে গানেব আলোচনায় প্রচলিত সংগীত-রীতিকে অনুসরণ করা যায় না, অন্তত যে সুর-রচনার আলোচনা করতে গেলে রাগসংগীত বা দেশী গীতিপদ্ধতি অনুযায়ী আলোচনা চলে না, সে গান সম্বন্ধে এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। যে কোন সংগীত-রীতিই হোক না কেন, চিরাচরিত basic বা মূল সংগীত পন্থা থেকে সে স্বতন্ত্র হতে পারে না। আধুনিক সংগীত সেই একই জমিতেই প্রতিষ্ঠিত। সেই একই জমিতে স্বতন্ত্র রূপের গঠন, স্বতন্ত্র উপাদানের প্রয়োগই আধুনিক গানের লক্ষ্য। সংগীত-ইমারতের চিরাচরিত যে গঠন-পদ্ধতি রয়েছে, তাতে বহুযুগের বহু সংস্কৃতির ধারা এসে সংমিশ্রিত হয়ে তাকে একটি শাস্ত্রীয় সৌষ্ঠবে

বা classic structure-এ পরিণত করেছে। রাগসংগীত বিকশিত হচ্ছে, অদল-বদল হচ্ছে, তাতে রং ফিরছে কিন্তু structure বা গঠন-পদ্ধতির রূপান্তর ঘটে নি। আধুনিক গানের গঠনে নতুনত্ব হচ্ছে তার সমকালীন পরিবেশ। উপাদান স্বতন্ত্র ধরণের, কারিগরীতেও নতুন মানসিকতা, অর্থাৎ structure-এ নতুনত্ব।

পূর্ববর্তী বিশ্লেষণে দেখেছি যে সুর-সংযোজনার আধুনিক কারিগরীতে সুর ও যন্ত্রের সংগীত সংগ্রহ ও সংযোজন একটি প্রধান কাজ। রাগ-সংগীতে যেমন সম্পূর্ণ রাগের ধারণা থেকেই শিল্পের সুরু হয়, আধুনিক গানে তারই বিপরীত রীতি অনুসৃত। যাত্রাপথ—ক্ষুদ্র ও খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ, অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড সুর সমূহের সংযোগে একটি গানের সৃষ্টি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এ যেন পল্লবগ্রাহী সুররসিক, পুরাতন থেকে পল্লব সংগ্রহ করে বর্তমান শিল্পে কারিগরীর বিন্যাস করেছেন। মনে হয়, প্রযোজনার অর্থ হচ্ছে commercial art-এর মতো বস্তুকে প্রয়োজন অনুসারে সৌন্দর্যে অলঙ্কৃত করার জন্যে বিভিন্ন অলঙ্কার সঞ্চয় করা এবং প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সে সঞ্চয়কে চমকপ্রদ করে তোলা। কিন্তু একথাও সবখানে সত্য নয়।

পুরাতন রাগপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রেখেও গান আধুনিক হতে পারে। সুর প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে, ছন্দের বৈচিত্র্যে এবং বিশিষ্ট গায়ন-পদ্ধতিতেই গান অধুনিক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সে গান শুনে রাগরাগিণীর কথা হয়ত মনেও আসবে না। মনে আসবে একটি কথায় সৃষ্ট ভাবজগৎ এবং তাতে গাঁথা হয়েছে যে সুরপল্লব বা সুরের কলি, অথবা patterns বা সুরভঙ্গি বা সুরের ছাঁদ। বলা বাহুল্য, এই সঙ্গে যদি বিদেশী সুরপল্লবের বা কলির সার্থক সংমিশ্রণ হয় এবং তাতে যদি সামঞ্জস্য সাধন করা যায়, তা হলে শ্রোতার মন হয়ত আরও আকৃষ্ট হতে পারে। অতএব, একথা সত্য যে আধুনিক গানের ভিত্তি-ভূমি চিরায়ত সঙ্গীতেরই ভিত্তিভূমি, কিন্তু সুর রচনা পদ্ধতি এবং রচনার মানসিকতাই তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। আধুনিক গান চিরায়ত সঙ্গীত-রীতির বিরুদ্ধ বস্তু নয়, কিন্তু রচনায় সে বিশিষ্ট এবং শিল্পরীতিতে আধুনিক গান একটি স্বতন্ত্র রীতি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্ভব হয় রুচি ও রসবোধ সম্পর্কে। আধুনিক গানের গঠনে বিকৃত রুচি ও রসবোধের কথা অনেক ক্ষেত্রেই শুনতে পাওয়া যায়। রুচি-বিকার ধিকৃত রোগ বিশেষ। যেখানে গানের উদ্দেশ্যই

হচ্ছে বিকৃত রুচির দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ, সেখানে রুচিবিকার হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষত বাস্তবানুগ শিল্পরচনায় কোন কোন স্থলে এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগতে পারে। এ ধরণের উদ্দেশ্যমূলক রচনার কথা বাদ দিয়ে মৌলিক আধুনিক গানের রচনার দিক থেকে বিরুদ্ধ-অভিযোগের বিচার করা যেতে পারে। প্রথমেই বলছি, "আধুনিক গানে রস ও রুচিবোধের ব্যত্যয়"—এ উক্তিটি সম্পূর্ণ অনাসক্ত এবং শিল্পদৃষ্টিসম্পন্ন মনের কথা নয়। অর্থাৎ রাগ-সংগীতের সংস্কারমুক্ত মনই যা কিছু আধুনিক সব যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করতে পারবেন। বিচার্য বস্তুর প্রকৃতি নির্দেশ করা এবং বিচারের সূত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে এ বিষয়ে বাধা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কারবদ্ধ মানসিকতা স্বীকার করে নিতে চায় না, এক্ষেত্রে সহানুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব খোঁজা ও যুক্তি দিয়ে বুঝে নেওয়া একমাত্র পথ।

রচনায় অত্যন্ত হাল্কা মনোভাব, যথা Rock and Roll'এর অনুকরণ। লা-লা-লা'র উচ্চকিত হুল্লোড়ের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট সুরভঙ্গি অথবা চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ী দৃষ্টি-পূর্ণ তরল রচনার দ্বারা সাধারণের মনোহরণের চেষ্টা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বলা যেতে পারে। শিল্প-সৃষ্টি রূপে এ রচনা কোন পর্যায়েই স্বীকার্য নয়। অনুকরণ কোন অবস্থায় শিল্পসৃষ্টির বিষয় হতে পারে না। উদ্দেশ্য-মূলক রচনা এবং অনুকরণপ্রিয়তার মূলে কোন মৌলিক, সৃষ্টি-প্রিয় মন ক্রিয়াশীল হয় না। এই সাময়িক রচনা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিছুকালের জন্যে জনতার প্রিয়ও হতে পারে। এতে ভাবনার কিছুই নেই। এ পর্যায়ের রচনার দ্বারা আধুনিকতার বিচার চলে না। কারণ এক্ষেত্রে রচনারীতি বিচারের কোন সার্থকতা নেই এবং এসব গান লক্ষ্য করে আধুনিক গানের রস ও রুচিবোধের ত্রুটির কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। আধুনিক গীতিরচনার মৌলিকতা এবং রীতি-সম্মত সুর সংযোজনা বিচার করে আধুনিক গানকে বোঝা যায়। সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ে সামঞ্জস্য সাধন; যুক্তিসঙ্গত সংযোজন পদ্ধতি এবং সবশেষে ব্যক্তিগত শিল্পবোধের ছোঁয়া আধুনিক রচনাকে সেরা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে বলে বিশ্বাস করি। আধুনিক গানের রীতি, সংযোজনা এবং গায়নপদ্ধতি—এ তিনের বিশ্লেষণে যা সঙ্গত প্রমাণিত হবে তাকে রুচি ও রসবোধের দিক থেকে সঙ্গত বলা চলবে।

এবারে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে একথাই বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক গানের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন বহু বিচিত্র ধরনের সুর-সংযোজনার দ্বারা।

ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে জীবনের হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-রসকে সুরে রূপান্তরিত করবার কায়দা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সুরকে বাস্তবরূপ দান করবার প্রবৃত্তিও স্থান বিশেষে স্পষ্ট হয়েছে। নাটকের গানের জন্যে সুর প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীবনস্পর্শের প্রভাব স্পষ্ট। সুরের মধ্য দিয়ে পাত্রপাত্রীর কথার প্রকাশ-ভঙ্গিতে নতুন উদ্ভাবন উল্লেখযোগ্য। এসব লক্ষণ আধুনিক গানের প্রারম্ভ সূচনা করে। কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের গান অনেকটাই রাগরূপের ওপর নির্ভর করে। রাগগুলোকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের কতকগুলো প্রত্যক্ষ ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত করে নতুন তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেছেন। রাগরাগিণীর চিরাচরিত ধারণাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাগের মধ্যে আর একটি অন্তর্নিহিত ভাব-প্রতীক অনুভব করেছেন। রবীন্দ্ররীতির সুর-সংযোজনায় সেই ভাবই অবলম্বন করা হয়েছে। এজন্যে রবীন্দ্র-সুররচনার মূল হচ্ছে রাগাশ্রয়ী অথবা প্রচলিত লোকসংগীতের সুর-প্রধান। কিন্তু এর প্রধান বৈচিত্র্য হচ্ছে চলিত রাগের সুরের মধ্যে নবসংযোজন ক্রিয়া এবং ছন্দের নানা রূপান্তর। কথার অংশকে জোট করে ভাবের সংগতি রেখে সুরে বিন্যাস করা—রাগ-সংগীতের গানের মতো শুধু শব্দগুলোকেই নয়। সুরের নব সংযোজনে কোন কোনো জায়গায় আধুনিক সুর প্রযোজনার লক্ষণও প্রকাশ করছে, যেখানে রাগ-রাগিণীর রূপের অস্তিত্ব ভুলে যেতে হয়, সুর-কলিকার বা সুরপল্লবের ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, যেমন—"তোমার হোল সুরু" গানটি। এরূপ বহু উদাহরণ দেখা যায়।

আমরা পূর্বেই বুঝে নিয়েছি যে সুর-সংযোজনার অনেক বৈচিত্র্যের মধ্যে আধুনিক গানের লক্ষণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়—সুরকলিকা ও সুরপল্লবের গ্রন্থন-পদ্ধতি এবং বিচ্ছিন্ন স্বরগুচ্ছের সামঞ্জস্যময় ও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা। এদিক থেকে বিচার করলে গীতি-রচনা বা গীতি-নির্বাচন নির্ভর করে সুর-সংযোজকের ওপর। সে জন্যই আধুনিক গীতিরচনার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রচনা পুরোপুরি কাব্যরসসমৃদ্ধ; ব্যক্তিগত সুরভঙ্গির স্পর্শ সেখানে প্রধান। রচনা ও সুর-প্রযোজনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আধুনিক গীতি রচনার একটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। নিতান্ত সহজ ভঙ্গির, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে কাব্যরসবিহীন, গীতিও শুধু প্রযোজনা ও গায়ন-পদ্ধতির গুণে ভাল আধুনিক গান বলে আদরণীয় হয়ে উঠতে পারে। সে

গানের আবেদন স্বতন্ত্রভাবেই শ্রোতার কানে ধরা দেয়। ব্যক্তি-প্রতিভায় সৃষ্ট গীতি ও সুর এক্ষেত্রে তুলনীয় নয় এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এসব স্থলে বিচার্য নন। কারণ, সাধারণের প্রয়োজন ও ব্যবহারের উপলক্ষে এ রচনার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করা চলে না।

এপর্যন্ত আধুনিক গান সম্বন্ধে যে ধারণা হোল তাকে একটু সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক :—যে গানের কথা-রচনায় জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে এবং বাস্তবতা যাব বিষয়বস্তুতে স্পষ্ট এবং যে রীতিতে সুরপ্রয়োগের কায়দা প্রতি অংশেই বিশিষ্ট-ভাব প্রকাশ করে এবং যে গানে নানান বিচিত্রধর্মী সুরকলিও প্রযুক্ত হতে পারে, যে গানের সুর-রচনায় মূলগত উদ্দেশ্য থাকে ভাব-প্রতীকের গ্রন্থন এবং বিচিত্র ও বিভিন্ন ধর্মী স্বরসঙ্গতি সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সাধন, সবশেষে যে গানে যন্ত্রসংগীতের সহযোগিতা তাৎপর্যমূলক, তাকেই আধুনিক গান বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

সুরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই আধুনিক গানে প্রধান এবং প্রবল মনে হয়, গীতিকার সেখানে গৌণ। কিন্তু গীতির প্রয়োজনও যে অসামান্য, একথা অনস্বীকার্য। আধুনিক গানের ভিত্তিভূমি মার্গ ও দেশী সংগীত হলেও বিচ্ছিন্ন সুরকলির প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রযোজনার কাজ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে গান হয় রাগের নিয়মের বাইরে।

কিন্তু এর পরেও গানের গায়ন-পদ্ধতি বলে আরও একটি প্রধান লক্ষণ বিচার করা দরকার। গায়ন-পদ্ধতির স্থান আধুনিক গানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত —আরও অতিরিক্ত একটি দিক। গায়ন-পদ্ধতি বা শৈলীর বিচার না হলে আধুনিক গানের পরিচয় যেমন অসমাপ্ত থাকে, সুরকারের প্রয়োগের নৈপুণ্যও তেমনি বিচার করা যায় না।

গায়ন-পদ্ধতি

এখানে 'গায়কী' শব্দটির উল্লেখ করব না। গায়কী বলতে হিন্দুস্থানী রীতি বা শৈলীকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। 'গায়কী'র প্রসঙ্গে ঘরাণা গায়কীর কথাও মনে আসে। বংশপরম্পরাক্রমে যে বিশিষ্ট ভঙ্গিটি চলে আসছে এবং গানের যে ভঙ্গিটি নানা উপাদানের জন্যে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে,উত্তর ভারতীয় গায়কীর সে রীতিগুলো মোটামুটি অনেকের জানা আছে। বিশেষ কোন কোন ব্যক্তির গানের কায়দা থেকেই তার সৃষ্টি হয়

এবং ক্রমবিকাশ লাভ করে। গায়কীগুলো এক-একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়েছে সে জন্যে 'কিরাণা-ঘরানা', 'রঙ্গিলা'-ঘরানা', প্রভৃতি 'ঘরানা-গায়কী'র কথাও প্রচলিত।

আধুনিক গানের রীতিতে এ ধরণের ব্যক্তি-প্রভাবিত বংশ বা শিষ্য পরম্পরা সচল রীতির প্রসঙ্গ বিচারের অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক গান আজকের দিনের গান এবং গায়ন-রীতি উদ্ভাবন করবার দায়িত্ব সুরকার ও প্রযোজকের ওপর ন্যস্ত। কণ্ঠের গুণাবলীর অনুসারে সুরপ্রযোজনার কায়দা উদ্ভব করা দরকার হয়ে পড়ে। সেজন্যে গানের রীতিতে যদি কোন ছাপ থাকা সম্ভব—তা হলো সুরকারের শিল্পরীতির ছাপ। রীতি কথাটা ঐক্য, সামঞ্জস্য, সঙ্গতি এবং ধারাবাহিকতার কথা মনে করিয়ে দেয়। যে সুরকার দু'শটি গীতিতে সুর-প্রযোজনায় ঠিক তেমনি সঙ্গতিকে রক্ষা করে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ করতে পারেন, তাঁর সুর প্রযোজনায় একটি রীতির সৃষ্টি হতে পারে সন্দেহ নেই। সেজন্যেই গায়ন-পদ্ধতিতে ও শিল্পের প্রকাশে সে গুণ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। আমরা আজকাল আধুনিক গান শুনলে কোন কোন স্থলে বলতে পারি—সে গান কোন সুরকারের রচনা।

বলা বাহুল্য যে সুররচনার উদ্ভাবনে ঐক্য, সঙ্গতি এবং ধরাবাহিকতা নেই, তাতে কোন গায়নপদ্ধতির সৃষ্টি হতে পারে না। এ ধরণের চিন্তাশীলতার অভাবে আজকের বহু আধুনিক গান শুধু কৃত্রিম অনুকরণশীল ভাঙ্গ মাত্র, কোনও সাময়িক উদ্দেশ্যের চরিতার্থতার জন্যেই চালু আছে।

গায়ন-পদ্ধতির ধারাবাহিকতা এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে সুরকার গায়কের কণ্ঠকে যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করে কায়দা উদ্ভাবন করেন। যে শিল্পীর কণ্ঠে মন্দ্র স্বরের গলার প্রকাশ সহজ, সেখানে গানের কায়দা এক ধরণের রসপরিবেশন করতে পারবে, আবার যে কণ্ঠে তার-স্বরের চড়াগলায় মোড় ফেরে অবলীলাক্রমে, সে ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র রীতির প্রয়োগ হবে। গানের মধ্যে এই দুজনার দুটো স্বতন্ত্র ধরণের কণ্ঠে স্বতন্ত্র গায়ন-পদ্ধতির স্ফুরণ হতে পারে। আমরা কথায় বলি মোটা ও ভারী গলা, অথবা সরু গলা। মন্দ্রস্বর-প্রধান কণ্ঠটি হয়ত কতকটা সাদাসিধা, তারস্বর-প্রধান কণ্ঠটির অনুরূপ নয়। এ কারণে সুরকারের কাজে কণ্ঠের গুণাগুণ নির্ধারণের একটা দিকও আলোচ্য বিষয়। সমস্ত প্রকার কণ্ঠ সকল গানেই রসসৃষ্টি করতে পারে না। আধুনিক গানে এজন্য বিশেষ কৌশলীর গায়ন-পদ্ধতি বলে কোন ধারাবাহিক রীতি

থাকা সম্ভব নয়। সামগ্রিক ভাবে সুরসংযোজনার তাৎপর্যমূলক কায়দা থাকা সম্ভব। শুধু সুরকারের সৃষ্টির পরিচয় গানের মধ্যে পরিচিত। এজন্যে কতকটা সুরকারের ব্যক্তিত্বকে মেনে নিয়ে গান জনপ্রিয় হয়। আজকের সুরকার আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করেন। ইনি শুধু মন্দ্র-স্বর বা তারস্বর প্রধান কণ্ঠই চিনে নিতে চান না। কোন্ কণ্ঠ পল্লীসুরের উপযোগী, কোন্ কণ্ঠ গভীর আবেগ-প্রধান অথবা কোন্ কণ্ঠ ভাল পরিবেশন-শৈলীর (exhibitionism) ধারক—এসব তিনি বেছে নিতে পারেন।

তবু বলব গানের জনপ্রিয়তা কণ্ঠনির্ভর। কণ্ঠের ঐশ্বর্যকে আমরা সর্বাগ্রে স্থান দিতে ত্রুটি করি না, কারণ প্রথমতম আবেদন হয় কণ্ঠের অভিব্যক্তিতে। কণ্ঠ শব্দটি শুধু 'আবাজ' বা স্বরের মাধুর্য নয়। কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য তার অভিব্যক্তিতে। মনে পড়ে, মিষ্টি গলার কীর্তন শুনেছি, আবার ধরা গলার কীর্তনও শোনা হল। ধরা গলার গানে শ্রোতা প্রমত্ত হয়ে উঠল—এও দেখেছি। এক্ষেত্রে 'অভিব্যক্তি' উৎকর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক গানের অভিব্যক্তিতেও কণ্ঠের একটি বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে।

খেয়াল গানের জন্যে কণ্ঠের মাজাঘসার ফলে একটি সুকণ্ঠ যেরূপ দৃঢ়, ওজনবদ্ধ এবং তীক্ষ্ণ হয়, আধুনিক গানে সে তীক্ষ্ণতা ও দৃঢ়তা সাধারণত দেখা যায় না। রাগ-সংগীতের স্বরবিস্তারে, তানে, কণ্ঠের সঙ্কোচনে, মুখ-ব্যাদানে, স্বরপ্রসারণের উপর কণ্ঠপেশীর একধরণের ইচ্ছাকৃত ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে কণ্ঠপেশীর সশ্রম ক্রিয়াও গায়কের এইরূপ আত্মসচেতন ইচ্ছার ফল নয়। এ অনেকটা সহজ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত। যথা, খেয়াল গানের বিস্তার ও তানের সময়ে কণ্ঠের, জিহ্বার ও তালুর এবং বিশেষ করে কণ্ঠনালীর ব্যবহারে কতকগুলো কৌশলের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এ ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করবার জন্যে সংগীত অনুশীলন করে বিশেষভাবে অধিকারী হতে হয়। আধুনিক গানে কণ্ঠের কৌশল সহজ, স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং অবলীল। আধুনিক গায়কের কণ্ঠে দম এবং ক্ষমতার প্রয়োগ রাগ-সংগীতের কণ্ঠের তুলনায় কতকটা সীমিত। কণ্ঠসাধনার ঐশ্বর্যলব্ধ দ্রুত সঞ্চরণের কায়দা কণ্ঠপেশীর অতিরিক্ত সঞ্চালনের প্রস্তুতি আধুনিক গানে অনেক সময়ে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যে আধুনিক গানে কণ্ঠনালীর ক্রিয়া যেন মুক্ত, সাবধান এবং সচেতন কিন্তু মার্গ সঙ্গীতে কণ্ঠনালীর প্রক্রিয়ায় কণ্ঠশক্তি ও সাধন-লব্ধ স্বরের ইচ্ছাকৃত কারিগরী প্রয়োগ যান্ত্রিক শক্তির মতই আজ্ঞাবহ। কাজেই

গায়ন-পদ্ধতিতে যেখানে আধুনিক গান অত্যন্ত কমনীয় এবং সপ্রতিভ, রাগসংগীত সেখানে যেন অপেক্ষাকৃত সবল এবং দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি। এজন্যে অনেক সময়ে আধুনিক রীতিতে চাপ বা গুঞ্জরণ পদ্ধতির গান, এবং কখনো অনবধান কম্পন যুক্ত স্বরপ্রয়োগও চালু হতে দেখা যায়।

(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

কণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তিতে গায়ন পদ্ধতির এ দুইটি স্বাতন্ত্র্য মোটামুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটি মার্গ সঙ্গীতের জন্যে উপযুক্ত এবং অন্যটি আধুনিক বা সে ধরণের গানের জন্যে। একটি কথার উল্লেখ করছি, দেখা যায় ধ্রুপদী অথবা খেয়ালী কণ্ঠে আধুনিক গান আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে না। প্রত্যক্ষ ভাবেই দেখেছি রাগসংগীতের কণ্ঠের প্রয়োগের পরিমণ্ডলটি যেন স্বতন্ত্র। সেজন্যেই কণ্ঠ প্রকাশের দুটো বিভিন্ন রীতি বলেই উল্লেখ করা যাচ্ছে।

আজকের যান্ত্রিক সাহায্য আধুনিক গায়কের কণ্ঠকে কতকটা কৌশলী করে তুলতে চেষ্টা করেছে। বৃহৎ পাথর খণ্ড কেটে যেমন ছোট মূর্তি তৈরী হয়, তেমনি বৃহত্তর কণ্ঠসম্পদকে কৌশল-সমৃদ্ধ করে তাতে প্রয়োগ-কলার স্ফুরণ করতে দেখা যায়। বিশেষ কায়দা ও প্রয়োগ-কলার চর্চায় কখনও কি মুক্তকণ্ঠকে দুর্বল ও শ্লথগতিসম্পন্নও করে তোলে? উদাত্ত কণ্ঠ বর্জন করে যান্ত্রিক শক্তির বশ্যতা স্বীকার করেন অনেকে। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের অমন একটি মন্দ্রস্বরের মূল্যবান বাস্ কণ্ঠ যন্ত্রের জন্যেই কি "টেনরে" পরিণত হয়?—বুঝে দেখা দরকার।

সমৃদ্ধ কণ্ঠও আধুনিক গানে ত্রুটিপূর্ণ প্রাণহীন হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রের অবলম্বনে মানব কণ্ঠস্বরের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে সত্য, কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্পর্শের ব্যাপারে কোন শিল্পেই ফাঁকি চলে না। কণ্ঠের প্রকাশে যে কোন ত্রুটি কানের পর্দায় নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত করে। এজন্যে শুধু মাত্র আধুনিক গানের কণ্ঠবিস্তারে যান্ত্রিক সুবিধে থাকা সত্ত্বেও সত্যিকার প্রকাশ-ভঙ্গির সঙ্গে তাকে ভুল করা উচিত নয়। প্রকাশ-ভঙ্গি মৌলিক শক্তিতেই ধরা দেয়। মুক্ত ও অনায়াস সুকণ্ঠ সহজে প্রাণবন্ত হয়; যা কৃত্রিম এবং সঙ্কোচন-মুখী—সে কণ্ঠ কখনোই সার্থক হয় না। সাময়িক আকর্ষণ সৃষ্টি নিয়ে এ বিষয়ে কোনরূপ মূল্যায়ন করা বৃথা। পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ দ্বারা গায়কের রুচিসঞ্জত কণ্ঠভঙ্গিকে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে কণ্ঠের ব্যবহার ও গায়ন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হল।

এবার একটি স্বতন্ত্র বিষয়। অভিজ্ঞ সুকণ্ঠ এবং সহজ সুরের আধুনিক গানে 'প্রযোজনা'র কোন প্রয়োজন আছে কি? প্রচলিত সুরের গানে সুর প্রয়োজনার কৃতিত্ব কি বিশিষ্ট স্থান পেতে পারে না? ধরা যাক, একটি পল্লী সুরকে কোন আধুনিক গানের রূপ দান করা হল। প্রয়োজকের কৃতিত্ব কি সেখানে থাকা সম্ভব? শিল্পমাত্রেরই সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্যে ব্যক্তিত্বের স্পর্শই তাকে 'বিশেষ' করে। পল্লীগীতি যতক্ষণ পল্লীর মাঠে ঘাটে গীত হয় ততক্ষণ সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, প্রাকৃত বস্তু। ভাষার কাঠামোতে গণ্ডীবদ্ধ করে সীমার মধ্যে বাঁধা মাত্রই সে পল্লীসুরে বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ লাভ করল, তখন সে গান পল্লীগীতি হলেও তাকে শিল্পরূপ দান করবার সুযোগ আসে। সে গানের উচ্চারণ-পদ্ধতি, প্রারম্ভে ও শেষে যন্ত্র-সঙ্গীতের সহযোগিতায় বিশিষ্ট রীতি উদ্ভাবন প্রভৃতি প্রযোজকের ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ প্রমাণ করতে পারে। বহু সার্থক পল্লীগীতি আজ প্রয়োজকের স্পর্শে নতুন রূপ ধারণ করেছে। এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গায়ন-পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং যন্ত্র-সহযোগিতার কাজে সুরকারের কৃতিত্ব যথেষ্ট লক্ষ্য করতে পারা যায়। শুধু এদিক দিয়ে নয়, কণ্ঠের মৌল-প্রকৃতি অনুসারে সুরের রূপায়ণ করতে গিয়ে আধুনিক গান বহুদিকে প্রসারিত হয়ে যায়। কখনো গানের সুর প্রচলিত লোকগীতির রূপে রূপায়িত। অন্যদিকে রাগসঙ্গীতের আঙ্গিকের খানিকটা সংমিশ্রিত করেও আধুনিক গান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং গায়ন-পদ্ধতির গুণেই সে আধুনিকে পরিণত হয়। শুধু গীতির সুর ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে নয়, বিভিন্ন-রীতির গানের আঙ্গিককে স্বীকরণ করে আধুনিক গায়ন-পদ্ধতি যে ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে, তা'ও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

মোটামুটি, সুরকারের দায়িত্ব এবং গায়নপদ্ধতি প্রভৃতির বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করা গেল। আধুনিক গানের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের ফলেই কতকগুলো বিচারসূত্র অনুসন্ধান করছি মাত্র। আরও বিশেষ ভাবে বুঝতে হলে বিস্তৃত বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ ও সুর-সংযোজনের পরীক্ষণ নিরীক্ষণের প্রয়োজন আছে। আধুনিক গান সমসাময়িক প্রয়োজনের সৃষ্টি। সমসাময়িক প্রয়োজনে মোটামুটি এই শতকের তৃতীয় দশকে আধুনিক কালে গীতিরচনা, সুরকারের প্রযোজনা এবং গায়ন-পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক গানের উদ্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের বহু রুচি, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা গানকে বিচিত্র ক্রম বিকাশে পরিচালিত করে এসেছে। আজকের গানে

কৃত্রিমতা-দোষ, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রুচি-বিকার এবং শ্লথ প্রয়োজনারও বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আধুনিককে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্চে। এসব রচনার মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং সে সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনেরও দরকার। শেষে, দিলীপ বাবুর কথার প্রতিধ্বনি করে বলি, লঘু সংগীতে এ যুগ আধুনিক গানের যুগ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পল্লীগীতি

বস্তু-বিচার

১

পল্লীগীতি অর্থে কি বুঝায় ?—এ জিজ্ঞাসা নিয়েই শুরু করা যাক। এ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপনের একটা সঙ্গত কারণও আছে। পল্লীগীতি নামে কোনও স্বতন্ত্র রকমের গান আজকাল চলে কিনা তার নির্ধারণও যেমন দরকার তেমনি অন্যদিকে সত্যিকার পল্লীগীতি নামক গানের শ্রেণীবিভাগ ও তার সীমা নির্ধারণ করাও প্রয়োজন।

প্রচলিত গানের বিশ্লেষণ করে কোন সংজ্ঞায় পৌছান যায় কি ? সাধারণত সুর ও ছন্দে পল্লীগীতির এমন একটা মৌলিক রূপ ধরা পড়ে, যা শুনেই বুঝতে পারা যায় যে হ্যাঁ, এই হচ্চে পল্লীর গানের লক্ষণ। এমন পরিচয়ের জন্য এর সত্যিকার রূপ ও রেখাগুলো চিনে নেয়া সম্ভব, হতে পারে প্রকৃত স্বরূপ বা ভঙ্গির বিশ্লেষণ করেই সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যাবে।

ভঙ্গি বা রীতির দিক থেকে চারটি পন্থা দ্বারা পল্লীগীতির বর্ণনা চলতে পারে :

১। পল্লীতে প্রচলিত সুরে যে গীতি গাওয়া যায় ;

২। পল্লীতে যে গীতি রচিত হয় ও প্রচলিত সুরে গাওয়া হয় ;

৩। পল্লীর প্রচলিত গানের ভঙ্গিতে যে রচনা ও গান চালু রয়েছে ;

৪। পল্লীর ভাবদ্যোতক গীতি বা গান।

পল্লীর বিশেষ কতকগুলো গান সম্বন্ধে উল্লিখিত লক্ষণ সত্য হলেও, এরূপ বর্ণনায় সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। কারণ,

১। পল্লীতে প্রচলিত সুরে বহু গান আছে যাকে পল্লীগীতি বলা যায় না। তাছাড়া পল্লীর অবস্থা দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে প্রচলিত গীতি ও ভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্চে। আজকাল শিল্পরীতি একটি বাঁধা রূপ মাত্র নয়।

২। পল্লীতে রচিত বা পল্লীর সুরে গীত হলেও অনেক গানকে পল্লীগীতি বলে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না, যথা রামপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি।

৩। পল্লীর ভঙ্গিসর্বস্ব গান পল্লীগীতি নাও হতে পারে, যথা, বহু আধুনিক গানের রচনা।

৪। পল্লীর ভাব বলে কোনো প্রকৃতির ভাবের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা যায়, তবে সে ভাবে গড়া গানকে পল্লীগীতি বলে চালাবার ইচ্ছেও অনেকের মধ্যে থাকা সম্ভব। আজকাল এ ধরণের রচনাতেও পল্লীর ভাব ও ব্যবহারিকতার কথা বিবৃত হয়, কিন্তু তাকে পল্লীগীতি বলা যায় না।

রীতি, ভঙ্গি ও সুর বিশ্লেষণের উল্লিখিত কয়েকটি বর্ণনা আরও বিষদ ভাবে বোঝা যেতে পারে। কিন্তু প্রথমেই বলছি এই সকল লক্ষণের সবগুলো একসঙ্গে যুক্ত করলেও পল্লীগীতির বিষয়বস্তু বিচারের প্রয়োজন থেকে যায় সকলের আগে। সেজন্য প্রথমে, সাহিত্যাংশ কি ভাবে সুর প্রয়োগের সহায়ক হয়েছে, চিন্তা করা যেতে পারে। গীতি-অংশ থেকে সাহিত্যাংশ বহুবিস্তৃত। পল্লী-সাহিত্যকে বিষয়বস্তু এবং অঞ্চল অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে পল্লীগীতির সুর ও ছন্দের সম্পর্কে আলোচনা করা শ্রেয়। দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনের নানা ক্রিয়া-কলাপ অবলম্বন করে যে সব সহজ স্বতঃস্ফূর্ত গান পল্লীতে বহু কাল ধরে রচনা করা হয়েছে সেগুলোকেই বিশেষ করে আলোচনার লক্ষ্য বলে ধরা যে.ত পারে। যে সব গান মুখে মুখে রচিত হয়েছে, মুখে মুখেই চালু হয়েছে, সুরও স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়েছে, ছন্দব্যবহার প্রধান হয়েছে, কথার মধ্যে আঞ্চলিক দৈনন্দিন অথবা গ্রামের ভাবগত জীবনের প্রসঙ্গ এসেছে, যে গান রচনা করে পল্লীর কোন ব্যক্তি কোন রচনায় ভাবপ্রচার, ভাবসমৃদ্ধি, ভাবপ্রসার করতে চেষ্টা করেনি—গান স্বাভাবিক ভাবেই রচিত হয়েছে, সে সকল রচনাকেই প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছে।

ধরা যাক বিবাহের গান। বিবাহের যদিও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপের ব্যাপারের সঙ্গে ধর্মাচরণের তেমন কোন নিগূঢ় যোগ নেই, অথবা বিবাহের যে সব আচারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তা নিয়ে আনুষ্ঠানিক সংগীতের প্রচলন সমগ্র উত্তর ভারতে রূপ লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন উপজাতীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গানই হচ্ছে বিবাহের গান। নর ও নারীর সহজ মিলনাত্মক প্রসঙ্গ ও সেই সম্পর্কিত কৌতুকও অতি সহজেই এসে পড়ে সে সব বিবাহের গানে। অনেকস্থলে এর প্রকাশের অবলম্বন দেবদেবী—কৃষ্ণ কিংবা শিবকে ঘরের মানুষ রূপে, এবং রাধা কিংবা গৌরীকে মানবীরূপেই

রূপায়িত করা হয়ে থাকে। ছড়া বিচারে, গ্রাম্য সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বাংলার লোক-সাহিত্যে বিবাহোত্তর সাংসারিক জীবনচিত্র, দাম্পত্য প্রসঙ্গের বহুবিস্তৃতি, ছড়া ও অন্যান্য গানের বিপুল বিস্তৃতি হয়েছে। গৌরীকে নিয়ে দাম্পত্যের বিস্তার বা মায়ের ঘরে তাকে নিয়ে আসা, বাপের শিব নিন্দা, শিবের গুলীখাওয়া-প্রকৃতি (অথচ সে অবস্থায় জামাই সম্ভাষণের প্রস্তুতি, খাওয়া-দাওয়া ও বিদায়), এসব নিয়ে ধর্মানুষ্ঠান অবলম্বনে এক দাম্পত্য-গৃহচিত্র আগমনী-গানে বিচিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রতি বৎসর শরৎকালে ভোরের বাতাস যখন শিশিরসিক্ত এবং রৌদ্রের রং কাঁচা সোনার মত হইয়া আসে, তখন গিরিরানী একদিন তাঁহার সোনার গৌরীকে স্বপ্ন দেখেন, আর বলেন—'আরে শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন?' এ স্বপ্ন গিরিরাজ আমাদের পিতা এবং প্রপিতামহদের সময় হইতে ললিত, বিভাস এবং রামকেলী রাগিণীতে শুনিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই তিনি নূতন করিয়া শোনেন।"

নর ও নারীর সম্পর্ক-বৈচিত্র্য প্রেমগীতিতে নিবদ্ধ। প্রেমগীতিও অনেক স্থলেই রাধা-কৃষ্ণের রূপক অবলম্বন করেও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্ত হয়ে, একেবারে নর ও নারীর জাগতিক সম্পর্ককে পল্লীগীতিতে সোজাসুজি পরিস্ফুট করে। এজন্যে ভাষা ও ভাব বন্ধনমুক্ত হয়ে পল্লীর প্রেমগীতিকে অনেকটা মুক্তি দেয়। পূর্ববাংলার ভাটিয়ালীতে বিচ্ছেদের ও বিরহের করুণতার পরিবেশে নদীমাতৃক বাংলার এক কমনীয় সজল আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমাণ রূপ ধারণ করে, সর্বকালকে জয় করতে সমর্থ হয়। গানের সুরের মধ্যে দিয়ে এই প্রবহমাণতা যেমন তীব্র ও মর্মস্পর্শী ব্যথার রূপে দাঁড়ায়, পাঁচালী সাহিত্যাংশে সেরূপ হয় না।

যুদ্ধ-সম্পর্কিত এবং বীরত্বব্যঞ্জক গানের প্রচলন সমগ্র উত্তর ভারতময়। উড়িষ্যাতে, মহারাষ্ট্রে এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করে কেরেলাতেও রয়েছে। এ বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক স্পর্শ বিশেষ অঞ্চলের লোকের কাছে তাৎপর্যমূলক ব'লে কোন কোন স্থলে এই গানকে গীতিকা বা ballad রূপে বাঁচিয়ে রাখেন।

কর্ম বা দৈনন্দিন জীবনের দায়িত্ব উপলক্ষে মানুষ প্রচুর গান রচনা করে গিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতি অঞ্চলে এ জাতীয় গানের প্রাচুর্য বিস্ময়কর। Occupational folk song বা কর্মসঙ্গীত নিয়ে সুবিস্তৃত আলোচনার উপাদান

হতে পারে। বাংলাদেশের আশেপাশে কর্মধারার মধ্যে সামঞ্জস্য যথেষ্টই আছে। অসমীয়া পল্লীজীবনে তাঁত বোনা একটি বিশেষ কর্ম। আসামের খণ্ড উপজাতীয়দের মধ্যেও এ কাজের সমধিক প্রচলন। আসামে এবং ত্রিপুরী উপজাতীয়দের মধ্যে 'জুম' চাষের গান প্রচলিত। অর্থাৎ অনাবাদী ক্ষেত্রে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করা এবং মাটি অথবা পাহাড় অনুর্বর হলে তাকে ফেলে চলে যাওয়ার রীতি উপজাতিদের মধ্যে বর্তমান। জুম-চাষের রচনা রয়েছে এদের গানের ভাষায়। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জীবনের occupation বা কর্মধারা নর ও নারীর জীবনের ভাব-সম্পর্ক অবলম্বনেই এসে দাঁড়ায়। দাম্পত্য-জীবনই এর মধ্যে বিশেষ।

উপজাতীয়দের মধ্যে এ গান বিশেষ করে উৎসবমূলক এবং বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে সুরে প্রকাশিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৃত্যসম্বলিত। উড়িষ্যায় নৃত্য-সম্বলিত গীতের বহুল প্রচলন। আসামের উপজাতিদের মধ্যে পল্লীগীতি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নৃত্যসম্বলিত, সুর শুধু সঙ্কেত মাত্র। মধ্যভারতের উপজাতিদের মধ্যেও কর্মসংগীতের চেয়ে উৎসবের উপাদানই বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। সাঁওতালদের গান অধিকাংশই পরব উপলক্ষে গান। বাংলাদেশের কৃষি-বিষয়ক গান অন্যান্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—চিঁড়েকোটা, ধানভানা,তাঁতবোনা, প্রভৃতি দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। অন্ধ্রলোকগীতিতে কৃষিবিষয়ক গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্রের নাবিকদের গানের মধ্যে কর্মপ্রবণতার একটি নতুন দিক বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। তামিলে, কৃষিকর্ম পল্লীগীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বর্মই সে গানের প্রধান বিষয়। এজন্যে তামিলের কর্মসংগীত কৃষি, জলসেচ প্রভৃতি বিষয়ক গানে ভরপুর। মালায়ালামেও এ ধরনের গান চালু রয়েছে।

পল্লীগীতিধারার মধ্যে বিশেষ করে পঞ্জাবে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ও নানা কাহিনী পল্লীগীতির বিষয়বস্তু হয়েছে এবং এ সকল গীতি রচনায় দস্যুতাও উপজীব্য হয়েছে। আনুষ্ঠানিক পল্লীগীতিতে (যথা বিবাহের গান, ব্রতগান ইত্যাদি) ধর্মীয় আচরণ গৌণ হয়ে পূর্ববর্ণিত সহজ সম্পর্কই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ভারতের বহু হোলী গানে ধর্মীয় রূপের বাইরে আনন্দবোধক ব্যবহারিক ভাবই প্রকট। অতএব এসব বিভিন্ন প্রকারের আঞ্চলিক পল্লীগীতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত স্বভাবসুলভ সংগীতের ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত সহজ বাস্তবধর্মী পল্লীরচনা। পল্লীরচনাতে এ বাস্তবমুখিতা অত্যন্ত

সহজভাবেই এসে পড়ে। জীবনের ছাপ হুবহু প্রতিফলিত হয়। যা কিছু উপমা বা কাব্যিক রূপ পাওয়া যেতে পারে তাতেও তেমনি সরল এবং প্রাকৃত জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। পল্লীগীতিতে বাস্তবমুখিতা একটি স্বাভাবিক মানসবৃত্তি, জীবনের সহজ প্রকাশ তাতে প্রতিবিম্বিত। ভারতের সর্বত্রই দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দৈব ও কারুণ্য পল্লীগীতিতেই যুগ যুগ ধরে রূপায়িত হয়েছে।

ছেলেঘুমোনো ছড়াতে দেশের বিপর্যয়ের চিত্র এসে প্রতিফলিত হয়েছে। এজন্যে লোকসাহিত্য এমন সহজ চিত্র উপস্থাপিত করেছে, উপমায় এমন নিত্যকার দৃশ্যবস্তুর চিত্ররূপ এনেছে যে জটিলতাহীন ভাবের মধ্যে জীবনের সহজ সাক্ষাৎ মিলে।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিষয়বস্তু জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে। স্বভাবতই পারমার্থিক জগতের নিত্যসত্যতা প্রমাণ করতে বাস্তবমুখী মনকে সঙ্কুচিত করে দেয়। আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মীয় বিষয়বস্তু দেশময় প্রাচীনকাল থেকেই ছড়ানো। মধ্যযুগের মরমিয়া কবিদের রচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র উত্তর ভারতে এই মরমিয়া কবিদের ভজনাবলী অনুশীলনের ফলে সংগীত-জগতে ভজন একটি স্বতন্ত্র আসন পরিগ্রহ করেছে। ধর্মীয় ভাবধারা লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়বস্তুর মতো স্বতঃস্ফূর্ত হলেও এ-গানগুলো বিশেষভাবে যুগে যুগে অনুশীলন করা হয় এবং সে সব গানের সুরও নানাভাবে অনুশীলিত হয় এবং ভাববস্তু ও কাব্যিক কথাবস্তুর মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়গত ভাবধারা প্রকাশিত হয়। পারমার্থিক আবেগ-প্রবণতার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব ও জটিলতা সহজেই এসে পড়ে। মানবমনের কর্তব্যকর্ম স্থান পায় ধর্মীয় গানগুলোতে।

সাধারণ পল্লীগীতিতে "আচার মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়—ধর্মীয় তত্ত্ব ও দর্শন থাকে বহুদূরে। ধর্মীয় গানে কিন্তু আচারের স্থান গৌণ। ধরা যাক কোন ব্রতের গান। ব্রতগানে শুধু আচার, আচরণ নিয়েই গান গড়ে ওঠে, ধর্মীয় মনোভাব অথবা তত্ত্ব সেখানে বিচার্য নয়। বড় জোর একটি উপদেশাত্মক তথ্য, নীতি অথবা আচরণের কথা ওতে থাকা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু একটি বাউল সংগীত জীবন, মৃত্যু, ধর্মাধর্ম, প্রভৃতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দ্বৈত অথবা অদ্বৈতবাদের কথায় পৌঁছে যেতে পারে। এজন্যে লোক-সাহিত্যের আঙ্গিক বিচারে বাউল, মুর্শীদা, মারফতী দেহতত্ত্ব এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত লোক-সাহিত্যের বিষয় বলে ধরা যায় কিনা বিচার্য। উদাহরণ স্বরূপ বাংলার রামপ্রসাদী, শ্যামা-

সংগীতকে এ পর্যায়ভুক্ত বলা যেতে পারে: অনুরূপ পৌরাণিক তত্ত্বমূলক গীতিতে নির্দিষ্ট ধর্মীয় মনোভাব বা sectarianism থাকে তাকে বিশ্লেষণ করলে লোকসাহিত্যের সহজ, মুক্ত রচনার সঙ্গে তুলনা করা যায় না বা একসঙ্গে স্থান দেওয়া যায় না। এই ভাবগুলো ভারতের অনেকাংশেই প্রবহমাণ, সারা দেশময় এই ধর্মীয় পন্থার সংবেদনশীল মানুষ যেমন ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কাব্যগুণের স্ফুরণ হয়েছে যথেষ্ট। এ সকল গানের ধর্মীয় বা sectarian ভাবধারা, বিশিষ্ট cultএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'বাউল' সংগীত এই প্রকৃতির পর্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানকে পল্লীগীতির সেরা নিদর্শনরূপে ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যার চেয়েও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, নিজের গানের সুরে বাউল-ভঙ্গির প্রয়োগ। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের মূল কারণ—এ ধরণের রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত মেজাজ, কাব্যিক রীতি, ভাবগভীরতা ও মরমিয়া-রূপ। বাউলের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সহজ প্রকাশের মধ্যে যেমন আকর্ষণীয় বিষয় মিলে, তেমনি এ-গানের একমাত্র অবলম্বনও 'সংগীত-ক্রিয়া'। এই সংগীত-সত্তার মধ্যে লোক-সাহিত্যের অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গি দেখে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহও করেন প্রচুর। কারণ, বাউলের ভাষা কাব্যিক ও সাংকেতিক। এর সুরের রূপকল্প (প্যাটার্ন) এবং সুরকলি (musical phrase) সহজ পল্লীর সুর বলেই তিনি বেছে নেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারে বাউল সংগীত অন্যান্য সংগীতের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। অন্যান্য বহু কবিগীতিকারও এই ভঙ্গিটি অবলম্বন করেছেন।

একটি বিশিষ্ট মতানুসারে বাউল গান ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাবধারায় প্রতিফলিত এবং গানগুলো গুরুপরম্পরায় বংশানুক্রমে সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা অনুশীলিত হয়ে থাকে, তাই "আত্মিক পরিচয়ে এরা স্বতন্ত্র।"* এ মতের বিশেষ প্রবক্তা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাউল গানের সংগ্রহ ও গবেষণা এবং এ সম্বন্ধে আলোচনাও প্রচুর হয়েছে। এই প্রশ্নটি এখানে সংগীতের দিক থেকেই বিশেষ বিচার্য। বাউলের মূল ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন করলে একথা স্পষ্টই মনে হয় যে বাউল ধর্মীয় গীতি—লোক-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। অতএব, লোক-সংগীতের পর্যায়ভুক্ত কি?

"আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট একটি প্রণালীর নামই বাউল, যাহারা এই প্রণালীর সাধক তাহাদিগকে বাউল বলে।...সাধকদিগের নিকট এই অনুভূতির উপলব্ধি হয়—ইহা ভগবানের সঙ্গে মানবের একটি অবিচ্ছেদ্য ও সুনিবিড় সম্পর্ক-বোধের অনুভূতি; সেই জন্য ইহাতে বলা

হইয়াছে—'ওগো সাঁই, তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।' ভগবানই স্বামী (সাঁই) বা একমাত্র প্রভু; তাঁহার সঙ্গে বাউল অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যস্থতা ব্যতীতই সুনিবিড় মিলনের আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। মূলত এই সম্প্রদায় গুরুবাদী ছিল না। কিন্তু কালক্রমে নাথ ও সুফী ধর্মের প্রভাব বশতঃ ইহাতে গুরুবাদ, এমন কি চৈতন্যধর্মের প্রভাব বশতঃ চৈতন্যবাদও আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ফলে কালক্রমে ইহা সাধনার একটি মিশ্ররূপেই পরিচয় লাভ করিয়াছে। ভগবানকে স্বামীরূপে বা অন্তরের নিবিড়তম সান্নিধ্যে লাভ করিবার যে অনুভূতি, তাহা এক ব্যক্তিসাধনাজাত আধ্যাত্মিক অনুভূতি মাত্র, ইহার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমাজ বা লোকসমাজের সামগ্রিক চৈতন্যের কোন সম্পর্ক নাই; অতএব বৃহত্তর সমাজ জীবনের মধ্য হইতে যে ভাবে লোকসাহিত্যের জন্ম হয়, ইহার সংগীতগুলি সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করে না — বরং ব্যক্তিমনের আধ্যাত্মিক চৈতন্যবোধ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই আধ্যাত্মিক বোধও সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয়, সহজাত প্রবৃত্তির পথে মানবমনে তাহা উদ্বুদ্ধ হয় না। অতএব ইহাও তত্ত্বমূলক রচনারই অন্তর্গত; ইহার মধ্যেও গূঢ়ার্থ (Mysticism) আছে, সেই অর্থ একমাত্র সাধকের নিকটই বোধ্য, সাধারণের নিকট বোধ্য নহে। এই জন্য বাংলার বাউলগানও লোকসাহিত্যের অন্তর্গত মনে না করিয়া বরং আধ্যাত্মিক দর্শনরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন।... মুর্শীদ্যা এবং মারফতী গানও নাথ তত্ত্ব-সংগীতের মত বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই সৃষ্টি, সমাজ-জীবনের সৃষ্টি নহে। মুর্শীদ্যা সম্প্রদায় গুরুবাদী, মুর্শীদ শব্দের অর্থই গুরু বা ভগবানের সঙ্গে যিনি মধ্যস্থতা করিয়া থাকেন—ইহার লক্ষ্য ভগবান, সহায় মুর্শীদ; এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন ইহার নিকট অর্থহীন। অতএব যাহা সাহিত্যের উৎস, তাহাই এখানে উপেক্ষিত হইয়াছে।... তথাপি ইহাদের (তত্ত্বসংগীতগুলির) রূপ লোকসাহিত্যেরই রূপ, সুর লোকসংগীতেরই সুর; বিশেষতঃ এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ববিষয়ক সংগীতের মধ্যে যে সাধারণ মানবিক বিষয়ক সংগীতও আছে, তাহাদের পার্থক্য অনেক সময়ে উপলব্ধি করা কঠিন।...অলৌকিকতা ধর্মবোধের ভিত্তি, কিন্তু বাস্তব জীবন- বোধ সাহিত্যের ভিত্তি; লোকসাহিত্য বাস্তব জীবন-চেতনা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ধর্মবোধ জীবন-বিমুখী।"

সাধারণ মতামত অনুসারে অন্যান্য ধর্মীয় গীতি—যথা শ্যামাসংগীত, কীর্তন অথবা অন্যদিকে মঙ্গলগীতি (চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি) ধর্মীয় বা sectarian রচনা সন্দেহ নেই, কিন্তু পল্লীর ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে এগুলো জড়িত ছিল। সাহিত্য হিসেবে রূপ যা-ই হোক, পল্লীর গানের মধ্যে এগুলো জড়িয়ে আছে এমন ভাবে যে পল্লীগীতির পর্যায় থেকে এগুলোকে বহিষ্কার করা চলে না। ডঃ ভট্টাচার্যও একথা স্বীকার করেন। প্রধান কারণ বোধ হয়, বাউল গানের আধ্যাত্মিকতার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা বাংলা পল্লীবাসীর আছে। "মনের মানুষকে কোথায় পাওয়া", মনের মানুষকে হারিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলো স্বাভাবিক ভাবেই পল্লীবাসীর মনে দুঃখের আবেদনের

মধ্য দিয়েই আগে। বৌদ্ধযুগের শেষ থেকেই বাংলা দেশের লোক বৈরাগীর রূপটির সঙ্গে পরিচিত। এই স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে সহজ ভাবে তত্ত্ব গ্রহণ করবার ক্ষমতা পল্লীবাসীর মধ্যে গজায়। গানগুলোর ভাষার গঠনেও যে লৌকিক আবেদন আছে, তাকে রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তী কালে অনেকেই বিশ্লেষণ করেছেন। এমনি করে বাউল গানের সাহিত্য বিচার যেরূপেই হোক, এগান পল্লীগীতির পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, সংগীতই বাউলের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি। সুরেশ চক্রবর্তী বলেন, "সংগীতের দিক দিয়ে বাউল গান লৌকিক নিয়মের অধীন।" বাউল, দেহতত্ত্ব, মারফতী, মুর্শীদা, শরিয়তি, হকিয়তি এই সবরকমের গান সম্বন্ধেই একথা খাটে। ডঃ ভট্টাচার্য স্থানান্তরে বলেছেন, সম্প্রদায় হিসেবে বাউল গানের ভাগগুলোও স্পষ্ট। একদিকে তত্ত্বের পরিচয় ও অন্যদিকে বাউল গানের তিনটি বিভাগ—(১) মুসলমান বাউল—সাধারণত ফকির সম্প্রদায় (বৈষ্ণব বাউলও এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন), (২) বৈষ্ণব বাউলের দুটো শাখা—প্রথমটি রাঢ়ীয়, (৩) দ্বিতীয়টি নবদ্বীপী। এ থেকেই বোঝা যায় যে বিভিন্ন প্রভাব শুধু কোন একটি বিশেষ তত্ত্বের কেন্দ্রে বাউলকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। সুর ও ছন্দের দিক থেকে এ লক্ষণ আরো স্পষ্ট—অর্থাৎ, গানের ভঙ্গিতেই এই শাখাগুলো একটু আলাদা। পল্লীগীতিতে যে স্বতঃস্ফূর্ত মেজাজটি আছে, সেই মেজাজ গানের সুরে মুখে মুখে রূপান্তরিত হতে হতে বাউল-পরম্পরা বয়ে এসেছে। অর্থাৎ কীর্তন, শ্যামাসংগীত ইত্যাদি ধর্মীয় গানে বৈষ্ণব অথবা শাক্ত ধর্মভাব যেমন ধীরে ধীরে সংগীতের "অনুশীলিত-রূপ" গ্রহণ করে, সুর তাল ও ছন্দের প্রহরীতে বেষ্টিত ও স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, বাউল গান কখনো এরূপ স্বতন্ত্র হতে পারে নি, সারা বাংলাদেশের আখড়াতে আখড়াতে নানা ভাবে ছড়িয়েছে। গানের স্বাভাবিক প্রচারই হয়েছে। এজন্যেই লৌকিক ধর্মসংস্কারের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে বাউলকে পল্লীগীতি হিসেবেই বিচার করা উচিত।

কলারূপ বনাম মৌলিক পল্লীগীতি

এতক্ষণ বিষয়বস্তুর লক্ষণ অনুসারে 'বাউল' গান সম্বন্ধে যে একটি সাহিত্যিক প্রশ্ন এ গানকে পল্লীগীতি থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করবার যুক্তি দেয়—সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। বিষয়বস্তু ও পল্লীসংগীতের আর

একটি বিশেষ সমস্যা—এর কলারূপ (art music) বনাম মৌলিক পল্লীগীতি। আজকাল পল্লীগীতি প্রচারে এ প্রশ্নটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে তা প্রথমেই কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

বর্তমানে প্রচলিত পল্লীগীতি নগরের রূপ লাভ করেছে। নগরে পল্লীগীতি পৌঁছে গেছে বলেই সংরক্ষণের পথ যেমন প্রশস্ত তেমনি পল্লীগীতির প্রধান একটি লক্ষণ—'প্রবহমানতা'ও—বাধা পেয়ে যায়। পল্লীসংগীত মৌখিক রচিত ও প্রচারিত— এটা "লিখিত হইবামাত্র অনমনীয় রূপ লাভ করে, কারণ 'প্রবহমাণতা' পল্লীসংগীতের প্রাণ।" নাগরিক এই রূপ আবিষ্কার করে এবং এর সম্বন্ধে কাজও হয় সব দেশের নগরে। আমাদের দেশে পল্লীসংগীতের ওপর এতকাল সাহিত্যের তুলনায় তেমন কাজ হয় নি। "একে অবহেলার চোখে দেখে আমরা জাতিগত অপরাধ করেছি।...পাশ্চাত্ত্য দেশে লোকসংগীতের রূপ খুঁজতে গেলে নাকি আজকাল সহরে আসতে হয়। আমাদের তেমন অবস্থা নয়" (সুরেশ চক্রবর্তী)। অতএব নগরের দায়িত্বও অনেক,—পল্লীসংগীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রচার এবং সংগীত-প্রসঙ্গেই পল্লীগীতির মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রচারের একটি মাত্র পন্থা—পল্লীগীতির মৌলিক রূপকে সংগীতের আসরে উঠিয়ে নেওয়া। সহজ ও স্বাভাবিক আবেদনের জন্যেই একাজটা বাংলায় সমবেত উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশের আগেই নিষ্পন্ন হয়েছে। এ সম্বন্ধে ভাবনা ও চিন্তার নানান উদ্যোগে নতুন কাজও হয়েছে। বহু রচনা, সংগ্রহ ও প্রকাশ আলোচনাও চলেছে। কিন্তু সংগীত হিসেবে কতকগুলো প্রশ্ন থেকে গেছে। পল্লীগীতির মৌলিক রচনা পল্লীতে যেখানে গাওয়া হয়—সেখানে এর সৌন্দর্য ও মূল্য সমধিক। পল্লী অঞ্চলে, পাহাড়ে নানারূপ কণ্ঠ শুনে এলে বনের পাখীর মিষ্টি আওয়াজের মত কানে বাজবে, পরিবেশটাও চোখে আসবে, সত্যি, কিন্তু তাকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসে কলারূপ দান করতে হলেই তাতে খানিকটা মানসিকতা ও সৌন্দর্য-বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। আধুনিক গানের মতো পল্লীগীতিও একটি art form হয়ে দাঁড়ায়। শুধু কাঁচামাল নিয়ে কোন শিল্পকর্ম হয় না, তেমনি শুধু মৌলিক রচনা ও মৌলিক সুর আমাদের মন পরিতৃপ্ত করে না। মূল পল্লীরচনার সম্পদ নিয়ে, পরীক্ষা করে—ভাষা, রীতি, আচার, অভ্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে সাহিত্যিক, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতত্ত্বের কাজ চলে। কিন্তু মৌলিক পল্লীসংগীতকে, সংগীতরূপে উপস্থাপিত করার কাজটি একটু স্বতন্ত্র রকমের।

উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলো জনপ্রিয় পল্লীগীতি ধরে নেওয়া যেতে পারে। গ্রামোফোন রেকর্ডই হচ্চে আমাদের প্রাথমিক অবলম্বন। পূর্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের বহু পল্লীগীতি আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে সার্থক ভাবে গীত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই মৌলিক রচনা সংগ্রহ, কিছু প্রতিরূপও আছে। এসমস্ত গানের কথা ও সুর মৌলিক বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবুও পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কলা-নৈপুণ্য ও প্রকাশ-ভঙ্গিতেই গান সার্থক হয়ে ওঠে এবং সেজন্য আব্বাসউদ্দীনের গানগুলোতে যে নৈপুণ্য প্রযুক্ত হয়েছে তাকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায় :—

১. সুরকলি নির্বাচন পদ্ধতি,

২. সুর সংযোজনের কৌশল,

৩. বিশিষ্ট কণ্ঠভঙ্গির ব্যবহার, এবং

৪. প্রযোজনা অনুসারে সুরের কারিগরী।

দেখা যায় গানকে এই কলারূপ দান করবার পর এ গানই নির্দিষ্ট পল্লীগীতির রূপ বলে পল্লীতেও চালু হয়েছিল। শ্রীশচীন দেববর্মন পল্লী সংগীতে একটু রূপান্তর ঘটিয়ে গানের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার আরোপ করেছেন। কিছু কিছু মৌলিক গানের সংগ্রহ অবলম্বনে গ্রামোফোন-রেকর্ড ও আকাশবাণীর রেকর্ড মাধ্যমে গিরিন চক্রবর্তী, শ্রীসুরেন চক্রবর্তী, এবং শ্রীশশাঙ্কমোহন সিংহের গানের কথা উল্লেখ করব। শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী পল্লীর গানে যথেষ্ট ব্যক্তিসত্তা আরোপ করে জনপ্রিয় হয়েছেন। শ্রীপুর্ণচন্দ্র দাসের লক্ষ্যও এখন ব্যক্তিগত সংগীত-রূপের ওপর। এগুলো কয়েকটি উদাহরণ মাত্র, যেখানে পল্লীর রূপের ওপরেও নির্বাচনক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ স্থানে মৌলিক লোকসংগীতের রচনা থেকে কিছু দূরে সরে গিয়েও এঁদের গানে লোকসংগীতের কলারূপ পাওয়া যাচ্ছে। নাগরিক সভ্যতা ও যান্ত্রিক জীবনের প্রভাবে ইয়োরোপ, আমেরিকাতেও স্থানে স্থানে এক প্রকার urbanised folk music গড়ে উঠেছে জানা যায়। সঙ্গীত সার্থক হতে হলে সুর সংযোজনা সার্থক হওয়া দরকার। এজন্যে হয়ত কিছুটা নাগরিকতাও কোথাও কোথাও আসতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত সংগীত বিচারে, পল্লীগীতি বলতে বোঝায় পল্লী-প্রচলিত যাবতীয় স্বতঃস্ফূর্ত গানের মৌলিক সংগ্রহ। এ গানের সুর বিকাশে এবং কথা-বস্তুতেও মূল থেকে কোন তারতম্য থাকবে না। গানের গায়ন রীতিও অক্ষুণ্ণ থাকবে। শুধু প্রয়োজন,—গান-সংগ্রহ করে, কাটছাট করে উপযুক্ত সংগীতবোধের সাহায্যে

পরিণত ও সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া। এই রূপদানের অধিকারীও নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ সুরকার।

আজকাল অভিযোগ শোনা যায় যে খাঁটি পল্লীগীতি গাওয়ার রেওয়াজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং নাগরিক পল্লীগীতির সুরে শ্রোতাসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হচ্চে। "সুদূর পল্লী অঞ্চলের ভাটিয়ালীকে তার বিশিষ্ট পরিবেশ থেকে সহরে টেনে এনে সর্বসাধারণের গোচর করে যেমন ভাল কাজই করা হচ্চে, তেমনি একে সহুরে রুচির উপযোগী করে তুলতে গিয়ে এর আসল রূপটিই ঢেকে ফেলা হচ্চে। এ সম্বন্ধে এখনও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।" একথা স্বীকার্য যে পল্লীর প্রতিভাকে যথার্থ ভাবে অবিকৃত রেখে সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করা উচিত। মূল বিষয়বস্তু অবিকৃত ভাবে সংরক্ষণের একটা মূল্য আছে। কারণ, মূল পল্লী অঞ্চলের বহু প্রচলিত বস্তু বর্তমান কলারূপের ভিত্তিভূমি। ভিত্তি ছাড়া কলারূপ-প্রাপ্ত পল্লীগীতি দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু, মনগড়া বস্তুকে এক্ষেত্রে কলারূপ দান করা যেতে পারে না।

কলারূপ দান করা মানে কি sophistication বা পল্লীর সংগীতের আধুনিকতায় রূপান্তরকরণ? নাগরিক সভ্যতার দাবিতে বহু মৌলিক বস্তুর পরিবর্তন সাধিত হচ্চে। বর্তমানে প্রচলিত পল্লীগীতির বিরুদ্ধে এ ধরণের অভিযোগও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আজকের পল্লীগীতি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে শহরের পল্লীগীতিকারের গীতিরূপদান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এসম্বন্ধে সচেতনতা সকলেরই প্রয়োজন। আঞ্চলিক সুর সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয়, বিষয়বস্তু ও ব্যবহার্য শব্দ এবং বাকরীতির ব্যবহারের নিয়মবোধ, প্রয়োগ-রীতি সম্বন্ধে সাবধানতা, পল্লীচিত্রের বোধ (অনাবশ্যক নক্সাকে বাদ দেবার মত অভিজ্ঞতা), উপমা ও উপমানের সংগতি বোধ, প্রকাশভঙ্গির সরলতা রক্ষা—এসবই অনুশীলনের বিষয়। মৌলিক বিষয় ও রূপের পরিবর্তন কখনো কাম্য নয়—শব্দে নয়, সুর ও ছন্দেও নয়। এই অর্থে sophistication একটি গর্হিত দোষ। মৌলিক পল্লীগীতিকে বাঁচিয়ে রাখার একটা দায়িত্ব বোধহয় শিল্পী ও সুরকারের মধ্যে থাকা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে মৌলিকতাকে রক্ষা করতে পারা যায় না বলে আকাশবাণী কটক থেকে 'পল্লী-স্বরগীত' নামে এক ধরণের লোকগীতি-প্রতিরূপ চালু আছে। এসব থেকে মনে হয়, মৌলিক রূপের সংরক্ষণই সমস্যা। পল্লীর মৌলিক গানকে গুছিয়ে, সংগ্রহ করে সার্থক শিল্পের ফ্রেমে ধরে দেওয়াটা সমস্যা নয়।

পল্লীসংগীতের বিকৃতিও যেমন কাম্য নয়; তেমনি অনাবশ্যক সূক্ষ্মতার প্রয়োগও কাম্য নয়। পল্লীতে গীতিকার ও শিল্পী একই ব্যক্তি। উত্তর-পূর্ব ভারতীয়দের উপজাতি, বাংলার কোন কোন পল্লীগীতি, উড়িষ্যা অঞ্চলের উপজাতিদের এবং অন্যান্য ধরণের কোন কোন গান গাইবার সঙ্গে সঙ্গে রচিত হতে থাকে। অনেকস্থলে বাঁধা গান নেই, শুধু একটি পংক্তি হয়ত আছে। অর্থাৎ, গায়কের কল্পনার উপজীব্য শুধুই সুরের সহজ প্রকাশ নয়—"পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয়-কলরবে ধ্বনিত"—সুর ও ছন্দ। "ভাঙা ছন্দ ও অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট" করে তোলা, নিখুঁত সুরজালের অপেক্ষা না রেখে নানান উপাদান (যথা—আনন্দধ্বনি, হর্ষ ও উল্লাসময় চিৎকার, পশুপাখির ডাক, নানারূপ নৃত্যভঙ্গি, আনদ্ধযন্ত্রের [ঢাক, ঢোল ইত্যাদি] অতিশয় ব্যবহার এবং আবর্ত-সৃষ্টি) প্রয়োগ পল্লীসুরে গতি দান করে। নিয়মাধীন আলঙ্কারিকতার বশ্যতা স্বীকার করার প্রশ্ন নেই বলে মুখে মুখে প্রচারিত আঞ্চলিক কথা হয়ত সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে আসে, কিন্তু সুরের কাঠামোটা প্রায় একইরূপ থাকে। কোথাও সুরটার রূপ হয়তো পূর্ণ, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অপূর্ণ ও একঘেয়ে। বিষয়বস্তুতে নির্দিষ্ট ভাবপ্রতীক যুগ যুগ ধরে চালু থাকলেও, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে গানের রূপ যায় বদলে। শিল্পকেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকার উপজাতিদের গ্রামগুলোতে এবং আদিবাসীদের মধ্যে এই পরিবর্তন বেশি লক্ষ্য করা যায়।

সংগৃহীত পল্লীসুর বা গান নিয়ে অন্যান্য সমস্যাও আছে। পল্লীর পরিবেশে যে গান চমৎকার মনে হয়, তা রেকর্ড করে এনে পরীক্ষা করে দেখা যায়—সংগীতাংশ এত দুর্বল যে গবেষণার সামগ্রী হলেও সংগীতরূপে অচল অথচ সংগীতরূপেই পল্লীগীতির প্রধান স্বীকৃতি। বীরভূমের বাউলগান, পুরুলিয়ার করম গান ও ঝুমুর, রাস্তা থেকে বৈরাগীর সুরেলা প্রভাত গীত প্রভৃতি রেকর্ড করে এনে দেখা গেছে, সংগীতরূপে সেগুলো চালাতে হলে কিছু কাটছাঁট এবং পরিমার্জনা দরকার হয়, তা না হলে বেশির ভাগ গানই শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় হয় না। আদিবাসী বা উপজাতীয় এলাকা থেকে গান রেকর্ড করে এনে গান প্রচার করে দেখা গেছে, এগান ওদের ভাল লাগে না। অর্থাৎ বিশেষ পরিবেশেই এরূপ গান সুন্দর। অন্যত্র এ গানের সংগ্রহ সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব বা নৃতত্ত্বের গবেষণায় উপযোগী হয়ে পড়ে। মধ্যভারতের বহুস্থানে আদিবাসীরা সিনেমা সংগীতে প্রভাবিত হচ্ছে, তাদের পুরোনো পল্লীগীতি

যাচ্ছে বদলে। বর্তমান যুগের যান্ত্রিক চাপও এর কারণ। শহরের কল্পনাবিলাসী মন খাটি পল্লীগীতির পুর্ণ পরিচয় পায় না বলেই, সুরকার ও গায়ক মেকী ভঙ্গির উদ্ভাবন করে পল্লীগীতি বলে চালাতে চান। ফলে বহুস্থলে মৌলিক পল্লীগীতি একেবারেই নষ্ট হয়েছে। উত্তর-পুর্ব ভারতের মিজো ও নাগা রাজ্যে পুরোনো মৌলিক সুর ও কথা এখন কেউ খুঁজে পাবে না। বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া পল্লীগীতির যে সব মৌলিক রূপ স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণের কানে শ্রুতিমধুর মনে হয়েছে, সে সব নিয়েই আজকের প্রচলিত গান। এই সব প্রচলিত গানের এক একটি বিশেষ লক্ষণ, বিশেষ ভঙ্গিরূপেই লোকগীতি চর্চার বিষয় হয়েছে। প্রতি শ্রেণীর পল্লীগীতিও সংখ্যায় খুব বেশি সংগ্রহ করা যায় না। কাজেই এসব বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে পল্লীগীতিকে সংগীতের রূপদান, স্বরলিপি প্রকাশ এবং গুছিয়ে-গাছিয়ে তাকে সুন্দর করে বিভিন্ন পরিবেশে পরিবেষণ সমর্থন করা যায়। কিন্তু এটা সম্ভব হয় কেন? কারণ, পল্লীগীতি "স্বয়ংসম্পূর্ণ—যে পরিবেশে যেমন ভাবে এই গান গীত হয়ে থাকে সেখানেই তার পূর্ণ রূপটি পুরোপুরি প্রকাশিত হয়,—সেই বিশেষ প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, নিজেদের হাতে তৈরি একতারা দোতারা জাতীয় দু একটি যন্ত্র, এমন কি গায়কদের বাকভঙ্গীর সেই অসাধু উচ্চারণ—এসব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এলে পল্লীসংগীতের অঙ্গহানি হতে বাধ্য; এমনকি সভ্য জগতের বিচিত্র মধুরধ্বনি বিশিষ্ট যন্ত্র সহযোগে গীত হলেও তার এই অভাব পুরণ কিছুতেই হয় না।" (সুরেশ চক্রবর্তী) এই অঙ্গগুলো বজায় রেখে স্বয়ংসম্পূর্ণ গানকে নির্বাচন করে ও কাটছাঁট করে তার অংশবিশেষ সংগীতরূপে সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না।

পল্লীসুর

বাংলা পল্লীগীতির বিভিন্ন রূপের পার্থক্য ও জটিলতা দেখে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বলেছেন, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগের অনেক সমস্যা আছে। সংগীত-প্রকৃতির দিক থেকে দুটো পল্লীগীতিকে বড় ভাগে ভাগ করা যায়—(১) বাহির জীবনের গান (Outdoor Songs) এবং (২) ঘরোয়া গান (Indoor Songs)। ভাটিয়ালী বাহিরের গান—একটি প্রধান শ্রেণী। এর সুরের সঙ্গে অন্যান্য বহু গানের সুরের সামঞ্জস্যই এর প্রধান যুক্তি। "ব্যক্তিগত ভাবে আমি

মনে করি ভাটিয়ালী আরো অন্যান্য বহু রকমের পল্লীগীতির ভিত্তিস্বরূপ। উৎসবের গান, আখ্যান-মূলক গান অথবা জারি গান, মেয়েদের গান এমনকি সারি-গানের সঙ্গেও এই সম্পর্ক।" বাউল গান বিশেষ সুরে বিভিন্ন রকমের ছন্দে গীত একক কণ্ঠের গান। সারিগান ভাটিয়ালী, এমনকি বাউলের সঙ্গেও সামঞ্জস্যবোধক—ঠাইছ, আরম্ভ, শেষ, হারজিৎ প্রভৃতি নিয়ে রচনা চলে। ভাওয়াইয়া কোচবিহারের চাষীদের মেঠো গান, সুরের দিক থেকে ভাটিয়ালীর সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে, ছন্দপ্রয়োগে দৃঢ়বদ্ধ। গম্ভীরা মালদহের শিবের গীত—সুরের দিক থেকে প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যবর্তী পন্থা অনুসারী। জারি কারবালা-কাহিনী—পূর্ববঙ্গের মুসলমানের প্রাণবন্ত সংগীত—বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরূপে গাওয়া হয়। ঝুমুর গানের বৈশিষ্ট্য—একক সুরের মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন সূচনা, বোধহয় সাঁওতালী প্রভাব [আকাশবাণী ১৯৫৯, ২৫শে অক্টোবর সংখ্যা থেকে অনূদিত]। এবারে সংগীত বিকাশের লক্ষণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা যাক।

(১) কয়েকটি প্রকৃতির পল্লীগীতিতে সংগীতাংশের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে, অর্থাৎ গানের মধ্যে প্রায় ছ' সাতটি সুরেরই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় এবং একটি আধুনিক গানের যে কয়েকটি স্তর (আস্থায়ী, অন্তরা ইত্যাদি) থাকা সম্ভব, তাও অনেকটাই দেখা যায়। তাছাড়া গানের মধ্যে রাগলক্ষণও স্পষ্ট করে চিনে নেওয়া যায়। যথা—ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, সারি, বাউল, দেহতত্ত্ব ও কিছু কিছু মেয়েলী গান। এসব গানে কোন কোন ক্ষেত্রে নানান অনুশীলিত সংগীতের প্রভাবও লক্ষ্য করা।

(২) ছড়া, পাঁচালী, ব্রত প্রভৃতি ধরণের কতকগুলো গানে থাকে একঘেয়ে সুরের বৈচিত্র্যহীন প্রকাশ। তাতে সংগীতাংশ বিকাশের সুবিধে নেই।

(৩) কতকগুলো বিশেষ আঞ্চলিক গানের সংগীত-রূপ নানা কারণে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা চেনা যায়, কিন্তু সাধারণ্যে তেমন ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়নি—যথা, গম্ভীরা, করমগান, ঝুমুর, ভাদু ইত্যাদি। এগুলোর সুরও অপেক্ষাকৃত সমসাময়িক প্রভাবের লক্ষণযুক্ত। এই শ্রেণীর কোন কোন গানের সুর একেবারে কাঠামোতে বাঁধা।

(৪) আদিবাসী ও উপজাতীয় পল্লীগীতি। অনেকস্থলে সংগীতাংশ স্পষ্ট নয়। দ্বিস্বর, ত্রিস্বর এমনকি পাঁচস্বর পর্যন্ত ব্যবহার চলে, যাকে Pentatonic scale বলা যায়। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবাসীদের গানে এই রূপই

প্রধান। সাঁওতালী গানের সংগীতাংশ স্পষ্ট, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সামান্য ছকে বাঁধা হলেও রেশটানা সুরের একটি বিশিষ্ট রং ও রূপ লক্ষ্য করা যায়।

এই চার শ্রেণীর গানের মধ্যে বিশেষ করে প্রথম শ্রেণীর প্রচার, প্রসার ও প্রযোজনা অব্যাহত। লোকের কানে সুরের পরিচয় হয়েছে, শ্রোতা অধিকাংশ সুরের রূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাই এ-গানের রূপান্তরও চলে, নতুন রচনাও চলে, কিছু কিছু অনুকরণও হয়। অর্থাৎ, সংগীতরূপ বলতে এসব গানই আসরে পরিবেষিত হয়। দ্বিতীয় ধরণের গানের মধ্যে কিছু কিছু সম্প্রদায়গত বা Sectarian রূপও পড়ে এবং সুর, ভঙ্গি ও উচ্চারণ-পদ্ধতির সম্যক বোধ না হলে এগান গাওয়া চলে না। অন্যান্যগুলো যথাযথ অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ হতে পারে। ভাষা-রূপের সংগীতের মৌলিক ভঙ্গিটাই এর সত্তা, কলা-নৈপুণ্যের প্রয়োগের সুযোগ অতি স্বল্প। প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর গান ছাড়া অধিকাংশই "আবৃত্তিধর্মী, সুরও নিতান্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত।" সুরেশ চক্রবর্তী বলেছেন, "পল্লীসংগীত মূলে পাঁচস্বরিক ছিল কিনা তা বলবার উপায় নেই। আজ কেবল এই কথাই বলব, বাংলার লোকগীতি অন্যান্য যাবতীয় লোকসংগীত থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল নিজের বিশিষ্ট রূপভঙ্গিতে নয়, সাত স্বরের বিশেষ ঐশ্বর্য নিয়েও। আর কেবল সুরের দিক দিয়ে নয়, ছন্দের দিক দিয়েও এর মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে। এর পেছনে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাগসংগীত বা শিল্পসংগীত সম্বন্ধে কিছুটা চেতনা জাগ্রত রয়েছে বলেই সুরে ও তালে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।"

রেকর্ড ও চলচ্চিত্র মারফতে ভাটিয়ালীর পরিচয় প্রকৃত পরিচয় নয়, একথা সকলেই বলেছেন। ভাটিয়ালী এক মাল্লাই গান। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ :

(১) ভাটিয়ালী গায় একজনে. শোনেও বোধহয় একজনে। হাতে কোন কাজ নেই, পাল তুলে দিয়ে হাল ধ'রেছে নৌকোর মাঝি। এই অবসরটুকু ভরে তুলবার জন্যে সে গান ধরেছে।... নদীর জলের সঙ্গে, উন্মুক্ত প্রান্তরের সঙ্গে এর সুর বাঁধা......পরকে শোনাবার তাগিদ নেই। তাড়াহুড়োর কোনও প্রয়োজন নেই—তাই তার কণ্ঠ থেকে যে গান বেরোয়, সে গান ছন্দের বন্ধনে সুরকে চঞ্চল করে তোলে না। সুর তার স্বচ্ছন্দগতিতে মাঝির মনের কথার দু'একটিকে একেকবারে সঙ্গে নিয়ে লম্বা একটানা পথে ঢেউএর সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তে পাড়ি জমায়। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে ভাটিয়ালীর অন্তরঙ্গতা এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার।—নিরাভরণ ছন্দোবন্ধহীন কণ্ঠস্বর প্রকৃতি নিজের হাতে পূর্ণ করে তোলে। শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে যে এই অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাকে সুন্দরতর করবার ক্ষমতা কোন যন্ত্রের নেই।

(২) এতে দু'তিনটি শব্দ নিয়ে এক একটি শব্দগুচ্ছ এক একবারে উচ্চারিত হয়, দ্বিতীয়তঃ থাকে এই উচ্চারণের পরেই লম্বা একটানা বা আন্দোলন-যুক্ত সুরের কাজ। সাধারণতঃ দেখা যাবে, শব্দগুচ্ছের শেষ বর্ণটি যে স্বরে গিয়ে দাঁড়ায় সে স্বরটিই দীর্ঘ হয়ে উঠে। এই স্বরের দৈর্ঘ্য কতটুকু হ'বে তার কোন বাঁধা ধরা মাপকাঠি নেই, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে গায়কের নিজস্ব মেজাজ ও রুচিবোধের উপর।

(৩) স্বর প্রয়োগের দিক দিয়ে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়—আরম্ভেই ভাটিয়ালী সাধারণতঃ চড়ার সুরের দিকে চলে যায় এবং তারপরেই ধীরে ধীরে কখনো বা দ্রুতবেগে নেমে আসে খাদের দিকে। সেইখানে ক্রমেই গান যেন বিশ্রাম লাভ করে। এ যেন কোন প্রাণের কোন গভীর কথাকে দিগদিগন্তে শুনিয়ে দিয়ে আবার নিজের প্রাণের গভীর খাদেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

(৪) এছাড়া ভাটিয়ালীতে সাত স্বরের প্রয়োগও হয়ই, অনেক সময়ে এর গানের গতি দুই সপ্তক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

একাধিক স্থানে সুরেশবাবু বলেছেন, ভাটিয়ালীর সঙ্গে টপ্পা গীতরীতির বেশ মিল আছে। ইনি বলেছেন, "এখানে হিন্দুস্থানী টপ্পা নয়, বাংলা টপ্পার কথাই বলা হচ্ছে।" বাংলা দেশের টপ্পার প্রকৃতি তার স্বভাবগত গিটকারি-রীতিতে নিবদ্ধ। এ গিটকারি হিন্দুস্থানী-রীতির টপ্পার দ্রুত জমজমা তানের মত নয়, "তানগুলি মন্থর।" এই টপ্পা ভঙ্গিটি কোন কোন গানে লক্ষ্য করা যায় শুধু। ভাটিয়ালীতে দীর্ঘ টানা সুরে গাইবার জন্মে গিটকারির স্থান সহজেই মিলে। অর্থাৎ কথাগুলো একসঙ্গে উচ্চারণ করে পরে টানা সুরের স্থলে 'জমজমা' তানের মত করে গিটকারির দানা ব্যবহার। এ পর্যন্ত মানতে অসুবিধা নেই।

কিন্তু সুরেশবাবু আরো একটু এগিয়ে এসে বলছেন, "যদি বলা যায়, বাংলা টপ্পায় ভাটিয়ালীর প্রভাব আছে, তা হলে বোধহয় মিথ্যা কথা বলা হবে না। বাংলার নিজস্ব সংগীত-চেতনা সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে বলেই টপ্পার মধ্যে এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে মনে করতে পারি। এই টপ্পা বাংলার কেবল পল্লীসংগীত নয়, গত শতকের নানান প্রকারের গীত থেকে আরম্ভ করে এযুগের রবীন্দ্রসংগীত পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে।" সুরেশবাবুর এই পরের কল্পনাটি অতিশয়োক্তি। টপ্পা গানে ভাটিয়ালীর প্রভাব থাকা সম্ভব নয়। কারণ, ভাটিয়ালী প্রধানত শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ঢাকার পুর্বাঞ্চল ত্রিপুরা—বিশেষ করে মেঘনা নদী ও এদিকে ব্রহ্মপুত্র ও শীতললক্ষা এলাকার গান। যে কালে টপ্পা প্রচারিত হয়েছে সে সময়ে এ গান সবার অলক্ষ্যে ছিল। অন্যান্য মূল্যবান উক্তিগুলোর সঙ্গে এই observation বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

ভাটিয়ালীর সুর-বিচারে রাগ কঁসৌলী-ঝিঁঝিঁটের রূপের প্রয়োগ স্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করেছেন ইনি। এই ঝিঁঝিঁটের সুরে খাদের ধৈবৎ পর্যন্ত এসে গানের চরণ থেমে দাঁড়িয়ে যায়। "পল্লীগীতির ঝিঁঝিঁটের বা এই কঁসৌলী-ঝিঁঝিঁটের স্বররূপ এই রকম—স র ম I প ম গ র স ণ্ ধ্ I ধ্ স স র গ, র গ স I এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না,—আমাদের মনে হয়, এই শেষোক্ত প্রকারের ঝিঁঝিঁটের মূল রয়েছে এই পল্লী সংগীতের মধ্যেই।" সুরেশ বাবুর এই মতের পেছনে যথেষ্ট নিরীক্ষণ আছে সন্দেহ নেই। হয়ত কিছু কিছু গানের মূলেই এই ঝিঁঝিঁটের সন্ধান করা যায়। কিন্তু ভাটিয়ালী গানের রূপ অধিকাংশ জায়গায় অন্যভাবে বিশ্লেষণ করা চলে। অনেক সময়েই লক্ষ্য করা যায় যে যাকে ধ্ স। স র গ, র গ স I অথবা প ম গ র। স ণ্ ধ্ I বলা হয়েছে সেটাকে খরজ পরিবর্তিত করে বলা যায় গ প I প ধ ন। ধ ন প I অথবা প্রথমাংশে (স´ র´) স´ ন ধ প ম গ I অর্থাৎ সুরটা দাঁড়াচ্ছে "গান্ধারে" —ধৈবৎ গান্ধারে পরিণত। ভাটিয়ালীর প্রথম চড়া গলার চিৎকারটা আরম্ভ হচ্ছে স´ র´ গ´ ম´, এমনকি প´ ছুঁয়ে আসা পর্যন্ত টেনে যাচ্ছে। বহু দূরের নেয়ে দীর্ঘায়িত চিৎকার করে 'মাঝি', 'বন্ধু', 'রে', 'গো' প্রভৃতি উচ্চারণ করে আর্তনাদের মত তার-স্বরে দুঃখ জানায়। বহু বারই এ গান শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, সত্যি, চড়ার গান্ধার মধ্যম থেকে আরম্ভ করে মুদারার গান্ধারে এসে গান দাঁড়াচ্ছে—যাকে অন্যরূপে খরজ বদলে ধ্ বলা যায়। গা-স্বরটি প্রধান না ধরলে তারস্বরের স´ র´ গ´ ম´ পর্যন্ত গতি বিশ্লেষণ করা যায় না। এ অর্থে গানটি হয় বিলাবল ঠাটের অঙ্গ, পুরোন বাংলা দেশীয় বেহাগের (কড়ি মধ্যম বর্জিত) স্বাভাবিক রূপ ফুটে ওঠা সুর। স্থানান্তরে 'খ্যাপা' বাউল বা 'ফিকির চাঁদি' বাউল সুর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুরেশবাবু বলেছেন "কঁসৌলী ঝিঁঝিঁট যা ভাটিয়ালীতে খুব বেশি প্রচলিত তার রূপটি হচ্ছে স র ম, প ম গ, ধ্ স ণ্ ধ, ধ্ স স র গ, র গ স I এর সঙ্গে ফিকির চাঁদির তুলনা করা যাক :—

স, স র, গ প, ধ ন, ধ স´ স´, ন ধ প, প ম গ, গ র, র গ ম, গ র স I

খুব সূক্ষ্ম বিচার না করেও বলা চলে এতে বিলাবল পর্যায়ের রাগের প্রভাবই বেশি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখছি যে, বিলাবল আমাদের যাবতীয় দেবস্তুতি ও তত্ত্বমূলক সংগীতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী সুর।"

আমার বিশ্লেষণে বিলাবল ঠাটের রাগের লক্ষণ ভাটিয়ালীতেও আছে।

পার্থক্যের মধ্যে ভাটিয়ালী অনেকটাই উত্তরাঙ্গ প্রকৃতির। রেকর্ডের গান শুনে এর রূপ নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। বাউল গানের প্রকৃতিতে নৃত্যের প্রাধান্য আছে, নৃত্যের সঙ্গে গানের উত্তরাঙ্গ রূপ হওয়া স্বাভাবিক নয়। তাই উত্তরাঙ্গ খাম্বাজ প্রকৃতির না হয়ে অনেকটা বিলাবল প্রকৃতির হয়ে দাঁড়ায়। একাধিক সমালোচক ভাটিয়ালীকে নৈরাশ্য ও নির্জনতা বা বিষাদ এবং বিরহবেদনার প্রকাশক বলে বর্ণনা করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য "বাংলা লোক-সংগীত" নামক মূল্যবান সংযোজনার ভূমিকায় অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনার সঙ্গে ভাটিয়ালী সম্বন্ধে বলেছেন, "ভাটিয়ালী বর্ণনাত্মক নয় ভাবাত্মক, তাই চড়া সুরের দীর্ঘায়িত উচ্চারণে এ-গানের রূপ স্পষ্ট।" চড়া সুরটাই যে খাদের ধা পর্যন্ত নেমে আসে—একথা স্বীকার করতে পারছি না। আরো একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। গানের সুরপ্রয়োগের রীতি অনুসারে "বাউল, ভাটিয়ালী এবং দেহতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় লোক-সংগীতে—রাগসংগীতের অস্থায়ী ও অন্তরার মতো দুটি ভাগই পাই" (সুরেশ চক্রবর্তী)। শুধু দুটো ভাগের সুর অবলম্বন করে অনেক সময়েই রূপ বর্ণনা করা মুস্কিল, বিশেষ করে রাগরূপের সামঞ্জস্যের কথা জোর করে বলা যায় না।

রাগ-রূপের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা যায় বিলাবল ঠাটের সুর শুধু বাংলাদেশে নয়, উত্তর ভারত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি সর্বত্রই ছড়ানো। কোথাও মিশ্রবেহাগ রীতি, কোথাও মিশ্রখাম্বাজ, এবং অন্যত্র ঝিঁঝিঁট, মাণ্ড, বিহারী ও পাহাড়ী জাতীয় সুরের প্রচলন দেখা যায়। রাগের সামঞ্জস্য দেখা গেলেও সম্পূর্ণ বিকাশ কদাচিৎ পাওয়া যায় বলেই পল্লীগীতির অসমাপ্ত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে। বিচিত্র রাগরূপ লক্ষ্য করে পল্লীগীতির গঠনরীতিও বহু দিক থেকে আলোচনা করা যায়। এবিষয়ে সুরেশবাবুর মতামত এইরূপ :

আমরা মোটামুটি চারভাগে ভাগ করতে পারি

(১) যে সব সুর স র ম প এমনি করে আরোহণ করে

(২) যেগুলো স গ ম প করে

(৩) যেগুলো স র গ প করে, ও

(৪) যে সব সুর স র গ ম প করে।

এই চারটি প্রকারের প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে 'গ' বাদ, দ্বিতীয়টিতে 'র' বাদ, তৃতীয়ে 'ম' বাদ ও শেষটিতে পূর্বাঙ্গের কোন স্বর আরোহণই বাদ যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটি বিশেষ করে লক্ষ্য করতে বলছি এইজন্যে যে, লোকসংগীতে উপরি-উক্ত নিয়মগুলো এমন কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে যা কেবল রাগ-সংগীতেই দেখা যায়।

"গ্রহ অংশ ন্যাস" বলে রাগসংগীতের একটা অতি প্রাচীন সূত্রের......অনুসারে, কোন রাগের প্রথম সূচনা কোনও একটি বিশেষ স্বরে এবং বিশেষ কতকগুলো স্বরসন্দর্ভে তার রূপ প্রকাশিত হ'তে হ'তে একটি নির্দিষ্ট স্বরে এসে দাঁড়ালে তার পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হয়।—আমার মনে হয়, এই সূত্রটি পল্লীসংগীতের ক্ষেত্রে অতি সুন্দর ভাবে প্রযোজ্য।—ষড়জ থেকে গান আরম্ভ না করলে শিল্পের দিক দিয়ে বিকৃতি ঘটবে।—ইত্যাদি

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে "গ্রহ-অংশ-ন্যাসের" দৃঢ় ফর্মুলার দিক দিয়ে বিচার না করে পল্লীগীতিকে আরো সরলভাবে বোঝা যেতে পারে :

প্রথমে, ষড়জ-কেন্দ্রিক বা সা-স্বরকে একতারায় দোতারায় সুর করে বহু পল্লীগীতি গাওয়া হয়। সেগুলোতে নানান রূপ পাওয়া যেতে পারে। কোন বিশিষ্ট রাগরীতিতে এসব গান চালু নয়, এবং সুরের রীতিগুলো স্বাভাবিক ও স্বতন্ত্রভাবেই রূপায়িত। কিছু কিছু বাইরের প্রভাবও আছে, রাগের অংশ তা থেকে হয়ত চিনে নেওয়া যায়। সুরগুলো সাধারণত তিন চারটি শ্রেণীর হয়।

(ক) বিলাবল ঠাটের রূপে (যা সুরেশবাবু লক্ষ্য করেছেন)। অসংখ্য ভজন গানে বিলাবলের সঙ্গে খাম্বাজ জাতীয় সুরের মিশ্রণ দেখা যায়। মারাঠী কায়দায় মাণ্ড সুরে বাঁধা "ম্হণে চাকর রাখো জী" (মীরা-ভজন) সুরটি মনে করা যেতে পারে। বাউলে এরূপ সুর অসংখ্য।

(খ) কাফি ভীমপলশ্রীর আদল নিয়ে সুর বিকাশ,

(গ) ভৈরবীর রূপে (অসংখ্য বাউল গান শোনা যায়),

(ঘ) কালেংড়ার রূপে (ভৈরব ঠাটে প্রভাতী গান একটি উদাহরণ),

"বাংলার লোকসংগীত" নামক স্বরলিপি সংগ্রহে বাউলের যে ১৩টি গানের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে তাতে সুরের কাঠামোতে ব্যাপকভাবে বেহাগ, খাম্বাজ, কাফি, আসাবরীর মতো স্বতন্ত্র রূপের ছায়া মিলে। এটাই একটা স্পষ্ট উদাহরণ।

দ্বিতীয়ে, গান্ধার-কেন্দ্রিক—অর্থাৎ, একতারার সুর অনেকটা পঞ্চমে বাঁধা হয়ে যায় আর গানের তুক এসে থামে গান্ধারে (যাকে অনেক সময়ে ষড়জ পরিবর্তিত নৃত্যশীল মন্দ্রস্বরের কণ্ঠে ধৈবত মনে হতে পারে)। গান আরম্ভ হয় চড়া সুর থেকে, প্রায়শই ষড়জ থেকে যায় অপ্রধান। গান উত্তরাঙ্গ প্রধান এবং ভাটিয়ালীর পক্ষে এ রীতি স্বাভাবিক। গানের সুরের রূপ—বেহাগ। খাম্বাজ অথবা উত্তরাঙ্গ বিলাবল ঠাটের নানান রাগের অংশের সংগে তুলনীয়। তারস্বরের র্স র্র র্গ র্ম-ও এখানে আসে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দোতারার সুরের সাজ আলোচনা করলেও রূপটি আরো পরিষ্কার বোঝা যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কঁসৌলী-ঝিঁঝিঁটের লক্ষণ যে কিছু কিছু গানে (বিশেষ করে কীর্তনেও) অত্যন্ত প্রধান একথা স্বীকৃত।

ছন্দ ও গায়ন পদ্ধতি

লোকসংগীতের বিশেষ বৈচিত্র্য রয়েছে 'ছন্দে।' অনেকস্থলে ছন্দই শুধু গীতের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। ছন্দের বহু বিচিত্র গতি পল্লীগীতিকে বৈচিত্র্য দান করে। সুরের একঘেয়েমির মুক্তি হয় ছন্দে। ছন্দের বৈচিত্র্য জীবনে চলমান রূপ, বিচিত্র গতিপ্রবণতা এনে দেয়, দেহের মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি করে। সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অভিজ্ঞতা, মনন এবং চিন্তা শক্তির দরকার, কিন্তু পল্লীগীতিকারের সে সব দরকার নেই। শুধু সহজ কথা ও সহজ অভিজ্ঞতাকে ছন্দোবদ্ধ করলেই ওতে এক বিশেষ তাৎপর্যের অনুসন্ধান চলতে পারে। একটানা সুরের নৃত্যে সর্বত্রই ত্রৈমাত্রিক ছন্দের নৃত্যচটুল প্রয়োগ, চার মাত্রার ছন্দের আধা-ভঙ্গির প্রয়োগ, প্রাচীন খেমটা ও আড়খেমটার ব্যবহার—এর মধ্যে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। মোটামুটি এই সব গানে মাত্রা-গুলোকে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ অথবা এর যে কোন মাত্রায় যতি সৃষ্টি করে ছন্দের রকমারী প্রয়োগ হতে পারে। দ্রুত পাঁচ মাত্রা অথবা সাত মাত্রার ছন্দেও পল্লীগীতি আজকাল শোনা যায়। বাউল গানে পাঁচ মাত্রার ছন্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সাত মাত্রার অবলম্বন ওড়িয়া গানে প্রচুর। মনে হয় এসকলই মৃদঙ্গের অধিক ব্যবহারের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লীগীতিরও বৈচিত্র্যের আর একটি বিশেষ লক্ষণ বিশেষ মাত্রায় যতি বা উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত মাত্রায় ঝোঁক দ্বারা ছন্দের সৃষ্টি। ছন্দের প্রয়োজনে এক ধরণের স্বরাঘাত পল্লীগীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ —এই চারটি মাত্রা ছন্দে উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি নিয়মিতভাবে ১ বা ৫, অথবা ৪ বা ৮ বার বারই অনুচ্চারিত করা যায় বা শব্দটিকে বাদ দিয়ে ছন্দটাকে রক্ষা করা হয়—তাতে এই চতুর্মাত্রিক ছন্দেই বিচিত্র ভঙ্গি হয়। তেমনি গান গাইবার সময়ে প্রতিবারে ১।৩।৫।৭ মাত্রাগুলোকে যদি ধাক্কা (স্বরাঘাত) দিয়ে উচ্চারণ করা যায় তা হলে অন্য রকমের ফল পাওয়া যাবে।

তেমনি তিনমাত্রার ছন্দ। পল্লীগীতিতে ছন্দের এই ধরণের রকমারী প্রয়োগ গানকে তালের দ্বারাই বিশেষ করে তোলে। ছন্দের সম্পদটা আদিমতম উপাদান। কথকতা, মনসার ভাসান, উপাখ্যান জাতীয় লোকগাথা ছন্দেই সাধারণের মধ্যে গৃহীত হয়। সুরেশ চক্রবর্তী বলেন—পল্লীগীতির তাল সাধারণত সরল হলেও কোন কোন রচয়িতার জটিল তাল ব্যবহারের ঝোঁক আছে। এটা কীর্তন গায়কদের প্রভাবও মনে হতে পারে। "ফলে দাদরা, কাশ্মীরি খেমটা, খয়রা ইত্যাদি সোজা তালের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই শোনা যায় লোফা, রূপক বা তেওট ইত্যাদি কঠিন তালের গান।"

ছন্দবর্জিত একটানা নদী-বাংলায় গানের যে ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো প্রধানতঃ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের গান, কিন্তু বিষয়বস্তু দুঃখ, দুর্দৈব, বিরহ, ব্যথা ও বেদনায় ভরপুর। নদী-বাংলার আকাশে বাতাসে যে একাকীত্ব আছে বিষাদের মধ্যে তার রূপ সহজ ভাবে প্রকাশিত। ভাটিয়ালীতে সেই করুণতা ও বিষাদ আশ্চর্য রূপ লাভ করেছে। দৈনন্দিন জীবনের ইচ্ছা, অভিরুচি, প্রোষিতভর্তৃকার আর্তবাণী, নারীদেহের অলঙ্কারের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের পরিতৃপ্তি, শস্যক্ষেত্রের খবর প্রভৃতি ভাটিয়ালীর আবৃত্তিমূলক সুরের মধ্যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার রূপে প্রকাশিত। এই গানগুলোই কখনো কখনো সারি গানে ব্যবহার হয়, তখন প্রয়োজন অনুসারে তাতে ছন্দ ও গতি যোগ হয়ে যায়। তাতে এসে যুক্ত হয় চিৎকার ও তালের বিচিত্র ঠোকাঠুকি। পানসী অথবা লম্বাধরণের নৌকো চলেছে একের সঙ্গে অপরে পাল্লা দিয়ে, স্বভাবত নদী-মাতৃক বাংলায় এ গানের উপাদান আলাদা। ভাটিয়ালীতে যেমন বিষাদের করুণতা, এ গানের রূপ তেমনি "উল্লাস"। দুটো একই ভৌগোলিক পরিবেশের সৃষ্টি। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, সারিও বাইরের গান, ভাটিয়ালীর প্রভাবে প্রভাবিত মাঝির গান। সুরের রূপ প্রায় একই, কিন্তু তবু দুইএ কী করে পার্থক্য সম্ভব হলো?—এমন ব্যাপার ঘটেছে পরিবেশের তফাতের জন্যেই। সারি গান বহুজনের সম্মিলিত কণ্ঠ সংগীত এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত বলেই এতে দ্রুত গতির চাল। সারিগান action এর মধ্যে গেয়—সকলে একসঙ্গে, তালে তাল চালিয়ে, দলের সেরা মাঝির সঙ্গে গাওয়া গান। এদিক থেকে কতকটা আবৃত্তিমূলক। সুরেশবাবু একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, "ছন্দকে রক্ষা করবার জন্যে ছড়ার মতন কি যেন আবৃত্তি করা হচ্চে। এই ছড়াই বোধ হয় সারি বা তার অনুরূপ গানের প্রাথমিক ভিত্তি।" বোধ হয়

আবৃত্তির রূপটিকেই ইনি ছড়া বলেছেন, কিন্তু ছড়া স্বতন্ত্র বস্তু। 'সারি' সম্বন্ধে তথ্য বিশ্লেষণ করে যে কয়েকটি মূল সূত্র ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য "বাংলার লোকসংগীত" গ্রন্থের স্বরলিপির ভূমিকায় দিয়েছেন তাকে সংক্ষেপে দেওয়া গেল :—

(১) সারি নৌকা চালনার গান বা এক ধরণের কর্মসংগীত,

(২) এ গানের প্রকৃতি 'যৌথ"

(৩) পূর্ববঙ্গের সারি গান বাইছের সঙ্গে সম্পর্কিত—অশ্লীলতার অপবাদ যুক্ত,

(৪) যশোরের সারি গানের ভাষা সমৃদ্ধ, সাধারণ বিজয়া উপলক্ষে এই নৌসংগীতের প্রচলন,

(৫) সারি গানে yelling বা চিৎকার এবং শরীর ক্রিয়ার যৌথ প্রবৃত্তি—এই দুটো বিশেষ লক্ষণ,—অন্যান্য কর্মসংগীতের এসব যৌথ প্রক্রিয়া নেই,

ছন্দের দিক থেকে যদিও ড' ভট্টাচার্য শুধু ত্রৈমাত্রিক ছন্দের ব্যবহারের কথা বলছেন, কিন্তু সারি গানে দ্রুত চতুর্মাত্রিক ঠেঠাঠোকা (কার্ফাধরণের) ছন্দের বহু গান শোনা যায়। ঢাকার ছাদপেটার গানও এই ধরণের কতকটা hybrid ধরণের যৌথ গান—অশ্লীলতার অপবাদ যুক্ত।

গাড়িয়ালের প্রভাবে কণ্ঠেরও রূপান্তর হয়। উঁচু নীচু পথ দিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি। গাড়ি চালকের সুরে ঝাঁকুনি ও আছড়ে পড়বার ছেদ আসছে। কিন্তু চালক সাবধানে সুরকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। একটু ছন্দের ঝাঁকুনি সৃষ্টি করে গলাটাকে একটু ভেঙে দেয়। যেন ভেঙে দেওয়ার মধ্যে একটা আবেগ প্রকাশিত হয়। উত্তর বঙ্গের, বিশেষ করে কুচবিহার এলাকার, ভাওয়াইয়া গানে সুরের গতিভঙ্গের এমনি একটা প্রকরণ দেখা যায়। অবশ্য দ্রুত ছন্দ রক্ষার জন্যে ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙে সুরে স্বরভক্তির মতো করে ছন্দে একটা "হ" প্রয়োগ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে সমান ভাবে প্রচলিত। এ সব স্থলে প্রাণ শব্দটা "প্রাহান" হয়ে যেতে পারে। মনে হয় ভাওয়াইয়া গানের রূপের দ্বারাই এটাকে বেশ বিশ্লেষণ করা যায়। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ভাওয়াইয়া গানকেও ভাটিয়ালী শ্রেণীর "বাহিরের" গানের শ্রেণীভুক্ত একই-রূপ মনে করেন। ভাটিয়ালীর বিরহী নদী নিঃসঙ্গ মাঠে ও প্রান্তরে প্রসারিত। এ সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যার মূল কথা (বাংলার লোকসংগীত) :

(১) ভাওয়াইয়া উত্তর বঙ্গের আঞ্চলিক ভাবগীতি বা প্রেমমূলক গান। ভাবার সঙ্গে এগানের সম্পর্কও অচ্ছেদ্য,

(২) নায়ক মৈষাল মহিষ চরাবার উপলক্ষে বিদেশযাত্রী, কাজেই এ গান বিচ্ছেদের করুণতার রূপ লাভ করেছে,

(৩) যেহেতু 'কানু ছাড়া বাংলায় গীত নাই'—এ গানে কৃষ্ণ থাক কি না থাক, সে ভাব প্রকাশের গান তো নয়ই, আবার এ গানে মালিন্যও নেই।

(৪) দোতারার সঙ্গেই এ গানের সম্পর্ক—'দোতারায় যোক করিছে বাড়ি ছাড়াই'। এ গানের প্রকৃতি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন দেব বাংলার 'পল্লীগীতি-সংগ্রহে' একটি মত সমাবেশ করেছেন। যারা এ গান গায় তাদের বলে "বাউদিয়া"। "বাউড়া" বা বিবাগী কথা থেকেই "বাউদিয়া" শব্দের উৎপত্তি। 'পাড়োদি' 'বৈষাল' ও 'চটকা' ভাওয়াইয়া গানের অন্তর্গত। কিন্তু, ভাওয়াইয়া কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতিগত গান নয়।

পল্লীসংগীতে নৃত্য

নৃত্যভঙ্গি জীবনের মধ্যে বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়নি বলে কোন কোন আনুষ্ঠানিক গীতি (যথা গম্ভীরা, গাজন) ইত্যাদি ছাড়া তেমন নৃত্য-লক্ষণ পরিস্ফুট নয়, যদিও বহু গানের মধ্যেই নৃত্য-ছন্দ প্রাধান্য লাভ করেছে। পূর্ববঙ্গের 'গাজির গীতে' দেখেছি গায়েন একটি 'গাজি' পুঁতে দিয়ে মাথায় কাপড় বেঁধে হাতে রুমাল নিয়ে অনেকটাই নেচে নেচে ছন্দে ছন্দে গান করেন। কিন্তু ভঙ্গিটি কথকতার মতো আবৃত্তিমূলক।

নৃত্যছন্দ ও নৃত্য সম্পর্কে বাউল গানের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাউলের মূল তত্ত্বের সঙ্গে গান ও নৃত্যের নিগূঢ় সম্পর্ক। কিন্তু তবুও নৃত্যটি সাদা কথায় 'নৃত্য' নয় ওটা নৃত্যভঙ্গির রসবিকাশ বা তাত্ত্বিক বিকাশ। নাচের জন্যে 'বাউল'কে আসরে নিয়ে আসা যায় না, অথচ বাউল শুধু কানে শোনার জিনিস নয় দেখারও বটে। বাউল তত্ত্বের নিগূঢ় ইঙ্গিত এবং সংগীতে তার প্রকাশ সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মত :

"এক কারণে বৈঠকী সংগীত হিসেবে এই (বিলাবল রাগের) পাজার্য বাউলে রক্ষিত হয়নি—সেটি হচ্ছে বাউলের ছন্দোবাহুল্য, তারও কারণ, বাউল গান গাইবার সময় নাচে। বলা বাহুল্য, এ পাগলের নাচ নয়। সাধারণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করলেও বাউলের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে—এ নৃত্য তাই বেপরোয়া মাতামাতি নয়, তাই বাউলের নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তালেরও বৈচিত্র্য—তাল ফেরতা আছে। এক হিসেবে বাউল গান শুধু কানে শোনবার নয়, চোখে দেখবারও বস্তু। বাউলের একতারা, নৃত্যের, ভঙ্গী, ভাবের উচ্ছ্বাস, সবই সামনে দেখে শুনে তবে বুঝতে হয়; এ সম্পর্কে নন্দলালের আঁকা বাউলের চিত্রটি মনে করা যেতে পারে। এখানে শ্রাব্যের সঙ্গে দৃশ্য সংগীতের প্রত্যক্ষ সংগীতের সমন্বয় ঘটেছে।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাউল গান সম্বন্ধে অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনা করে একটি

মূল্যবান তথ্যের নির্দেশ দিয়েছেন। সংগীত রূপে বাউলের সুর বলে কোন বিশিষ্ট সুর নেই। কারণ, সারা বাংলাদেশে বাউলের আখড়া ছড়ানো। সেজন্যে ভাটিয়ালীর প্রভাব, কীর্তনের প্রভাব ও নানান আঞ্চলিক সুরের প্রভাব নানা ভাবেই পাওয়া যায়। ফিকির-চাঁদি ভঙ্গির যেমন একটা পরিচয় পাওয়া যায় আবার বহু সুরের (রাগের) স্বতন্ত্র ছায়াও বাউল গানে মিলে। নরসিংহদীতে (ঢাকায়) কীর্তনাঙ্গের বৈঠকী বসা-গান বাউলদের মুখে শুনেছি। ওদের হাতের যন্ত্র সারিন্দা। অতএব, বাউলে নৃত্যের প্রয়োগ—বিশেষ ভঙ্গিরই প্রকাশ।

নৃত্যের ছন্দে গানের রেওয়াজ থাকা বাংলা পল্লীতে বিশেষ স্বাভাবিকও নয়, যদিও বাংলা দেশের আশেপাশেই প্রচুর উপজাতীয় নৃত্যগীত ছড়ানো। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে মালদহের গম্ভীরা এবং বীরভূমের গাজন নৃত্যভঙ্গি সম্বলিত গান। নীলের গান বর্তমানে অপ্রচলিত। এসকল নৃত্যমূলক গান ঢাক বা ঢোলের সঙ্গে গাওয়া হতো বলে সুরের একটা কাঠামো ছাড়া আর বিশেষ কিছু এতে ছিল না। ঢাকা অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তিতে "বেদেনীর গান" প্রচলিত ছিল, গানের কথা—"ওগো রসের বাইদানী"। মাথায় সাপের ঝাঁপি নিয়ে বেদে ও বেদেনী সেজে মধ্যরাত্রিতে ঢোলক বাজিয়ে দলগুলো নাচগান করে বেড়াত। সঙ্গে থাকতো হরগৌরী অথবা কালীকাচ্। ঢাকের সঙ্গে শুধু নৃত্যই চালু ছিল। শ্রীহট্ট ও শিলচর অঞ্চলে প্রচলিত "বৌ-নাচ"কে উপলক্ষ করে একটি বিশেষ লোক-পরিচিত গান আজও চালু আছে—"চাঁদবদনী ধনী নাচত রঙ্গে।" নতুন বৌ শ্বশুর বাড়ি এসে অত্যন্ত লজ্জাশীলা ও সাবধানী পদক্ষেপে নৃত্য করে দেখায় গানের সঙ্গে। অসমীয়া ভাষায় পল্লীগীতির বিশেষ নৃত্য-অনুষঙ্গ "বিহু"—কতকটা শৃঙ্গার ভাবদ্যোতক। ঢোল বাজের নানা ভঙ্গি এ নৃত্যের বিশেষ একটি আকর্ষণীয় লক্ষণ। উড়িষ্যার পল্লীতে যদিও প্রচুর উপজাতীয় নৃত্য-গীত পাওয়া যায়, ওড়িয়া পল্লীর প্রচলিত নৃত্য সম্বলিত গানগুলো এইরূপ :—ঘোড়া-নাচ-গীত, কেল-কেলানী-গীত, দাও নাচ, পটুয়া নাচ এবং পাইক নাচ। এসব গানগুলোর মাধ্যমই নৃত্য। বাংলার কোন অঞ্চলে নৃত্যকে মাধ্যম করে গানের সৃষ্টি বিশেষ হয়নি। বরং একক গানের রীতি সংগীতাংশকেই কতকটা এগিয়ে দিয়েছে। গানের মধ্যে খেমটা, আড়-খেমটা প্রভৃতি তালগুলো নৃত্য থেকে এসেছে। কিন্তু উল্লাসের চেয়ে ব্যথার অভিব্যক্তি, তাছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্দৈব, পারিবারিক

অব্যবস্থা ও বৌ-ননদ-শাশুড়ী সমস্যা লোকগীতিকে নানা ব্যক্তিগত দুঃখের ভাবে প্রভাবিত করেছে।

এর একটি কারণ এই যে বাংলার পল্লীগীতি বড় বেশী গৃহাভিমুখী, দাম্পত্য-জীবন ও নর-নারীর সম্পর্ক বৈচিত্র্যের কাছে এসে গেছে। এজন্যে হরগৌরীও আমাদের কাছের মানুষ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "হিমালয় আমাদের পানা পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।" অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণ-সম্বলিত গানের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, "কৃষ্ণরাধার বিরহ-মিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহ-মিলনের আদর্শ, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ সমাজ বা মনুসংহিতা নাই; ইহার আগাগোড়া রাখালি কাণ্ড।" গানের এই প্রকৃতির জন্যেই একক কণ্ঠের গান বিশেষভাবে রূপ লাভ করেছে। এজন্যে বাংলার পল্লীসংগীতে পৌরুষেরও অভাব।

কোন কোন ক্ষেত্রে যৌথগান অথবা বৃন্দগান বা সমবেত কণ্ঠের গানও দরকার হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দোহারের প্রয়োগ ধর্মীয় অথবা আনুষ্ঠানিক গানগুলোতেই করা হত। বিশেষ করে স্বতঃস্ফূর্ত পল্লীগীতিতে বিবাহের গানই সমবেত কণ্ঠে গীত হত। বিবাহের গান স্ত্রী-সমাজের বিপুল ভাণ্ডার। এ গানগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার। আনুষ্ঠানিক বিবাহের বাইরে, লৌকিক আচার থেকেও স্বাতন্ত্র্য রেখে হিন্দু, মুসলমান এবং আদিবাসী ও উপজাতিরা এ গান সংরক্ষণ করে এসেছে। "বাংলার লোকসংগীত" গ্রন্থটির একটি খণ্ডে অনেকগুলো গানের সমাবেশ করা হয়েছে। আজকের গায়কদের জানা দরকার যে কতকগুলো গান নারীসমাজের জীবনাচরণের গান, পুরুষদের দ্বারা গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এ গানগুলোই গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে গাওয়া হত। এরূপ গানের অধিকারী যাঁরা, তাঁরাই (অর্থাৎ স্ত্রী-সমাজ) এর চর্চা করতেন। আজকাল, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে অথবা সিনেমার জন্যে কোন কোন শিল্পীকে এ ধরণের গান নির্বিচারে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এঁরা পল্লীগীতি শোনাতে বাস্তবরূপের বিভ্রম ঘটান। কথা হতে পারে, সংগীত হিসেবে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ করা উচিত নয়। কিন্তু গানের বাস্তব রূপটি সমগ্রভাবে চিন্তার বিষয়। কিছু কিছু বিবাহের গান সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একথা খাটে। এধরণের কিছু কিছু গান আকাশবাণীর লঘুসংগীত বিভাগে প্রচারিত হয়। একটি বিবাহের গানের প্রযোজনায় সার্থক রূপ দিয়েছেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, গানটি—"জলে ঢেউ

দিওনা।" এ গানটির প্রযোজনায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরণের গানের ভাব সমগ্ররূপে ফোটানো যায় এবং পরিবেশটিও উপযুক্ত প্রযোজনায় চমৎকার ফুটিয়ে তোলা যায়, আদত পল্লীগীতি থেকে কোন রূপেই বিচ্যুত হয় না! গানে শাহনাই যন্ত্রটির চমকপ্রদ ব্যবহার করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে সংগীত সংযোগিতায় যন্ত্র অবান্তর বা অস্বাভাবিক নয়।

যন্ত্রসংগীত

আজকাল যন্ত্রসংগীতের সহযোগিতার ক্ষেত্রে সুর-সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশে ব্যবহৃত দোতারার স্থানটি অতুলনীয়। পূর্ববঙ্গের আর একটি চালু যন্ত্র 'সারিন্দা'। 'ছড়ি' দ্বারা সারেঙ্গীর মতো করে বাজাবার রীতিতে এ যন্ত্রটি চালু হয়, কিন্তু আঙুল চালনার পদ্ধতি বেহালার মতো। বেহালার অনুসৃত রীতিতেই সারিন্দা সোজাসুজি দাঁড় করিয়ে বাজানো হয়। বাঁশীর ব্যবহারটি শাস্ত্রীয় হলেও, পল্লীসংগীতে, বিশেষ করে বাংলাদেশেও ছিল না। কারণ ত্রিপুরবাসী একজনে বাজায় অন্যজনে গায়—এরূপ ভঙ্গিতে বাংলায় পল্লীগীতি চলে নি। বাঁশীর ব্যবহার উপজাতিদের মধ্যেই বিশেষভাবে দেখা যায়। বাংলার পশ্চিম এলাকায় সাঁওতাল, ভীল অথবা অন্যান্য উপজাতিদের মাদল ও বাঁশীর ব্যবহার বাংলা গানকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে পূর্বপ্রান্ত থেকেও বাঁশের বাঁশীর বাজনার নানা রীতি সংগীতে সংমিশ্রিত হয়েছে।

পল্লীগীতির প্রথম ধাপেই তাল যন্ত্রের আবির্ভাব। তাল যন্ত্রই স্বাভাবিক সহকারী যন্ত্র। ঢাক, ঢোল এবং কাঁসরের ব্যবহার সর্বত্র। খোলের ব্যবহার পরবর্তীকালীন। ঢোলকের ব্যবহার অনেকটা আধুনিক এবং সামান্যই। বাউলে বাঁয়ার ব্যবহারের রীতিটি পুরোনো বলে মনে হয় না। খঞ্জনী, একতারা সারাভারতের বিভিন্ন স্থলে নানাভাবেই ব্যবহৃত হয়। মন্দিরা ও করতাল ইত্যাদি যন্ত্রগুলোর ব্যবহার ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক গানেই হতো। উড়িষ্যার দাসকাঠিয়া গানে দুখণ্ড ধাতব কাঠির ব্যবহারে ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টির বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। উপজাতি এলাকার নৃত্যগীতির প্রধান অবলম্বন ঢাক, জয়ঢাক এবং এধরণের বড়ো চর্মের আনদ্ধ যন্ত্র।

শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন, আধুনিক যুগে বাংলা পল্লীসংগীতে যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, এখানে তাদের উল্লেখ করছি—

(১) তারের যন্ত্র—একতারা, দোতারা, সংগ্রহ, গোপীযন্ত্র, সারিন্দা,

(২) শুষীর যন্ত্র—মুরলী, আড়বাঁশী, টিপ্ বা বাঁশী, শিঙা

(৩) আনদ্ধ যন্ত্র—ঢাক, ঢোল, কাড়া, ঢোলক, খোল, মাদল, খঞ্জনী বা খুঞ্জুরী, আনন্দলহরী বা খমক।

(৪) ঘন যন্ত্র—বহু প্রকারের করতাল, খটতাল, মন্দিরা, কাঁসি, কাঁসর, ঘণ্টা।

এই সমস্ত প্রকার যন্ত্র ব্যবহারের মধ্যে স্বাভাবিক ও মৌলিক পল্লীগীতির ছন্দ-স্বাতন্ত্র্যই তাকে বিশিষ্ট করে রাখে। এজন্যেই তালযন্ত্রের প্রাধান্য সব দেশেই বিশেষ লক্ষণীয়। বাংলায় ভাটিয়ালী এ ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ ব্যতিক্রম।

সবশেষে, যে সব গান অবলম্বন করে বাংলা পল্লীসংগীতের নানা প্রসংগ ও মতামত ব্যক্ত করা হল, সে সব গানের একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু, এসব গানের রূপ অনেক স্থলেই পল্লীসুরের প্রযোজিত পরিবেষণ। বিভিন্ন পল্লীঅঞ্চলে যে গান শুনতে পাওয়া যায় সেই আকরিক বস্তুর পরিশীলিত রূপ অথবা তারই ভঙ্গি। এসব গানের বৈচিত্র্য—বস্তুটি সুন্দর করে সাজাবার ইচ্ছেতে অথবা অনুকরণ করে রচনাতে নিহিত করাতে। এসব প্রচলিত গানই আংগিক আলোচনায় আবশ্যক। প্রযোজনা ও রচনার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁদের কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—অজয় ভট্টাচার্য, কানাইলাল, গিরিন চক্রবর্তী, জসীমুদ্দিন, চিত্ত রায়, সুরেন চক্রবর্তী, পরেশচন্দ্র দেব ইত্যাদি। কিছুসংখ্যক গান এখানে দেওয়া হল :

(ক) ১। **আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মেদ**

ঘর বাড়ী ছাড়িলাম,	নাও ছাড়িয়া দে,
গুরুর পদে প্রেম ভক্তি,	মনই যদি নিবি বন্ধু,
কোকিলারে,	আমায় ভাসাইলি রে,
পরান আমার কাঁদে,	দেওয়ায় করছে মেঘ,
কিসের মোর বাঁধন,	শ্যামের বাঁশী বাজলো,
হেইওরে হেঁইও,	বৈঠা জোরে বাওরে বন্ধু,
কার জন্যে প্রাণ,	তোরা কে কে যাবি,

আরে ও ভাটিয়াল
ও মন গুরু ভজরে
দিন দিন ফুরাইল,
ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে
আজি নদীত না যাইও
না জানিয়া পিরীতের
ময়ূরপঙ্খী নৌকা

ও মাঝিরে ঝড় তুফানে
জলের ঘাটে কদমতলায়
নাইয়র ছাড়িয়া দাও
শোন ললিতে ও বিশখে
ও সুখের ময়না রে
গাঙের কূলরে গেল

অনন্তবালা—

একবার আসিয়া সোনার চাঁদ,
গেলে প্রভু আমারে ছাড়িয়া,
ওরে পাগল করিলরে
নিমাই দাঁড়ারে
হরিনামের ধ্বনি
দাঁড়ারে দাঁড়ায়ে কালা

পতিধন প্রাণ বাঁচেনা
বড় দুঃখে কাল কাটাইলাম
কামিনী কালনাগিনী
যশোদা মা
গৌর কেন আমার
শ্যাম পরশমণি

অমর পাল—রাই জাগো গো,
কমলা ঝরিয়া—গুন্ গুন্ গুন্,
কুসুম গোস্বামী—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ করে,

আমারে ছাড়িয়া গুরু
কুল মজালি
ময়নামতীর ময়না পাখি

নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়—

কে যাওরে রঙিলা নায়ের মাঝি,
চান্দ দেখাইয়া যাও

নির্মলেন্দু চৌধুরী—

নাইয়ারে সুজন,
ও আমার দরদী
ও নদীরে ও মোর তিস্তারে,

ভাব না জেনে
ও কানাই পার করে দে
ও বস হস্তীনী

গিরিন চক্রবর্তী—

আমি বন্দী হইলাম
কিশোর গঞ্জে মাসীর বাড়ি

পূর্ণ দাস—

দুই সতীনের ঝগড়া
কিসে রাধার মত
ভালো করে পড়গা,

সংসারে সেজে সং
বল দেখি ভাই
মেনকা মাথায় দোলা

শচীন দেববর্মণ—

বাঁশী দাও মোর হাতেতে	তুমি নি আমার বন্ধু
নিশিতে যাইও ফুল বনে	ওরে সুজন নাইয়া
রঙ্গিলা রে	তুই কি শ্যামের বাঁশীরে

শশাঙ্কমোহন সিংহ—

ভোর হইয়াছে মাঠে যাই,	বাদাম উড়াইয়া দাও
জ্যৈষ্ঠমাসে বিষ্টির জল,	বউ চলেছে ধীরে ধীরে
গাড়ি ভাই গাড়িয়াল,	সুন্দর কন্যা

আকাশবাণী লঘুসংগীতের অনুষ্ঠানে রম্যগীতিতে প্রচারিত বহু উল্লেখযোগ্য সংযোজনের কয়েকটি নাম উল্লেখ করা গেল :

চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়—

তোমরা দেখগো আসিয়া
চিড়া কুটি চিড়া কুটি
মনা ভাই আমার
লাল বৃন্দাবন লাল
ওলো রঙ্গিলা রাই

নির্মলেন্দু চৌধুরী—

মুসলমানে বলেগো আল্লা
কান্দিয়া আকুল হইলাম
পাগল মন তুই
ফাঁক তালে দুনিয়া ঘোরে

শশাঙ্কমোহন সিংহ—টাকার কথা

সুরেশ চক্রবর্তীর প্রযোজনা—জলে ঢেউ দিও না।

পল্লীগীতির আলোচনা উপলক্ষে উল্লিখিত গানগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু এ সব উদাহরণের বাইরেও বহু শিল্পীর গান আজকাল নানাভাবে প্রচারিত হচ্ছে। কিছু কিছু গান নাগরিক গোষ্ঠীর সংযোজনায় পরিবেশিতও হচ্ছে। পরিচিতি ও প্রচারের দিক থেকে "বেঙ্গল মিউজিক কলেজের" গবেষণা বিভাগ থেকে প্রচারিত, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত "বাংলার লোকসংগীত" একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এতে আছে

প্রথম খণ্ডে শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর স্বরলিপি ও সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ডে গিরিন চক্রবর্তীর স্বরলিপি, বাকি তিন খণ্ড সুরেন্দ্রবাবুর স্বরলিপি কৃত। যে কোন কথাপ্রধান গবেষণা থেকে এই ধরণের কাজ সংগীতের রাজ্যে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু, বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আরো সুসংগৃহীত সংযোজন করা দরকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ধর্মীয়গীতি

মধ্যযুগের গান

যে গানের মূল গঠন ধর্মতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল এবং বিশিষ্ট ধরণের ভাবানুপ্রেরণা থেকে যে গানের উৎপত্তি, সে গান সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। মধ্যযুগে উত্তর ভারতময় নানান ধর্মীয় ভাবের প্লাবন এসেছিল। একটির পর একটি ধর্মীয়ভাবকে অবলম্বন করে মধ্যযুগীয় মিস্টিক বা মরমিয়া সাধুসন্তরা নানান গীত রচনা করে আত্মোপলব্ধির কথা প্রচার করেছেন। উত্তর-ভারতময় ভজনাবলী সৃষ্টির মূল কারণই এইরূপ। মিস্টিকদের মতবাদ ভজন, দোহাঁ প্রভৃতিতে রূপলাভ করেছে এবং নানান সুর ও ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগকে ভারতের পাঠান রাজত্বের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়কাল ধরে নিতে পারি। হিন্দুস্থানী সংগীতে এই সময়কালের মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাংলাদেশে তখন কীর্তনের প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে, উৎকলে এই সময়ে "ওড়িশী, চম্পূ", জগন্নাথদেবের উপাসনার "জনান এবং ছান্দ" প্রচলিত হয়েছে। অসমীয়া সংগীতে তখন "বরগীত" এবং "অঙ্কিয়ানাটের" চর্চা চলেছে। এই সময়কালের মধ্যেই বাউল সংগীতের উৎপত্তি ও বিবর্তন। বৈষ্ণব পদাবলীর সমসাময়িক শাক্তপদাবলীর প্রচারের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা দরকার। এই সব ধর্মীয় গীতির উৎপত্তির মূল যে কোন আবেদনই থাক না কেন; আজকাল এই সমস্ত গানের রূপ ও প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। গানগুলো অধিকাংশ স্থলেই বিভিন্ন সংগীত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখন এসব গান নিছক প্রার্থনা বা ধর্মীয় আবেদনে গীত হওয়া ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে সংগীতরূপে গাওয়া হয়। ধর্মীয় আবেদনকে গৌণ না করেও যখন শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে গানের বিচার হয় তখন স্বভাবতঃই মূল্যায়নের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। সাধারণ সংগীত শ্রোতা ও গায়ক গানের গভীর তত্ত্বের সঙ্গে ভাবের সমতা রক্ষায় প্রস্তুত থাকেন না। তাঁরা গানকে গানরূপেই শোনেন। এখানে একটি বড় সমস্যার উদ্ভব ঘটে। "আঙ্গিক নষ্ট হল" মনে করে যাঁরা 'গেল' 'গেল' রব করেন, তাঁদের মধ্যে এই ধর্মীয় তত্ত্ব ও সংগীতের সমতা রক্ষার প্রশ্নটাই বড় হয়ে

জাগে। সংগীত বিচারে দুয়েরই হয়ত প্রয়োজন। কিন্তু এখানে পারমার্থিক উপলব্ধি বা আত্মিক-প্রয়োজনেরও বেশি হয়ে গান বিশেষ শিল্পে পরিণত হয়; গানগুলো স্বতন্ত্রভাবে সংগীত হিসেবেই বিচার্য হয়ে দাঁড়ায়। কীর্তন, বাউল ও রামপ্রসাদী সুর ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ এপথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদও নিজের মত করে ব্যবহার করে, এসব সুরের প্রকাশ-ভঙ্গিকে সংগীতের দিক থেকে চিন্তার পথ খুলে দিয়েছেন। অন্ততঃ আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে এই লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিলেও আমরা ধর্মীয় প্রয়োজনটাকে অবহেলা করব না। বরং একথা গোড়ায় বলে রাখা ভাল যে এসব শ্রেণীর গান শুধু প্রকাশের কায়দা এবং সুরসৃষ্টির অবলম্বনরূপেই ধরা যায় না, কীর্তন-গায়ক মাত্রেরই উপলব্ধি সম্বন্ধে ভাববার প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য, আজকাল সংগীত-শিল্পীর গানে এই উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা সর্বদা সম্ভব হয় না। শিল্পীর লক্ষ্য সুরবিন্যাসের উপরেই ন্যস্ত থাকে। আজকাল 'ভাঙা-কীর্তন' বলে যে বহু-সংখ্যক গানে কীর্তনের রূপ জনসাধারণের মধ্যে কাব্য-গীতির মারফতে ছড়িয়েছে, সে গান সম্বন্ধে একথা খাটে। আলোচনা করে দেখেছি, প্রাচীন কীর্তনের যাঁরা সমর্থক, এবং বর্তমান ভাঙা কীর্তনের ভঙ্গিকে যাঁরা ঢপ্ কীর্তনেরই একটি পরিণত রূপ বলে মনে করেন, তাঁরা পুরানো বিশেষজ্ঞ-কীর্তনীয়াদের যেমন করে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেন, তেমনি তাঁদের গানে সংগীতাংশ দুর্বল হলেও তার মধ্যে চিরায়ত সংগীতের বহু উপাদান খুঁজে পান। আঙ্গিকের দিকে এঁদের নজর বড় তীক্ষ্ণ। আজকের কীর্তনের মধ্যে এঁরা প্রাচীন পালা-কীর্তনের সেই মহত্ত্ব খুঁজে পান না। বরং রাগ-সংগীতের অনন্ত সম্ভাবনার মতো কীর্তন গানের আঙ্গিকেও যে অনন্ত চিরায়ত সংগীত সম্ভব—বিশ্বাস করেন। অন্যদিকে বর্তমানের ভজন সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি করা যায়। অর্থাৎ, বর্তমান কালের ভজনের গীতিভঙ্গির রূপান্তরও অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রচলিত সংগীত-ধারায় ভজনের সুরে বহুরকমের সংগীত সংযোজনার পরীক্ষা চলেছে। বিভিন্ন রাজ্যের গানের মধ্যে উড়িষ্যার প্রাচীন ওডিশী রাগসংগীতে-প্রভাবিত গান; এ গানকে কেউ কেউ রাগ সংগীতের পর্যায়ে স্থানও দেন। অসমীয়া ধর্মীয় গীতির জমিটা প্রায় পূর্বরূপেই বজায় আছে। সুর অথবা গীতি-ভঙ্গির দিক থেকে বিশেষ বদলায় নি। এইসব ধর্মীয় গীতিকে এজন্য প্রাচীন বা ট্র্যাডিশনাল ধর্মীয় গান বলে উল্লেখ করা গেল।

কীর্তন

কীর্তনের সঙ্গে লোকগীতির গায়ন-পদ্ধতির সামঞ্জস্য আছে—এজন্যে কীর্তন লোকগীতি-শ্রেণীর সংগীত কিনা এসম্বন্ধে একটা মতভেদ আছে। অনেকে কীর্তনকে শাস্ত্রীয় সংগীতের মধ্যে স্থান দিতে চান। কিন্তু একশ্রেণীর সমালোচক কীর্তনকে লোকগীতি-শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, কীর্তনে একটা চিরায়ত সংগীতের প্রভাবের প্রবল লক্ষণ বর্তমান, সে জন্যেই শ্রেণী-বিভাগের ব্যাপারে দোটানা ভাবনার প্রকাশ।

কীর্তন সংগীতের গোড়ায় ছিল পল্লী সংগীতের গায়ন-পদ্ধতি এবং পল্লী-সংগীতের অনুরূপ স্বাভাবিক হৃদয়ের আবেদন ও আকূতি। পরবর্তীকালে নানান আঙ্গিকের প্রয়োগ ও বিকাশ হয়, এবং অনেক পরিমাণেই রাগসংগীতের পন্থা অবলম্বিত হয়। প্রকৃত কীর্তনের স্ফুরণের জন্যে মূল উদ্দেশ্য তখনো বদলায় নি বরং নানাভাবেই বিকশিত হয়েছে। হয়ত রাগ-সংগীতের প্রভাব গায়ন-পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করে দিতে পেরেছে বিশেষ বিশেষ স্থানে, কিন্তু বাংলা-দেশের সর্বত্র প্রচারিত কীর্তনের মধ্যে কোথাও রাগসংগীত পরিপূর্ণরূপে বিকশিত নয়। বরং সংমিশ্রণের ফলে কীর্তন একটা নিজস্ব রীতি বেঁধে নিয়েছে, সে রীতিকে যে ভাবেই বর্ণনা করা হোক পদাবলী কীর্তন গান সহজ-সাধ্য স্বতঃস্ফূর্ত গান নয়। সুরের দিকটা আলোচনা-সাপেক্ষ, কিন্তু কীর্তন নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে বিকশিত, কোনো কোনো উপাদানের আঙ্গিকে (যথা—খোল বাদন) এ-সঙ্গীত অতুলনীয় গঠন-সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া, বিষয়বস্তুর জন্যেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, কীর্তন শুনতে গিয়ে আমরা সংগীত শোনার কথাটাকে গুরুত্ব দিই না, যতটা ভাবি রাগানুগা ভক্তির কথা। রাধাকৃষ্ণ লীলা অঙ্গের যে চৌষট্টি রসের বিশেষ বিশেষ রস-অভিব্যক্তির দিকেই মন যায়, ভগবদ্‌ভক্তির ভাব সাধনা চিন্তাকে অধিকার করে। যদি কীর্তন গান ভক্তিধর্মের গভীরতাকে উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারে তবেই সংগীত সার্থক।

শ্রীচৈতন্য কীর্তনের প্রচলন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার তাঁকে সংকীর্তন প্রবর্তক বলেছেন—"বহিরঙ্গ সঙ্গে নাম সংকীর্তন। অন্তরঙ্গ সনে রস আস্বাদন।" এই দুইটি ঐতিহাসিক রূপের বিকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারে বিভিন্নভাবে—"শিষ্যগণ বলে কেমন সংকীর্তন। আপনি শিখায় প্রভু শচীর নন্দন।" নাম-মন্ত্রটি হাততালি দিয়ে শিখিয়ে শিষ্যগণসহ গান করেন। আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয়। চৈতন্যদেব যে ভাবজগতে অবস্থান করতেন তার নিত্য

নৈমিত্তিক ভাব-প্রকাশরূপে কীর্তনই একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। নগর-কীর্তনের যৌথগান প্রচারের মূলেও ছিলেন শ্রীচৈতন্য। কাজীর বিরুদ্ধে নগরকীর্তনে অভিযানটি সংকীর্তনের আর একটি দিক উদ্ঘাটিত করে। পরবর্তী-কালে রায় রামানন্দের সঙ্গে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং গীত-গোবিন্দের রসাস্বাদন করেন, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী স্বরূপদামোদর সংগীতের বহু প্রকাশকে ব্যক্ত করেন, রূপগোস্বামী সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের নাটকীয় রূপবিন্যাস করে কীর্তনকে স্বতন্ত্র রূপ দিতে সাহায্য করেন। এসম্বন্ধে স্মরণীয় ঘটনা—পুরীতে কীর্তন-উৎসব। বিভিন্ন স্থান থেকে আমন্ত্রিত (বাংলা ও উড়িষ্যার) সাতটি দলের পুরীতে আগমন এবং উৎসবে যোগদান। শ্রীচৈতন্যদেবের পর ষোড়শ শতাব্দীতে কীর্তন পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। আনুমানিক ১৫৮২ খৃঃ ঠাকুর নরোত্তম দাসের চেষ্টায় খেতুরিতে কীর্তনের উপলক্ষে একটি মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবে কীর্তনকে বিশিষ্ট রূপদান করা হয়। বহু রীতি সম্বন্ধে এখানেই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে এবং নির্দিষ্ট আঙ্গিক অনুসৃত হয় :—(১) গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োগ, (২) মাদল ও মৃদঙ্গের ব্যবহার, (৩) অনিবদ্ধ গীতালাপের প্রয়োগ, (৪) লীলাকীর্তনের পদ্ধতি অবলম্বন, (৫) পালাগানের রস প্রকাশের সময় নির্ধারণ—ভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের লীলা অভিব্যক্তির সময় অবলম্বন, (৬) জটিল ভাবকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে আখর (আঁখর) প্রয়োগ।

শ্রীচৈতন্যই শ্রীখোল চালু করেন। খোল এবং করতালের প্রয়োগের ফলে এই সংগীতে একটা বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। খোলবাদকের স্থান কীর্তন গানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং খোলের শিক্ষাও সহজ নয়। তাল-আঙ্গিকের ক্রমবিকাশ কীর্তনগানকে অনুশীলনের উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়। খোল বাজনায় কীর্তন গানের আবাহনী হয়। এরপর **তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা** বা গৌরাঙ্গ বর্ণনার মধ্য দিয়ে লীলা কীর্তন সুরু। কীর্তনীয়া বক্তব্য বিষয়কে হাজার পদাবলী থেকে বেছে নিয়ে গান করেন। গানের প্রথম পংক্তিতেই ভাব বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে ভাষারূপ সংযোজিত হয় তাকে **আখর** (**আঁখর**) বলা হয়। আখরের মধ্য দিয়ে ভাবকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। "আঁখরের পদ্ধতিটিও বড় সুন্দর। অশ্রুত বেশ ধীরে ধীরে শ্রুত হচ্ছে—পূর্বপাটে ঐ একটি রং—উষার চাউনিতে ঐ আর একটি জাগল তারই মাথায়—ঐ ঐ আর একটি তার ঠিক পাশে……ছোট থেকে হচ্চে বড়, সূক্ষ্ম থেকে স্পষ্ট, অস্পষ্টতা থেকে আলো……ইংরেজিতে যুক্তিবাদীরা বলবেন—অতিশয়োক্তি,

হাইপার্বোল! কিন্তু সত্যি কি তাই? ভালো যে একবারও বেসেছে সে জানে যে প্রেমের উদ্বেল মুহূর্তে চিত্তাকাশে যখন রঙের আগুন লাগে তখন নগণ্যতমও হয় সে আলোর সরিক।" এখানে কীর্তন কাব্যিক হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পের গভীরে কবির তৃতীয় নয়ন প্রযুক্ত হয়। "কবির আছে তৃতীয় নয়ন, তৃতীয় শ্রুতি—তিনি দেখতে পান শুনতে পান। অগম-এ দর্শনের, এ গহন-গানের রেশ ধরিয়ে দেন, দেখিয়ে দেন কোন্ দোলায় কী কাঁপন জাগা উচিত—আমাদের প্রাণের বাষ্পলোকে করেন বিদ্যুৎকটাক্ষ—অমনি ছায়াচেতনার দিগন্ত অবধি ফেটে পড়ে আলো—আবেগের আলো, আনন্দের আলো, অঙ্গীকারের আলো—আর ঘুমন্ত মনের মাটিও জেগে ওঠে আশ্চর্য ভূমিকম্পে! আঁখরে সত্য কবি-কীর্তনী পারেন ভূমিকম্পের স্পন্দন জাগাতে"। (সাঙ্গীতিকী)

আখরের মধ্যদিয়ে ভাবকে বিশ্লেষণ করে যখন কীর্তনীয়া প্রকৃত স্থায়ীতে ফিরে আসেন তাকে বলা হয় "**কাটান**"। কাটানের দ্রুতগতির সহজ ছন্দোবদ্ধ কথা বার বার ঘুরেফিরে যৌথ উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়ার পর একটি কাটান পরিসমাপ্ত হয়। শ্রোতার মনেও ভাব-সন্ধিক্ষণ আসে। এই সমস্তটা অংশে (আখর ও কাটান) খোল করতালের ছন্দ-সংযোজনা মুক্তভাবে বিরামহীন চলতে থাকে এবং প্রতিটি বর্ণনাত্মক কথা, ভাষায় ও সুরে নানানভাবে কাটানে এসে শেষ হয়। এখানকার বিশেষত্ব **দোহারের** ব্যবহার। দোহার মূল অংশটিকে বারবারই ঘুরে ফিরে গেয়ে সংগতি রক্ষা করে চলে। বিশেষ করে কাটানের সময়ে খোলে ধ্বনিত তালফেরতা এবং করতালের বাদন সহযোগিতায় দোহারের ভূমিকাই বিশেষ লক্ষ্য করা যায়।

কীর্তনে তালের ব্যবহার সংগীতের দিক থেকে এক বিস্ময়কর বিকাশ। প্রায় শতাধিক ছন্দ বা ১০৮টি তাল গানের মধ্যে চালু আছে। কিছু কিছু তালের মাত্রা-ভাগ রাগসংগীতে পাখোয়াজের তালের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও জটিল। বিচিত্র নামে তালগুলো চালু আছে, যথা—তেওট, দশকোশী, দাশপ্যারী, দোঠুকী, একতালী, লোফা, চঞ্চুপুট, আড়তাল, রূপক, তেওরা, ঝাঁপতাল, ঝাণ্টি, ধরাতাল, শশিশেখর, বীরবিক্রম, ইন্দ্রভাষ, বিষমপঞ্চম, গুঞ্জন, দোজ্, নন্দন, ঝুঝুঁটি, মদনদোলা, ছুটা, বশিড়, অষ্টতাল প্রভৃতি। কিছু কিছু পাখোয়াজের তালের মুক্ত ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য তালের মধ্যে বড় এবং মধ্যম দশকোশীর প্রয়োগ খুব বেশি হয়ে থাকে। বড় দশকোশী ২৮ মাত্রাতে সমাপ্ত, আগাগোড়া দুই মাত্রার ভাগে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত

এবং একটি দীর্ঘ পংক্তির মতো সম্পূর্ণ তালটি গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুরে ফিরে আসে। তাল-ভাগটি বোলের দ্বারা নিম্নলিখিত রূপে মাত্রায় মাত্রায় ভাগে ভাগে উচ্চারণ করে বোঝা যেতে পারে :—

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮
ঝাকি তাথি	ঝাকি তাথি	তাথি ঝাকি	ঝাকি ঝাকি
+	o	o	o

৯ ১০	১১ ১২	১৩ ১৪	১৫ ১৬
ঝাকি তাথি	ঝাকি ঝাকি	তাথি ঝাজ	ঝাঝা ঝাঝা
২	o	o	o

১৭ ১৮	১৯ ২০	২১ ২২	২৩ ২৪	২৫ ২৬	২৭ ২৮
ঝাতা তাতা	ঝাকি গুরুগুরু	ঝাকি তা	তিন দা	তিন দা	খিখি তাথি
৩	o	o	o	o	o

মধ্যম দশকোশী ১৪ মাত্রায় সমাপ্ত। ছোট দশকোশী ৭ মাত্রা তাল, নিম্নলিখিতরূপে উচ্চারিত হতে পারে—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঝাঝি	নাকজিনি।	ঝাঝি	নাকজিনি।	ঝা গুরুগুরু	ঝাঝি নাক্।	থেটে থেটে

যদিও পাখোয়াজের এবং তবলার বোলের সঙ্গে ঠেকাগুলোর কোথাও কোথাও সামঞ্জস্য আছে, তবু মাত্রা-ভাগ, তাল-ভাগ এবং বিলম্বিত গতির প্রকরণ স্বতন্ত্র রকমের। তালের জটিলতার জন্যেই, অনেকের ধারণা, কীর্তন গান চিরায়ত সংগীতের পর্যায়ে স্থান লাভ করতে পারে। এ বিষয়ে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের মতটি বেশ স্পষ্ট। "কীর্তনের তাল বা ছন্দরস হিন্দুস্থানী তাল বা রসের স্বজাতীয় নয়। এখানে ছোট চুটকি তালের কথা বলছি না, যেমন জপ, ধামালি, ছোট দুঠোকা প্রভৃতি তাল। বলছি ওর কল্লোলিত বিলম্বিত তালগুলির কথা। বলেছি, হিন্দুস্থানী সংগীত ও কীর্তনের তুলনা করা উচিত নয়। এরা দুই আলাদা ধর্মের ও স্বভাবের সংগীত।" অতএব, দিলীপবাবুর মতকে অনুসরণ করে বলা যায় যে শুধু শত মাত্রারও দীর্ঘ, সুকঠিন তালের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেই তুলনা চলে না। যুক্তিসংগত ভাবে বলতে গেলে, সম্পূর্ণ গড়নটাই অন্য রকমের এবং পরিবেষণের ভঙ্গি স্বতন্ত্র। শুধু তিন, চার, পাঁচের একক বা unit-এর ভাগ দিয়ে তালের বিচার চলে না, বিচার চলে তালবাদ্যে যে বোলের দ্বারা ছন্দ ধ্বনিত হচ্ছে এবং ছন্দের চলনটা কিভাবে আছে—তারই বিচারে। সবগুলো তালবাদ্যের ডাহিনা ও বাঁয়ার সমন্বয়েই ছন্দের তারতম্য, শ্রবণ এই তারতম্যকেই স্বীকার করে, লিখিত থিওরি স্বীকার করে না।

কবিতায় বা সুর করে একই চতুর্মাত্রিক ছন্দে যে তারতম্য সৃষ্টি করা যায়, বিভিন্ন তালবাদ্যে বিভিন্ন রকমের টোকা, কানির বাজনা, বাঁয়া-চাপড় ও ঘর্ষিত অলঙ্কারের দ্বারা আরো বহু রকমের ছন্দের সৃষ্টি হতে পারে। একই আড়খেমটা তাল তবলায়, খোলে, ঢোলকে এবং খমকে বাজিয়ে শোনালে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হবে। এজন্যেই বলা হয়েছে পাখোয়াজ ও খোলের ছন্দের জাত এক নয়, ধর্মও আলাদা। খোলের চর্চায় বহুকাল ব্যয়িত হলেই বেশ ভাল বাজিয়ে তৈরি হতে পারে। শিক্ষার ব্যাপার কতকটা রাগসংগীতের তালবাদ্যযন্ত্র শেখার সামিল। এই ছন্দের দোলা বাদককে ও শ্রোতাকে অভিভূত করে বলেই মণিপুর কীর্তনে 'পুংশ্চলম্' বলে কতকগুলো খোলবাদ্যের একটা সমন্বয়-নৃত্য-সংগীতের প্রচলন আছে। সে খোলবাদ্য যৌথ নৃত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। খোলবাদ্যের আনুষঙ্গিক নৃত্যের উদ্ভব এর অন্তর্নিহিত দোলা থেকে। এই বিশ্লেষণ থেকে কতকটা প্রমাণিত হয় কীর্তনের একটি প্রধান সংগীত উপাদানের (তালবাদ্য) মূলে দীর্ঘ অনুশীলনের প্রয়োজন ও বিষয়বস্তুতে রাগসংগীতের মতই জটিলতা আছে। তা সত্ত্বেও, যন্ত্রের প্রকৃতি, ধ্বনি এবং বাদন-রীতির তারতম্যে এটা স্বতন্ত্র বিষয়।

লঘুসংগীতের রূপটা কীর্তনের প্রতি স্তবকে স্তবকেই স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়ে একটি বিশেষ কারণে। নিয়মিত দোহারের মুক্তকণ্ঠ সহযোগিতা এবং কাটানের হাল্কা, দ্রুতগতি গানে করতালের সহযোগিতায় গ্রাম বাংলার প্রকৃতিতে নিয়মিত ফিরে আসা। যেন কীর্তনীয়া জটিল রাগসংগীতের মত একটা মহাকাশে পরিভ্রমণ করে গ্রামবাংলার পৃথিবীতেই ফিরে আসেন। রাগসংগীতের গতি গভীর থেকে গভীরে, ফিরে আসার প্রশ্ন সেখানে নেই। তুলনায় রাগসংগীতে তারানা অথবা ঠুমরীর লগ্‌গী অংশ স্বস্তির নিঃশ্বাস মাত্র, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। রাগসংগীতের গানে এক ধরণের সূক্ষ্মতা, শিল্পবোধ, নিয়মবোধ আগাগোড়া বজায় রাখা সম্ভব, কিন্তু লীলা কীর্তনের বর্ণনাত্মক অংশ থেকে দোহারের সহযোগিতার শেষ স্তর পর্যন্ত যেন সহজ পন্থায় মনের অভাবনীয় মুক্তি। তালের গাঁথুনিটা সহজ এবং মুক্ত। ছন্দটা— একটা দোলা। রাগসংগীতে রাগ-বিস্তার এবং রাগ-সংরক্ষণেই বিশেষ নিয়ম। কিন্তু কীর্তনের বেলায় 'গ্রাম-রাগ' 'জাতি-রাগ' প্রভৃতি ব্যবহারের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও গানের রাগরূপ সংরক্ষণ ও ভাবগভীরতা সৃষ্টির কোন সুবিধা থাকা সম্ভব নয়। কারণ, গঠনটাই সে রকমের নয়। কীর্তনে শ্রোতাও যেন দোহার,

বক্তা ও শ্রোতা এক সঙ্গেই অংশ গ্রহণে উপস্থিত। রাগসংগীতের প্রথম সোপানেই আত্মতন্ময়তার প্রতি লক্ষ্য। ঠুমরী গান রসিকের উপস্থিতি মেনে নেয়, কিন্তু গঠন প্রকৃতিতে একই রাগসংগীতের নিয়ম-শৃঙ্খলা—তা যতই লঘু হোক না কেন। রাগ গাইবার জন্যে যে ধরণের কণ্ঠ সাধনার রেয়াজ আছে এবং 'কণ্ঠ বাদনের' জন্য রাগসংগীত গায়কের যে দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, কীর্তনের প্রসঙ্গে এরূপ প্রস্তুতির প্রশ্নই আসে না। কণ্ঠ কতকটা স্বাভাবিক ঐশ্বর্যের ওপর নির্ভরশীল, এটা শ্রেষ্ঠ পালাকীর্তন গায়কদের গান শুনেই বোঝা যেতে পারে। এজন্যে যদিও ধ্রুপদের রূপ কীর্তনকে যথেষ্ট পরিপুষ্টি দান করেছে, কীর্তন সেই রাগ-সংগীত প্রকৃতিকে সুসঙ্গত ও সর্বাঙ্গীণ রূপে বজায় রাখতে পারে না। বজায় রাখা এর প্রকৃতি নয়। তবু কীর্তনীয়ার রাগ-সংগীতের অভিজ্ঞতা চমকপ্রদ রস সৃষ্টি করতে পারে সন্দেহ নেই।

আখর, কাটান, ছন্দের বৈচিত্র্য, কথকতার প্রয়োগ, লোক-সংগীতের কণ্ঠভঙ্গি প্রয়োগ এবং যৌথভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে গাওয়ার জন্যে নাট-কায়দা ও নৃত্যছন্দ সহজেই এ গানকে লৌকিক রীতির কাছে ধরে রাখে, যেন একই গানে ধারাবাহিক ভাবে রাগ থেকে দেশী সংগীতের পরিবেশে নিয়মিত যাতায়াত। আজকাল রাগসংগীত-শিল্পীকে কীর্তন গান করতে দেখা যাচ্ছে এবং রাগসংগীতের শিল্পরূপদানের চেষ্টাও খুব নতুন নয়। কিছুকাল আগেও ঢপকীর্তনের প্রচলন ছিল, সেখানে বিশেষ অভিজ্ঞ গায়িকার কণ্ঠে রাগসংগীতের উপযুক্ত প্রচুর কারিগরিও শুনেছি। কীর্তনকে সংগীতের আসরে এনে উপস্থিত করতে হলে মূল পরিকল্পনায় রাগ-সংগীতের যে প্রয়োগ হয়েছিল তাকে যথাযথ রূপদান করা দরকার। শুধু তথ্যের দ্বারা এ প্রমাণ করা যায় না, যদিও বর্তমানেই রাগসংগীত প্রয়োগের নানারূপ চেষ্টা হচ্ছে বলে মনে করা যায়। পোষাকী গানে মৌলিক ভাব-তন্ময়তা সৃষ্টি সম্ভব কিনা বলা চলে না। রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডে একাধিক সাধা গলায় কীর্তন গানের প্রচার দেখা যায়, এই প্রচারে কীর্তন সংগীতরূপে অনেকটা এগিয়ে আসে। এ বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কথা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে কীর্তনীয়ার সুকণ্ঠের আধারটি প্রকাশক্ষম হলে এবং ভাব সৃষ্টির উপযোগী হলে শ্রোতার আর বিশেষ কোন দাবী থাকে না। রাগসংগীত এখানে যেন কতকটা বেশি বেশি। জনসাধারণের সঙ্গে কীর্তনের যে নাট্যসুলভ যোগ থাকে, রাগ-সংগীতের প্রয়োগ সেখানে স্বভাবত দুর্বল হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

একটি উক্তি শ্রীদিলীপকুমার রায় উদ্ধৃত করেছেন, "কীর্তনে সুরের কাজ কেন হবে না বলো দেখি? কণ্ঠ-সাধনায়, সুর-সাধনায় সিদ্ধগুণী কীর্তন গাইলে, তা আরও অপরূপ হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই।...আমার খুব দুঃখ হয় দেখে যে, সুরে অসিদ্ধ লোক কীর্তনে সুর সৃষ্টি করতে পাবে না বলে সেই অক্ষমতাকেই ধরা হয় কীর্তনের স্বকীয় সুর-বন্ধ্যাত্বের চরম প্রমাণ।" রাগভিত্তিক কীর্তন অনুশীলন করা হলে এর ফল কিরূপ দাঁড়াবে বলা যায় না। পালাগানের বাইরে আজকাল ভাঙা-কীর্তনের যে প্রচলন হয়েছে তাতে অনেক সুকণ্ঠে কীর্তন জনপ্রিয়তা লাভ করে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে মূল-কীর্তনের রূপ তাতে মিলে না। তা সত্ত্বেও আমরা গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত ভাঙা কীর্তন গান এবং রেডিওতে প্রচারিত নানা ধরণের কীর্তন অনুষ্ঠান জীবনধারার সঙ্গে কীর্তনকে যুক্ত রেখেছে বলে মনে করি। এ সব গান পোষাকী হলেও সংগীত-রসের দিকে সচেতনতা এখানে থাকা সম্ভব ও পালাকীর্তনের গায়ককেও আজকাল সুর-সচেতনতা চঞ্চল করে। কীর্তনের উদ্দেশ্য অচঞ্চল ভাবতন্ময়তার সৃষ্টি, সেজন্যে ভঙ্গিটি অকৃত্রিম হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে বর্তমানে শ্রোতার জন্যেই সংগীতাংশকে দুর্বল রাখা চলবে না। কারণ, বর্তমান শ্রোতা নাগরিক জীবনের দ্বারা প্রভাবিত। মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে দু-একজন কীর্তনীয়া অধিকতর নাট্য-রস এবং সুর প্রযোজনায় আধুনিক ভাবধারার প্রয়োগের চেষ্টা করছেন (যথা, শ্রীরথীন ঘোষ)। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রবীণতম জন-প্রচলিত প্রাচীন ধারার কীর্তনীয়াদের (যথা, শ্রীহরিদাস কর, শ্রীনন্দকিশোর, শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য, শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়) অনুসৃত গীতরীতির মান সংরক্ষিতই আছে। এখানকার আলোচনা সংগীতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হল। নবদ্বীপের মৌলিক গীতরীতি অথবা বৃন্দাবনের অপরিচিত ভক্ত কীর্তনীয়াদের মধ্যে, সাধারণের অজ্ঞাতে যে রত্ন-সম্ভার রয়েছে তা প্রচারের জন্য প্রকৃত সংগীত অনুশীলনের প্রয়োজন।

কীর্তনের সংগীতরূপ প্রকাশের একটি বিশিষ্ট কায়দাকে রবীন্দ্রনাথ সহজ যুক্তির পথে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। লোকগীতিতে কিংবা রাগ-সংগীতে এ দিকটি অনুপস্থিত—এটা কীর্তন গানের "নাট্যশক্তি"। তিনি বলেছেন, "ওর (কীর্তনের) মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোন সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি। তার মধ্যেই ওর শিকড়। কিন্তু শাখায়

ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে কীর্তন-সংগীতে। বাঙালার এই অনন্যতন্ত্রে আমি গৌরব অনুভব করি।" নাট্যশক্তি কথাটি কীর্তনের বিশিষ্ট ভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে। এই নাট্যশক্তির জন্যেই কীর্তন রাগসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয় না। একই সংগীতের সুরের ও ভাবপ্রকাশের ধারাবাহিকতায় বহু ঘটনামূলক ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি, সবটাই সংগীতের অঙ্গ নয়। কিছুটা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকথা। এই নাটকীয়তায় গায়ক ও শ্রোতা (দর্শকও বটে) একাকার হয়ে যায়। কীর্তন এবং বাউল দুইই দেখবার বস্তু। কীর্তনীয়াকে দেখা এবং তার নাটকীয় ভাবপ্রকাশে বিশ্বাস করা, অন্য দিকে বাউলের নৃত্যকে দেখা—দুয়ের মধ্যে যেন এদিক থেকে একটি সামঞ্জস্য আছে। এজন্যেই কীর্তনকে বলা হয়েছে "আলেখ্য শিল্প"। কীর্তন এজন্যে বিষয়বস্তুর নির্দেশনা মেনে চলে, তাই কীর্তনের মূলে বাণী-সাধনার প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কিন্তু একা বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের পুর্ণতা হয় না। এইজন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়। বাণীর পাশেই তার আসন।" এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য—নাট্যশক্তির প্রকাশ হয় "ধারা-বাহিকতার" মধ্য দিয়ে। কীর্তনে কাহিনী-অংশ প্রধান বা বিষয়বস্তু প্রধান বলে "এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যানে। এই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তন গান হয়ে ওঠে পালাগান।" রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত।—কিন্তু, এই রসলীলা নদীর স্রোতের মতো নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে বিচিত্র"। এই "বিচিত্র বাঁধাধরার পরিবর্তমান ক্রমিকতার" প্রকাশ হয় কথায় ও সুরে মিলিত ভাবে। তবু রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্য ব্যাখ্যা মূল্যবান। কীর্তনে উৎপত্তি "সাহিত্যের ভূমিতে", বিকাশ "নাট্যশক্তিতে" এবং প্রকাশ সম্মিলিত-কণ্ঠে। খুব সংক্ষেপে হলেও কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা দিগ্‌দর্শনের সহায়ক।

"নাট্যশক্তি" কথাটি তাৎপর্যমূলক ধরে নিয়ে দিলীপবাবু একটু এগিয়ে গিয়ে ইয়োরোপীয় অপেরার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, "অপেরা কোথায় পাবে আধ্যাত্মিক প্রেমের এ অফুরন্ত ঐশ্বর্য, সান্তের সঙ্গে অনন্তের এ অপরূপ সাযুজ্য-রহস্য, খাদহীন স্বার্থবিলোপে আত্মার পরমার্থলাভের এ অতৃপ্ত পিপাসা?—তবে এখানে একটা কথা ভুললে অপেরার প্রতি অবিচার করা হবে যে, আধ্যাত্মিকতা অপেরার লক্ষ্যই নয়—সে মূলত ঐহিক, দৈবিক নয়। তাছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে যে অপেরা হল ওদের দেশের সত্যবাদী জীবনের অভিব্যক্তি—যার গোড়াকার

কথা হল ব্যূহরচনা, দলগড়া—বহুসুরের, বহুযন্ত্রের, বহুকণ্ঠের : এক কথায়—অর্গ্যানিসেশনের। তাই অপেরা চেয়েছে—প্রাণশক্তির ঘাত প্রতিঘাতের কল্লোল, জনতার বহুমর্মর, হৃদয়ের অজস্র রূপব্যঞ্জনা—ধ্বনি-সমবায়, অপেরা চেয়েছে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য ও জনসঙ্ঘের আবেদনের মধ্য দিয়ে জাগতিক, মানবিক হাজারো বিরুদ্ধ গতির সুর-সামঞ্জস্য। কীর্তন চেয়েছে ঐকান্তিক ভাগবত প্রেম-প্রীতি, যদিও একটিমাত্র পথে নয়—হৃদয়াবেগের নানামুখী সংগীতে শাখায়িত হয়ে, পল্লবিত হয়ে, পুষ্পিত হয়ে : অভিমানে, সখ্যে, দাস্যে, পুজায়, বেদনায়, মৃদুহাস্যে, আনন্দে, বিরহে, মিলনে, অশ্রুতে—আধ্যাত্মিক নাট্যসংগীত হিসেবে তাই কীর্তনের দোসর নেই।" এই তাৎপর্য ব্যাখ্যা একসঙ্গে ইস্‌থেটিক এবং মূল প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

কিন্তু একটি কথা এক্ষেত্রে বাস্তব-অভিজ্ঞতার দিকে থেকে উল্লেখ করা দরকার। কীর্তনকে আমরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাভাষীদের কাছে ভাল করে বোঝাতে পারি নি। এক হিসাবে কীর্তনের গোড়াপত্তন হয়েছিল পুরীতে, উড়িষ্যায় এখনো ওড়িশী-কীর্তন প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলার পালাকীর্তনের অংশ-বিশেষকে দিল্লী অথবা অন্যান্য স্থলে সর্বজন-সমক্ষে পরিবেষণ করে দেখা গেছে—সংগীত-স্ফূর্তির অভাবেই হোক অথবা ভাষাবোধের অভাবেই হোক, ভাল লীলা-কীর্তনও সংগীত হিসেবে বহুসময়ব্যাপী ধারাবাহিক ভাবে পরিবেশিত হতে পারে নি। নাগরিকতার দাবীকে মেনে নিয়ে তাই কোন কোন শিল্পী আজ কীর্তনের নাট্যশক্তিতে ও পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত ভাবনা প্রয়োগ করে কতকটা অভাব মেটাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু মৌলিক উপাদানকে অবিকৃত রাখার প্রসঙ্গও সে ক্ষেত্রে অনেকের মনে জাগে। মৌলিক লীলা-কীর্তনকে অবিকৃত রেখে তাতে সুর প্রয়োগের চেষ্টাকে সমর্থন করি। কিন্তু খুশি মত স্বীয় আবিষ্কার বলে চালানো—ধিকৃত হতে বাধ্য।

ঐতিহাসিক বিচারে খেতুরির মহোৎসবের পর নরোত্তমদাসের পরিচালিত গানের রীতিটি গরাণহাটি রীতি বলে পরিচিত হয়। অনুরূপ কতকগুলো আঞ্চলিক রীতির পরিচয়ও পাওয়া যায়—যথা, কান্দরা গ্রামের আউলিয়া মনোহর দাস-কৃত মনোহরশাহী-গরাণহাটির সংমিশ্রিত রীতি। সপ্তগ্রামের রাণীহাটি পরগণার বিপ্রদাস ঘোষের উদ্ভাবিত রেণেটী-রীতি, মন্দারণের কোন স্থান থেকে উদ্ভাবিত মন্দারিণী এবং সেরগড় নিবাসী গোকুলানন্দ উদ্ভাবিত ঝাড়খণ্ডি রীতি। এইসব রীতি সম্বন্ধে দাবীদার থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ

বিশেষ লক্ষণ তেমনভাবে আজও স্বীকৃত নয়। কৌলীন্যের লক্ষণগুলো কণ্ঠের অথবা সংগীত-অনুশীলনের দুর্বলতার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক ধুয়ে মুছে একটি বিশেষ কীর্তন-জগতে বিলীন হয়েছে। একদিকে এটাও একটা আশার কথা ছিল যে স্বতন্ত্র রীতিগুলো একটি সত্তার মধ্যে মিলিতভাবে স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে। এই ইতিহাস থেকে এও বোঝা যাচ্ছে, লীলা-কীর্তনের মহত্ত্ব যতই ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, কীর্তনীয়ার সংগীত-শক্তির ওপর নির্ভরশীল না হলে প্রাচীন রূপকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। মনস্তাত্ত্বিক মাত্রেই বলবেন যে আজকের নাগরিকতাবাদী জীবন সংক্ষেপ ও সুমিষ্টত্বকেই স্থান দেবে।

কীর্তনের সুরের সঙ্গে বাঙালী-জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলেই, বাঙালীর পক্ষে কীর্তনের রসাস্বাদনের জন্যে কোন প্রস্তুতির দরকার হয় না। এক কথায় কৃষ্ণকে ঘরের-মানুষের মতো দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সহজ, কিন্তু রাধাভাবে সমস্ত জীবজগৎকে রাগানুগা ভক্তির পথে অনুপ্রাণিত করা সহজ নয়। বাঙালীর স্বকীয়তা এখানেই, ভাগবত-ধর্মের প্রবাহ তার মানস প্রস্তুতির পথ করে দিয়েছিল। কিন্তু এদিকটা বাদ দিলেও, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ-লুম-বেহাগ প্রভৃতি রাগের অংশবিশেষের ওপর নির্ভর করে গানের আখর থেকে কাটান পর্যন্ত পৌছনোর পদ্ধতিটা যেন ভক্তিভাবের ধারাবাহিকতায় মনটাকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করবার একটা সহজ কায়দা। সুরের প্রকাশভঙ্গি ও দোলা লক্ষ্য করবার মত। পালাগানকে ভেঙে ভেঙে অসংখ্য সুর বাংলা গানে ছড়িয়ে গেছে সকালবেলাকার প্রভাত ফেরির সুরও অত্যন্ত পরিচিত—কীর্তন-প্রভাবিত।

কিন্তু অবাঙালীর ও বিদেশীর কাছে কীর্তনের তত্ত্ববিশ্লেষণ সুষ্ঠুভাবে না হলে শ্রোতার মনে objective ধরণের ভাবনাটি কখনোই জাগতে পারবে না কীর্তনের মধ্যে আত্মবিলোপ করে কৃষ্ণকে নানাভাবে দীর্ঘ সময় ভরে হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা যেন একটি গতি বা process। সংগীতের সৌন্দর্য যদি এই গতিকে সজীব ও সতেজ করে তুলতে না পারে তবে কীর্তন ব্যর্থ হতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে কীর্তনের থিওরি আলোচনাও বৃথা।

শ্যামা-বিষয়ক গান

কীর্তনের দ্বারা প্রভাবিত আর এক শ্রেণীর গানের জন্যে সেকালে বাঙালী কান সজাগ ছিল। কারণ বোধহয় কীর্তনের জন্যে ভক্তিধর্মের যে মানস-প্রস্তুতি

দরকার, শ্যামা-বিষয়ক গানে সেরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্কের সহজ মানবিক আবেদনটার একটা গভীর আকর্ষণ বাংলার জনসমাজকে এই বিশেষ আধ্যাত্মিকতার দিকে টেনে এনেছিল। তান্ত্রিক ধর্ম চৈতন্যদেবের পূর্বেই প্রচারিত ছিল। চণ্ডীর গীত পূর্ব থেকেই গাওয়া হত—"মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।" "বিষহরির" গান, "মঙ্গলচণ্ডীর" গানে গ্রামীণ আসর ভরপুর থাকতো। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য নামসংকীর্তন এবং 'নগরকীর্তনের' বন্যা নিয়ে আসেন। পালাকীর্তন প্রচারিত হতে কিছুটা সময়ের দরকার হয়। চণ্ডীর গানের ধারাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। কীর্তনের সুরধারা যেমন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল তেমনি কীর্তনও লোকসংগীতকে বিশেষভাবেই অবলম্বন করেছিল, একথা জানা আছে। চণ্ডীর গানের লৌকিক ধারাটি বাৎসল্য-রসাশ্রিত উমা-সংগীত বা আগমনী গান এবং বিজয়ার গান। সংগীতের দিক থেকে এধারায় তেমন পরিবর্তন আসে নি বরং লোক-সংগীতের রূপটি অক্ষুন্ন থেকে গেছে। রামপ্রসাদও ভাবসাধনার মধ্য দিয়ে মানবিক ভাবপূর্ণ যে অনবদ্য উমাসংগীত রচনা করেছেন তাতেও লোকগীতির জানাশোনা সহজ সুরই ব্যবহৃত হয়েছে। "গিরি এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না," গানটি বৈষ্ণব অথবা শাক্ত ভিখিরি কিংবা গ্রাম্য উদাসী গায়কের মুখে নানা ভাবেই শোনা যায়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর সমসাময়িকতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

৺ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, রামপ্রসাদ বহুসংখ্যক সংগীত রচনা করে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি (দ্বিতীয় দশকে—জন্ম) শাক্তধর্ম ও শাক্ত সাহিত্যের নতুন দিক খুলে দিয়েছেন। "তিনি একদিকে যেমন মায়ের মহিমা প্রকাশ করিলেন—অন্যদিকে মায়ের জন্য সন্তানের আর্তিকে এমন ভাষা ও সুর দিলেন যাহা আমরা পূর্ববর্তী কোন সাহিত্যেই আর দেখি নাই।" এই আর্তি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বহু সংখ্যক শাক্তগীতিকারের মনের দুয়ার খুলে দিলে। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে অত্যন্ত মৌলিক পার্থক্য সত্বেও দুয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিল আছে। রামপ্রসাদ শক্তি-সংগীতের প্রথম কবি। সংগীত রচনার স্বতঃ উৎসারণে বৈষ্ণব পদাবলীর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই, কিন্তু সে ছিল প্রেরণার উৎস। বৈষ্ণব কবিতার প্রতিষ্ঠা মধুর রসে, প্রেমের মাধুর্যই সেখানে একমাত্র অবলম্বন—"বড় কথা লক্ষ্য করি এই শক্তি-সংগীতগুলির মধ্যে যখন দেখি যে শুধু বাহিরের সেই সৌন্দর্য বর্ণনায় নয়,দেবীর মূল পরিকল্পনা-

তেই দেবী মধুর রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। উমা সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই তিনি প্রথমাবধি মধুররস-আশ্রিতা।" ভয়ঙ্করীত্বের চরম নিদর্শন যে কালী, তাঁর মধ্যেও ভয়ঙ্করের সঙ্গে মধুরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে শাক্ত পদাবলীতে। "মাকে লইয়া বাংলাদেশের জনমনেরই এই মধুর রসের দিকে ঝোঁক।" উমার বৎসরান্তে স্বামিগৃহ কৈলাস ছেড়ে বাপের বাড়ি আসা, গণমানসের এই ভাবকে অবলম্বন করেই আগমনী-বিজয়া গান। ৺ ডঃ দাশগুপ্ত বিভিন্ন রচনার তুলনা করে দেখিয়েছেন বাংলায় অসুরনাশিনী চণ্ডী "স্নেহের দুলালী" হয়ে এসেছেন। এমনকি ভয়ঙ্কর কালী রূপ ভক্ত-হৃদয়ে ধারাবাহিক ভাবে কমলাকান্তের গানের রূপে রসঘন হয়ে এসেছে—

"মজিল মন-ভ্রমরা, কালীপদ-নীল কমলে।" শুধু নাই বৈষ্ণব কবির রূপানুরাগ, কালীর রূপানুরাগের সাধনায় রূপান্তরিত। কালী মূর্তিকে নতুন দৃষ্টিতে গ্রহণ, কালী বালিকা, কিশোরী, কখনো নবীনা যুবতী হিসেবে মূলাধারে অধিষ্ঠিত হয়ে, ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত শিবের সঙ্গে অভিসার করেন—কমলাকান্তের ভাবধারায় এই ভাবেই রূপায়িত। বৈষ্ণবপদাবলী আর শাক্তপদাবলীর গভীর মিল—বাৎসল্য রস বর্ণনায়।

যেন ব্যবধান মুছে গেছে। বৃন্দাবন বাংলা দেশের মাঠে ঘাটে শ্যামল অঞ্চলে, আর বাঙালীর চিত্তপ্রক্রিয়ায় গিরিরাজ ও নন্দরাজ এবং গিরিরাণী ও নন্দরাণীর আপোসে ভাব বিনিময় করছে।

"ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া স্নেহের দুলালী উমা। বাল্যলীলার বৈষ্ণব প্রকাশ গোষ্ঠলীলাতে' রামপ্রসাদের গিরিরাণী মেনকা হিমালয়কে ডেকে বলছেন

গিরিবর, আমি আর পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।"

পাশাপাশি কবিওয়ালার গান দিয়ে ৺ ডঃ দাশগুপ্ত চমৎকার বুঝিয়েছেন ঐক্য-সূত্র কোথায়। কিন্তু বাৎসল্য রসের বৈষ্ণব কবিতায় মায়ের সন্তানের প্রতি আর্কষণটাই বড়। শাক্ত-সাহিত্যে সন্তানের মায়ের প্রতি হাসি,অশ্রু,কৌতুক, অভিমানের উপলব্ধি। রামপ্রসাদে এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণতি।

কিন্তু শ্যামাসংগীতে আর একটি প্রসঙ্গ শ্মশান, মায়ের শ্মশানেই বাস। "অন্যত্র মায়ের আগমন নাই। তখন চলিল একটু একটু করিয়া নিজের হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত করিয়া মায়ের লীলাক্ষেত্র রচন' করিবার সাধনা। কামনা-বাসনা আসক্তিকে নিঃশেষে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া তাহাতে হৃদয়কে শ্মশান করিতে হয়—"এর ওপরেই সর্বশান্তিদায়িনী মায়ের চরণের স্থিতি।

কিন্তু অন্য প্রসংগে চণ্ডীপুজার যে বিরুদ্ধ ভাব শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাব প্রচারের ফলে প্রসার লাভ করেছিল, তা সম্পূর্ণ উৎপাটিত না হয়ে লীলারসের মধ্যে সামঞ্জস্যমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোথাও কালী কৃষ্ণরূপে অনুভূত, কোথাও কৃষ্ণ কালী সেজেছেন। কবিওয়ালা ও যাত্রাকারদের জন্যে সুরে ও সংগীতে এই সামঞ্জস্য আরোও বড় হয়ে পরিস্ফুট। গোড়ায় রামপ্রসাদের মনই এই সমন্বয়ের পথ তৈরী করেছিল—"যশোদা নাচত গো বলে নীলমণি। সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী।" পরবর্তী কালের রচয়িতাদের মধ্যে এই রূপ-সমন্বয় আরো স্পষ্ট।

কিন্তু ৺ডঃ দাশগুপ্ত বলেছেন, প্রসঙ্গত শাক্ত পদাবলী মানে এগুলো পদাবলী নয়, সত্যিকার গান বা শাক্ত-সংগীত। "শাক্ত পদাবলীর এই গীতি-কবিতার দিক্ অতি অপ্রধান।"

দ্বিতীয়ত, শাক্ত-সংগীতগুলি মূলত সাধন-সংগীত। "কিন্তু সব বৈষ্ণব-কবিতার প্রেরণাই মূলত একটা সাধন-প্রেরণা, এমন কথা বলিতে পারি না।" লীলাসংগীত তা নয়। বৈষ্ণব প্রার্থনার পদগুলো ছাড়া সাধনার দিক কোথাও প্রত্যক্ষ নয়। তাছাড়া বৈষ্ণব সমাজের গানগুলো একটি গোষ্ঠী চেতনার স্ফূর্তিরূপে বিকাশ লাভ করে, কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে সাধনার দিক মুখ্য।

"শক্তি-গানগুলিকেও আবার দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা-গীতি ও বিশুদ্ধ-সাধন গীতি। আগমনী বিজয়া-সংগীতগুলি মুখ্য ভাবে লীলাগীতি।" এগুলিতেও সাধনার দিক্ আছে।... ... .বাংলা ধর্ম-সংগীতের ক্ষেত্রে শাক্তপদাবলী প্রবর্তক রামপ্রসাদের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে।......রামপ্রসাদের মাতৃ-বিশ্বাস কোন গোষ্ঠী-চেতনালব্ধ জিনিস নহে; রূঢ় বাস্তব জীবনের অগ্নিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে। জীবন-জিজ্ঞাসা-জনিত ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টি-পাথরে ইহার সারবত্তা বার বার পরীক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বাঁচিবার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই মা নামে অটল থাকিতে হইয়াছে। রামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ গানে দেখিতে পাই, জীবনের দুঃখ লইয়া রামপ্রসাদ মাকে রীতিমত 'চ্যালেঞ্জ' দিতেছেন—

আমি কি দুখেরে ডরাই
দুখে দুখে জন্ম গেল
আর কত দুখ দেও দেখি তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে
আমি করি দুখের বড়াই।"

বর্তমানে এই পর্যন্তই তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ। ৺ ডঃ দাশগুপ্ত বলেছেন, "বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে বাস্তব-জীবন-জিজ্ঞাসা-জনিত সংশয় বার বার উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে।" এই জীবন-জিজ্ঞাসার ভাষাও সাধারণ ব্যবহারিক ভাষা, বস্তুও প্রত্যক্ষ—তালুক-জমিদারি, বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমা, লেন-দেন, দলিল-দস্তাবেজ, ঋণ-বন্ধক, নায়েব-তশিলদার, ব্যাপারী ব্যবসায়ী, কলু-কৃষক-কাহারই সংগীতের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

৺ ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের আলোচনা থেকে একথাই বুঝতে পারা যায় যে সংগীত হিসেবে রচিত শাক্ত পদ সহজভাবেই জীবন অবলম্বন করে এযুগে গড়িয়ে এসেছে এবং কোথাও বাধা পায় নি। গানের বিষয়বস্তুতে যা আছে তাতে ভক্ত সংসারত্যাগী নয়, সংসারের খুঁটিনাটির মধ্যে থেকেই মাতৃ-উপলব্ধির আবেগ প্রকাশ করছে। গানের মধ্যে ভোগের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক-বৈচিত্র্যে যে চমকপ্রদ রসিকতা ও সহজ কৌশল সৃষ্টি করে রামপ্রসাদ পথ বেঁধে দিয়েছেন, তাতে জীবন-নির্ভর কথা সহজে সুরের মধ্যে গড়িয়ে এসে পড়েছে। কথাগুলো ততোধিক সহজ। শব্দগুলোকে যেন বাজিয়ে বাজিয়ে গাঁথা হয়েছে, কারণ বিষয়বস্তুকে চোখে দেখে প্রত্যক্ষ অনুভবের রূপ দেওয়া হয়েছে। ছেলের ব্যক্তিগত ভাবজীবনের সঙ্গে নানান হিসেব-নিকেশের দৈনন্দিন সম্পর্কের কথা কৃষ্ণ-প্রেমের রোমান্টিক রূপকের চেয়েও সহজ মনে হয়। তা ছাড়া গানটি একলার গান, ...র নয়—যৌথ ন...—বিধিবদ্ধ নয়। শ্যামা-সংগীতে সুরের পথ কেউ কখনো বাতলে দেয় ...৷ ...শ্বর মিত্র বলেছেন, প্রসাদী গানে কিছুটা বাউল ঢংএর পরিচয় আছে কিন্তু রাগসংগীতের প্রভাবও এখানে নেহাৎ কম নয়। রামপ্রসাদের গানে প্রধান সুর হচ্ছে ঝিঁঝিটি-লুম। এর ফলে ইচ্ছে করলে খাম্বাজী-রূপ বহু বিচিত্রভাবে রাগসংগীত-ধরণে খেলিয়ে গাওয়া যায়। বস্তুত এভাবেরই একটা চাল প্রচলিত আছে।

কীর্তনের সঙ্গে তুলনা করলে সুরের মধ্যে ভাবের বাহিকা অংশটি বেশ বড়সড়, কাহিনীর বিস্তার না হলে কীর্তন কল্পনা করা যায় না—পথটাও বেঁধে দেওয়া। পথটি বাঁধা বলেই আজও পালাকীর্তনের নতুন রচনা চলে কিনা বলা যায় না, অতীত রচনার দিকেই আমরা চেয়ে থাকি, কিন্তু আজও শ্যামা-সংগীত মুক্তভাবে রচিত হয় এবং তাতে রাগের রূপ ফুটিয়ে তোলবারও একটা ঐতিহ্য সহজভাবে গড়ে উঠেছে, যদিও শ্যামা বিষয়ক লৌকিক গানও

চালু আছে। রামপ্রসাদী সংগীতের বিখ্যাত কাফি-সিন্ধুতে গাওয়া 'এমন দিন কি হবে তারা' অনেকেই এখনো মনে রাখেন, যদিও এধরণের ভঙ্গি আজ আর তেমন ভাবে চলিত নেই। তিরিশ দশকের পূর্বে গাওয়া শ্রীদিলীপ-কুমার রায়ের গাওয়া "মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিল তোর পায়" গানটি আর একটি উদাহরণ। আধুনিক যুগেও অনেকেই শ্যামা-সংগীত রচনায় হাত দিয়েছেন। এর মধ্যে গম্ভীর ভাবদ্যোতক সহজ মাতৃপ্রেমের উৎস নজরুলের মূল্যবান রচনার যোগান দিয়েছিল একথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া উনবিংশ শতকে মাতৃপ্রেমের সঙ্গে দেশাত্মপ্রেমের ঐক্যবোধের একটা রূপক শ্যামাসংগীতের মাধ্যমে জীবনে এসেছিল ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সে বিষয়ের সুন্দর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে শ্যামাসংগীতের মৌলিক ধারাটি অনুসরণ করে কবিওয়ালা, নাট্যকার, যাত্রাকার এবং উনবিংশ শতকের কবি ও গায়ক মাত্রই শ্যামাসংগীত সৃষ্টিতে হাত দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে যখন বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে নানান কৃত্রিমতা এসেছে, হাফ-আখড়াই ও খেউড়ে সংগীত জীবনের চটুল প্রকাশ চলেছে, এবং অন্যদিকে সংস্কৃতিবান সমাজ ব্রহ্ম-সংগীত রচনায় মন দিয়েছেন, তখন কীর্তনের পরিবেশ পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে গ্রামবাংলার অভ্যন্তরে, কিন্তু শ্যামা-সংগীতের লৌকিকরীতি এবং অপেক্ষাকৃত রাগসংগীত-নির্ভর রীতি দুয়েরই রচনা ও প্রচার চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব এই গম্ভীর পরিবেশকে সজীব করে রাখার একটি বিশেষ কারণ বলা যেতে পারে।

কিন্তু রাগসংগীতের প্রভাবের কথা আর একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। রামপ্রসাদের গানের মধ্যে কতকগুলো রচনা গোড়া থেকেই কালেংড়া, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতি সুরে রচিত ছিল বলে মনে করা যায়। খাম্বাজ-অবলম্বিত সুরের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পরবর্তী কালের কমলাকান্তের রচনায়ও রাগের রূপ কতকগুলো গানে বিধৃত ছিল। এবং মৌলিক রাগ প্রয়োগ এর বৈশিষ্ট্য না থাকলে আজ পর্যন্ত কয়েকটি গানও সেই সুরেই ধরা পড়ত না, পরবর্তী প্রয়োগের ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় কি না সে সম্বন্ধে আমাদের মাথাব্যথা নেই। গানে রাগ পরিকল্পনা ও তাকে বজায় রাখার একটা আইডিয়া নিতান্ত বাস্তব ঘটনা। কিন্তু, এ কয়েকটি রাগ কি ভাবে গানের মধ্যে রূপলাভ করতো? ধ্রুপদীআনা তাল ও গম্ভীর-ভাবদ্যোতক রাগের

সঙ্গে মাতৃভাবের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। এদিকটাতে অন্ধকার উদ্‌ঘাটিত করতে চেষ্টা না করে অন্য একটি প্রধান লক্ষণের কথা বলছি। বাঙালীর কণ্ঠে সেকালে এক প্রকারের ধীরগতি তান স্বাভাবিক ভাবেই স্ফুরিত হত একথা পুর্বেও উল্লেখ করা গেছে। একটু সীমিত পরিসরের মধ্যে সহজভাবে ভাল গিটকারিও ফিরত। শ্যামা-সংগীতে এই টপ্পাভঙ্গির গিটকারীর সহজ প্রচলন হয়। প্রয়োগের কারণও স্পষ্ট। ভাবগম্ভীর অথবা সহজ গানেও কীর্তনের মত নাট্য-প্রবাহ নেই। সেজন্যে কিছু কিছু শ্যামাসংগীতের রূপ অনেকটা বৈঠকী গানের মত। তাতে খাম্বাজ, ভৈরবী, ও কাফিঠাটের রাগ প্রয়োগেরও সুবিধে হয়। একাজ সুরু হয় নিধুবাবুর কল্যাণে এবং কবিওয়ালাদের আসরে। নতুন নতুন ছন্দে নতুন নতুন রূপ ধরা পড়ল, হৃদিকমলে যেন সত্যিই বড় ধুম লেগে গেল। একদিকে গিটকারীর প্রকাশ যেমন সহজে টপ্পা ভঙ্গিকে শ্যামাসংগীতে টেনে এনেছে, তেমনি অন্যদিকে ভারি ছন্দের গান এবং অনুরূপ রাগও অবলম্বন করা হয়েছে। ধারাটি আজও সমভাবে বয়ে এসেছে, বৈচিত্র্যের পথও খোঁজা হচ্ছে।

সবশেষে একটি কথা উল্লেখ করছি, প্রসাদী গানের অনাবিল ভাবরস গ্রামোফোন রেকর্ডে ভবানী দাসের কণ্ঠে যা রক্ষিত হয়েছে তাকে অনেকটাই অকৃত্রিম এবং সুন্দর বলা চলে। এদ্বারা একথা বলছি না যে আমরাও revivalist হয়ে (শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর ভাষায়) ভবানী দাসের গানের রীতিতে ফিরে যাব। আমি নতুন প্রযোজনায় বিশ্বাসী। জনসাধারণের কাছে পান্নালাল ভট্টাচার্যের গান প্রিয় হয়েছিল। নতুন প্রযোজনায় হয়ত আরও সুন্দর পরিকল্পনা হবে, বিশ্বাস করি।

ভজন

ভজন নামক কোন বিশিষ্ট গানের প্রচার বাংলায় ছিল না। ছিল বৈষ্ণব কবিতায়। অর্থাৎ পদাবলীতে কিছু কিছু ভজনের সামিল পদ আছে। এসব গান প্রার্থনামূলক কখনো কখনো ভজনরূপে গাওয়া হয়। কিন্তু সমগ্র উত্তর ভারতময়—বিশেষ করে রাজস্থান ও মারাঠা রাজ্যের ভজন যেরূপে গাওয়া হয় এবং যেভাবে ভজনের প্রচলন হয়েছে, সংগীতের সেই রূপটি লক্ষ্য করেই একথা বলা যায়। বাংলায় এসব গান কীর্তনাঙ্গ ছিল। এশতকের ত্রিশ দশকের পুর্বেই ৺ক্ষিতিমোহন সেন মীরা, কবীর, দাদূ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পরে পরে কিছু কিছু গানের স্বরলিপি পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করেন (বিচিত্রায়)। শ্রীদিলীপকুমার রায় অনুবাদ গান করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে মীরার ভজনে সুর সংযোজনা করে ব্যাপকভাবে চালু করা হয়। পরবর্তীকালে এ গানের প্রসার বাড়ে। আজকাল হিন্দী ভজনের সুর নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে—সুরসংযোজনার ক্ষেত্রে অন্যান্য গানের চেয়েও ভজন, বিশেষভাবে সংগীতের আসরে এসে পৌঁছে গেছে। তাছাড়া ভজন গানের ছন্দভঙ্গি নানাভাবে বাংলার নতুন ধর্মীয় গান রচনা বা সুরসংযোজনাকে প্রভাবিত করেছে। সংগীত হিসেবে ব্রহ্মসংগীত সম্বন্ধে স্বতন্ত্র করে বলবার কিছু নেই। এর অধিকাংশ গান রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে গাওয়া হয় এবং এসম্বন্ধে বক্তব্য রবীন্দ্রসংগীত থেকে বিশেষ স্বতন্ত্র নয়।

ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদ

কণ্ঠ

কণ্ঠ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা

বর্তমান লঘুসংগীতের জন্যে কণ্ঠের শ্রেণীবিভাগের দরকার। নানান প্রয়োগ-কৌশল ও গলা ব্যবহারের কায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে বর্তমান সংগীতের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছু বলা যায় না। রাগ-সংগীতে গলাসাধা ও অভ্যাসের ধারা প্রচলিত আছে—তাতে স্বরাভ্যাস, স্বরযোজনার চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। কণ্ঠ-সাধনার অর্থ সারগম সম্বন্ধে অধিকার অর্জন। স্বর-পরিচয় সংগীতের প্রথম সোপান। গলা তৈরি করবার বিশিষ্ট পদ্ধতি শিক্ষকদের আয়ত্ত করা কর্তব্য এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ প্রয়োগ দরকার। যথা—কোন কোন গলায় চূর্ণস্বরের প্রাচুর্য স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, কোন কণ্ঠে তা মোটেও থাকে না, কোন কণ্ঠ সহজেই মোড় ফেরে, কোন কণ্ঠ অস্বাভাবিক ভারি ও গভীর শব্দ উৎপাদক, কোন কণ্ঠ অত্যন্ত হাল্কা ও মৃদু, কোন কণ্ঠে কম্পনের আতিশয্য সহজভাবেই থাকে। এই কণ্ঠগুলোকে বুঝে নিয়ে সাধনের জন্য উপযুক্ত পন্থা বাৎলানোর উল্লেখ করা হচ্ছে, সকলের জন্যেই একটি মাত্র সিধা রাস্তা নয়। অথচ প্রাথমিক অভ্যাসের পন্থায় কোন শর্টকাট বা মেড্ ইজি নেই। রাগসংগীতের সাধন পদ্ধতির কায়দাগুলি এই সব রকমের গলাগুলোকে একপথেই পরিচালিত করে দেয়। কিন্তু স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি লঘুসংগীতে কণ্ঠকে বিভিন্ন গানের সুরের জন্য উপযুক্ত করা দরকার। গলার গুণ ও প্রকৃতি হিসেবে প্রয়োগবিধি স্বতন্ত্র।

সংগীতে জন্মগত-অধিকার বা 'প্রডিজির' জন্মও চোখে পড়ে। কিন্তু সব প্রডিজিই শেষ পর্যন্ত বিশেষ সুসিদ্ধ শিল্পীতে পরিণত হতে পারে না, এরূপ ধারণা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জন্মেছে। এর কারণ যে সব গুণ কণ্ঠের ভিত্তিভূমি তৈরি করে এবং পরে শিল্পীর মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগিয়ে তোলে সেই সব বীজ প্রথম অবস্থায়ই 'প্রডিজির' কণ্ঠে উপ্ত হওয়া চাই। অর্থাৎ অভ্যাস এবং গোড়ার নিয়মিত শিক্ষা ছাড়া হঠাৎ একদিনে রাগ-সংগীত শিল্পী হওয়ার কোন পন্থা স্বীকৃত নয়। পচা নন্দী নামে আমাদের ছেলেবেলাকার পূর্বযুগের

একটি গায়কের নাম জানা আছে। ইনি প্রথমে ছেলেবেলায় যাত্রা দলের গাইয়ে ছিলেন, পরে সেকালে জহরাবাই আগ্রাওয়ালীর রেকর্ডের গান এবং অন্যান্য বহু প্রচলিত গান শুনে শুনে তালের কঠিন লুকোচুরির কায়দা আয়ত্ত করে একধরণের আসর মাতানো গান তাঁকে গাইতে শুনেছি। শিক্ষার বালাই ছিল না, কণ্ঠকে কৌশলী খেলোয়াড়ের মতো খেলিয়ে রসসৃষ্টি করতে পারতেন। যে ভাবে আমরা খেয়াল-টপ্পা-ঠুমরী বুঝে নিই, সেভাবে এঁর গান গ্রহণ করা যেত না। কিন্তু, আসর অধিকার করবার ক্ষমতায় তিনি বহুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'প্রভিজি' শেষ পর্যন্ত একটি বিশিষ্ট স্তরে পৌছাতে পারে, কিন্তু বিশেষ হতে পারে কিনা সন্দেহ। অভাবটি হচ্ছে, গোড়াকার সর্বরূপ শিক্ষার সঙ্গে শিল্পবোধির জাগরণ স্তরে স্তরে না হওয়া। এই ধারণাটি কোন কোন ক্ষেত্রে অসংগত মনে হতেও পারে। কোন কোন কণ্ঠ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে বাজি মাৎ করে দেওয়া অবস্থায় পৌছয়, বিশেষ করে লঘু সংগীতে। গ্রামোফোন রেকর্ডে এক একটি গলা আকস্মিক ধরা পড়ে যায় চমকপ্রদ হয়ে। কিন্তু একথা সত্য, কণ্ঠের অমিত মাধুর্য সত্ত্বেও সে শিল্পীর জন্যে আবিষ্কার ও চিন্তার বৃহৎ জগৎ সামনে থেকে যায়, শুধু সুরকারের সহযোগিতায় শিল্পী শ্রেষ্ঠ আসন পেয়ে যায় একথা বলা চলে না। আধুনিক যুগের বহু সুকণ্ঠ প্রথমে এভাবেই ধরা পড়েছিল, কিন্তু অনেকেই বুদ্ধি ও অভ্যাসের দুয়ার খোলা রেখে এগিয়ে এসেছে।

সংগীত শাস্ত্রে "অভ্যাস ছাড়াই অস্বাভাবিক প্রতিভাবলে রাগ-অভিব্যক্তি" করবার ক্ষমতাকে "শারীর" বলা হয়। কিন্তু এরূপ "শারীর" বা অস্বাভাবিক-প্রতিভাও ক্রমবিকাশের অপেক্ষায় থাকে। অর্থাৎ, শুধু কণ্ঠ, গায়ন-শক্তি অথবা অন্য কোন আকর্ষণী-শক্তিই সব নয়—শিল্পীর মন, বুদ্ধি এবং চেতনার সর্বাঙ্গীণ ক্রমবিকাশের জন্যে প্রস্তুতি দরকার। সাধারণ কণ্ঠের জন্যে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তারও অতিরিক্ত কতকগুলো পন্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। কণ্ঠের ক্রমবিকাশের পন্থা নির্ধারণ, শক্তির সীমা নিরূপণ, অভ্যাসের জন্যে অনুরূপ ব্যবস্থার কথা বলছি। কারণ প্রত্যেকটি কণ্ঠই অন্য কণ্ঠ থেকে স্বতন্ত্র। কণ্ঠকে সুশৃঙ্খল অভ্যাসে সুসংহত ও ক্ষমতাপন্ন না করেই সংগীত সৃষ্টির বা গান গাইবার এবং শিল্পিত্ব দাবি করবার প্রবণতা দেখা যায়। এজন্যে বহু গুণের বিকাশ হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ফল কি দাঁড়ায় পরে আলোচনা করা হবে।

কণ্ঠের প্রকৃতি অনেকটাই অনুকরণশীল। অর্থাৎ কণ্ঠের অধিকারীর মধ্যে

বিশিষ্ট ধরণের প্রবণতা থাকে, এবং সেই প্রবণতার দরুণ এক একটি বিশিষ্ট ধরণের গানের প্রভাবে এমনি ছাপ থেকে যায় যে অবিকল ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্রের মত মনে হতে পারে। এমনও দেখা যায় যে শিক্ষা গ্রহণ না করেও বহু কণ্ঠ অন্য কণ্ঠের ছাপ নিয়ে নেয়। রাগসংগীতে ওস্তাদের গানের প্রতিচ্ছবি—এমনকি কাশিটিও—প্রতিবিম্বিত হওয়ার কারণ ছাত্রদের মৌলিক কণ্ঠপ্রকৃতির বিকাশ না হওয়া। শিষ্য-ছাত্রদের মৌলিক কণ্ঠ-প্রবণতা আবিষ্কার না করে তাকে অভ্যাস করানো এবং সংগীত সম্বন্ধে তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি জাগ্রত করার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করা অধিকাংশ ওস্তাদের রীতি ছিল। "মেরে সাথ গাও" কিংবা "পাল্টা সাধো" ছিল তাঁদের গোড়ার উপদেশ। (পাল্টা শব্দটির অর্থ হচ্চে সারগমের উত্থান পতনের নানা ফর্মূলা।) এজন্যে রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ছাত্র অথবা শিষ্যদল নকল প্রতিচ্ছবি মাত্র হয়ে পড়ত, তাদের ভেতরকার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কণ্ঠের সঙ্গে সমান্তরালভাবে হত না। মনে রাখতে হবে, যে শিক্ষা অধিকাংশ কণ্ঠের মৌলিকতাকে উপযুক্ত ভাবে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে, সে শিক্ষাই শিল্পী সৃষ্টির সহায়ক।

অনুকরণ—অভ্যাস—মৌলিকতা

জনৈক সাহিত্য-রসিক কিছুদিন আগে লিখেছিলেন যে গান শুনতে গিয়ে কোন এক সভা থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন কারণ, মাইক্রোফোন বন্ধ থাকায় খুব কাছে থেকেও কণ্ঠ শোনা যায় নি, এবং সংগীতের আসরে কণ্ঠের মধ্যে এমন কোন গভীরতা শুনতে পান নি, যা মনের মধ্যে ছাপ রেখে যেতে পারে। এ অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কণ্ঠ ও ভঙ্গি নকলের কথা আগেই বলেছি। লঘুসংগীতে অন্য কণ্ঠের নির্বিচার অনুকরণপ্রিয়তায় গায়কের দুর্বলতা এত সহজভাবে প্রতিফলিত হয় যে, গায়ক সম্বন্ধে বিরক্তি আসে এবং গানের কোন রূপ মনে থাকে না। অর্থাৎ মৌলিক গান গাইবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও অনুকরণের জন্যে যে ফল হয় তাই উল্লেখ করা গেল। মুক্ত ও গভীর স্বর-উৎপাদনের পথ বর্জন করে, মৌলিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করে, বহু গলাকে যন্ত্রের সহযোগিতায় ক্ষীণ ও মোলায়েম করতে চেষ্টা করতে দেখা যায়। কায়দাটি হয় গলার পক্ষে কৃত্রিম। লঘুসংগীতে বহু গুণী গায়ককেও এভাবে একটা যান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করতে দেখা যায়। অসংযত কম্পন ও অনুরূপ অলঙ্কার শিল্পীদের কণ্ঠের ত্রুটি, কিন্তু এই ত্রুটি সম্বন্ধে

শ্রোতা অবহিত না থাকায়, সে সবও গানের মধ্যে চলে যায়। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিকর হয় যখন এইসব ত্রুটিগুলোও অনুসৃত হয়।

বর্তমান লোকপ্রচলিত লঘু সংগীতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে দুর্বলতা নানা ভাবে প্রবেশ করে বাংলা গানের সংগীত এবং সংগীত-শিক্ষাকে মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে তার কারণ কণ্ঠ-অনুশীলনের অজ্ঞতা অথবা পদ্ধতিহীনতা। কণ্ঠকে পরীক্ষা করে উপযুক্ত পরিচর্যা করা শিক্ষকের কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে পন্থাও আমাদের জানা নেই। আমরা সাধাগলা বলতে বিশিষ্ট ধরণের কণ্ঠ বুঝি যার প্রবেশাধিকার লঘুসংগীতে আছে কিনা বিচার্য। অন্ততঃ সাধাগলা পারতপক্ষে শুধুমাত্র কথার আবৃত্তিমূলক গান করতে চাইবে না। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই রাগসংগীতের গায়ক আপন রীতি অনুসরণ করে রাগসংগীত থেকে দূরে সরে থাকেন। অর্থাৎ সুকণ্ঠ গায়কের সংখ্যার যেমন অভাব দেখা দিচ্ছে শিক্ষা দেবার পন্থায় তেমন সুন্দর রীতি উদ্ভাবিত হচ্ছে না। অথচ লোক সমাজে সংগীত অনুশীলনের প্রচেষ্টার অভাব নেই। সংগীত-শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা শিক্ষার পংক্তিভুক্ত হয়েছে।

আজকাল লঘু সংগীতের বেলায়ই দুর্বলতার কথা বেশি আসে। মোলায়েম কণ্ঠে কয়েকটি বিশেষ ধরণের গানের মধ্যে বিশেষ ধরণের দুর্বলতা আরও স্পষ্ট হয়। অনেক সময়ে ক্রমাগত কয়েকটি গান শোনবার পর হয়ত মনে হতে পারে রবীন্দ্রসংগীতের মতো বিশিষ্ট সংগীত মোলায়েম অথবা দুর্বল কণ্ঠেই হয়। যদিচ রবীন্দ্রনাথ গানে বিশিষ্ট ভঙ্গি সৃষ্টি করে গলাকে নিরলঙ্কার করে নিয়েছেন, তিনি কণ্ঠ-প্রকৃতির দুর্বলতাকে কখনো স্বীকার করেন নি। পল্লীগীতির গলা স্বতঃস্ফূর্ত। গলার চর্চা সেখানে অনুপস্থিত থাকে। সাধা গলার দরকার নেই। অমার্জিত কণ্ঠই স্বাভাবিক আবেদন সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই পল্লীগীতি যখন শচীনদেববর্মনের কণ্ঠে শোনা যায় তখন প্রশ্ন আসে সত্যি কি কণ্ঠটাই বাধা না ভঙ্গিটা? কারণ এ কণ্ঠে পল্লীগীতি স্বতন্ত্র রস মিলে। কণ্ঠ বা গানের গলা সম্বন্ধে এমনি করে লঘুসংগীতের নানান পরিবেশনে আমাদের মনে বহু প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। একথা সত্য যে সহজ জিনিষটা সহজ নয়। এবং সহজ সুডোল কণ্ঠের মাধুর্য মণ্ডিত গান আরো দুর্লভ, কারণ সহজভাবে কণ্ঠ-পরিচালনা-শক্তি অর্জন করা দরকার। স্বাভাবিক বলে কোন শক্তি সংগীত-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না, যুক্তিগ্রাহ্যও নহে। হতে পারে এমন কোন অলৌকিক শক্তি হয়ত আছে। কিন্তু শিল্পের গঠনে অলৌকিকতার স্থান নেই,

আর কোন শিল্পকর্মই যাদুবিদ্যার মত ক্ষমতার ফসল নয়। স্রষ্টার মন সর্বদাই একটি কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়েই উৎরায় তা সে যেমনই হোক। যা বলছিলাম—কণ্ঠের পরিচালন শক্তি অর্জনের কথা। দুর্বলতা কণ্ঠের একটি সমস্যা। কণ্ঠকে সচল করে অধিকতর উপযুক্ততা অর্জনের পথ-নির্দেশ দানও সমস্যা। আজকাল ত্রুটি এড়াবার জন্যে চাপা গলায় গানের একটি পন্থা প্রচলিত আছে যেমনি মুক্ত-কণ্ঠ বা উদাত্ত-কণ্ঠ গায়কের অভাবও বেশি। লঘুসংগীতে যান্ত্রিক সাহায্যের দোহাই দিয়ে অনেকে কণ্ঠের সঙ্কুচিত স্বরকে সমর্থন করেন। এই সমর্থনের ফলে মাইক্রোফোনের গানই চালু হয়। অন্যদিকে কণ্ঠ স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অনুকরণের পন্থাতে আজকাল গানে আবৃত্তির প্রভাবও প্রচুর।

সাধারণ আলোচনায় সংগীতের কথা প্রসঙ্গে এবং পত্র পত্রিকার প্রবন্ধাদিতে এসব সমস্যার উল্লেখ বেশি দেখা যায় না। কারণ, কতকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লক্ষ্য না করলে গানের গলা সম্বন্ধে তেমন কোন সফল ধারণাও জন্মায় না। আমরা জানি, যে কোন কারণেই হোক গলার এক্সারসাইজ বা সাধনা না হলে সংগীত সার্থক হয় না। কারণ, সংগীতের অর্থ সুরের সরস ও সপ্রতিভ প্রয়োগ, তা স্বতঃস্ফূর্ত গলাতেই হোক অথবা অনুশীলন করা কণ্ঠেই হোক। অনুশীলন ছাড়া শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়। লঘু সংগীত শিক্ষায় ঔপপত্তিক সংগীতের পরিচয়, রাগবোধ প্রয়োজন। প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তুতি সকল প্রকার সংগীতের জন্যেই দরকার। আমাদের মেলডি-প্রধান গানের প্রধান লক্ষণ—স্বরের সঙ্গে স্বরের ক্রমান্বয় সম্পর্ক রক্ষা করে দ্রুত অথবা ধীর গতিতে উত্থান পতন। ধীর অথবা দ্রুত গতি অভ্যাস এবং ক্রম-সম্পর্ক রক্ষা করতে প্রতিটি স্বর সুশ্রাব্য সুরে ও স্পষ্ট হয়ে সহজভাবে কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্চে কিনা—প্রাথমিক অভ্যাসের মূল লক্ষ্য এটাই। কিন্তু, লঘুসংগীতের উপযুক্ত কণ্ঠ সঞ্চালনের জন্য উপযুক্ত এক্সারসাইজ অর্থাৎ পরিমার্জনা বিধি ও প্রয়োগ ক্রিয়ার প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নি বলে মনে করি। গলা বিকশিত হতে না হতেই যন্ত্র সহযোগিতার লক্ষ্য এসে ভিড় করে, যান্ত্রিক ফাঁকি গানের প্রাণশক্তিকে নষ্ট করে দেয়। সুখ-শ্রাব্য ইঙ্গিতময় হাল্কা ভঙ্গির গানের প্রতি সাধারণ শ্রোতার আকর্ষণ অতি স্পষ্ট। সিনেমার হাল্কা গান অনুসরণ করেন জনসাধারণ—এটা দোষের নয়, এ হচ্চে সংগীতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত বৃত্তির উদ্ভাবন। কিন্তু সে ধরণের গানই যদি সহজস্ফূর্ত গলার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তা হলে কণ্ঠের রূপ পরিস্ফুট হতে পারে না।

মনে রাখা দরকার ভঙ্গি ও রূপের নিছক অনুকরণ প্রকৃত সংগীতের বাধা স্বরূপ। অথচ কণ্ঠ মনোরঞ্জনের ইচ্ছেয় সহজ বিষয়কেই অবলম্বন করে।

সহজ ভাবে কণ্ঠকে সজীব ও শক্তি-সম্পন্ন করে তুলতে হলে শুধু সারগম্ অভ্যাসেরই যে প্রয়োজন তা বলছি না। আমার মনের হয় লঘুসংগীতের পন্থা একটু স্বতন্ত্র হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের একটি ধ্রুপদ-ভঙ্গিম সহজ গান অথবা অন্য কোন রচনার মধ্যে যেখানে দু একটি অলঙ্কারের প্রয়োগও আছে, এমন গানকে অতি ধীর লয়ে পুরো দম রেখে রেখে প্রতি স্বরের ওপর যতি প্রয়োগ করে স্পষ্ট প্রকাশের কায়দা অভ্যাস করলে প্রাথমিক অথবা পরবর্তী কালেও সুফল ফলতে পারে। মনে রাখতে হবে এটা গান গাওয়া নয়। সংগীত অভ্যাস। এখানে ভঙ্গি আয়ত্ত করার প্রোগ্রাম নেই, আছে দম ঠিক করা, প্রকৃত স্বরে কথা উচ্চারিত করা, বারবার একটি অলঙ্কারকে আবৃত্তি করে স্পষ্ট করা, মুখের ও ঠোঁটের নানান ভঙ্গিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, গানের সঙ্গে সঙ্গে স্বর পরিচিতির জন্যে শ্রুতিমধুর করে অনুরূপ সারগম্গুলোকে উচ্চারিত করা। খেয়াল অথবা ঠুমরীতে সারগমের যে ব্যবহার দেখা যায়, তার লক্ষ্য কি? লক্ষ্য হচ্চে স্বরকে বিশিষ্ট পদ্ধতিতে ছন্দে ও সুরে পরিপূর্ণ করে শোনাবার জন্যে কতকগুলো উচ্চারণেব অবলম্বন—যে উচ্চারণগুলো সংগীতের প্রধান মৌলিক উপকরণ। গাওয়াটা ভাল হলে উচ্চারিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করে আমরা সামগ্রিক ভাবে স্বর, স্বরের সংযোগ ব্যবস্থাপনা ও তার পরিবেশন রীতিটাই শুনি।

সংগীত শিক্ষায় কণ্ঠমার্জনার পদ্ধতি ও রাগ-সংগীতের গোড়ার শিক্ষা-পদ্ধতি এক। কিন্তু সারগম, স্বরপরিচিতি এবং মূল রাগ-পরিচিতির উপযুক্ত বাংলা গানের অভাব আছে। তা বলে প্রাথমিক রাগবোধের জন্যে রাগসংগীত শেখা 'ওস্তাদী গান' শেখা নয়। রাগানুগ গানের অভ্যাস, কণ্ঠ সঞ্চালনের অভ্যাস অতি প্রয়োজনীয়, যাতে কণ্ঠ পরিমার্জিত ও অনায়াস হতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য সংগীতে কণ্ঠ পরিচর্যা

কণ্ঠ পরিচর্যার জন্যে পাশ্চাত্ত্য সংগীত শিক্ষার যে কোন একটি সাধারণ গ্রন্থ পড়লে দেখা যাবে—অভ্যাসের প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রতিটি স্তরের জন্যে কতটা প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা অবলম্বন করা হয়। কি ভাবে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হবে, কণ্ঠ কিভাবে সক্ষম হবে, আওয়াজের ঘনত্ব বাড়বে, কিভাবে একটি সুর-

কলি শেষ করতে হবে—এসব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসূচক অনুসন্ধান হয়েছে। আমরা জানি কম্পন পাশ্চাত্ত্য সংগীতের কণ্ঠে সর্বদাই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এরমধ্যে তারতম্য আছে। "A tremulous bleating voice like a goat is all too common :" এই দোষের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রন্থে লেখক সমালোচনা করছেন, "কোন কোন বিখ্যাত গায়ক ও গায়িকাকে রেডিও কিংবা কনসার্টে গান করবার সময়ে মনে হয় যেন 'Platform of a bus' থেকে গাইছেন।" আওয়াজকে সরস করবার জন্যে প্রথমেই এঁরা কি বলেন অনুবাদ করে দিচ্ছি : "কণ্ঠের শব্দোৎপত্তি গোল, কিন্তু দৃঢ় ও আড়ষ্ট। দম সঙ্কোচন করে আয়ত্তে আনা প্রধান পন্থা। সাধারণ হাই তোলার মতো হবে মুখের আকৃতি। কণ্ঠটি যেন একটি টাইপ-রাইটার, চাবিগুলো সব বিভিন্ন স্থানে রয়েছে, সব এক জায়গায় পৌঁছে যায়। শব্দোৎপত্তির স্থান হচ্ছে নাকের পর্দার পেছনে, কল্পনা করো যেন নাকের পেছনে একটি গর্ত তৈরি করছ। শব্দটি প্রবল শক্তিতে একটি বড় হলের শেষ পংক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। সামনে যেন একটি পাত্র ধরা রয়েছে, সেই পাত্রে কণ্ঠটি উৎসারিত করে দাও। ভাবো যেন তুমি একটি চোঙের মধ্যে গান করছ। স্বরের উত্থান পতনগুলো যেন রবারের টুকরোর মতো, যেন একটি "গাম্" চিবোনো হচ্ছে। উত্থানের সময়ে গলা গোল করে দিতে থাকো। পতনের সময়ে পরিষ্কার আওয়াজ হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রেখো, ভেবে নিও স্বর উত্থানের সময়ে যেন একটি বেলুন উড়িয়ে দিচ্ছ। কণ্ঠস্বরকে হাই তোলার মতো মুখব্যাদানের পর গান করো। স্বরকে দুটো চোখের সামনে শূন্যে একটি ছিদ্র করে তাতে যেন রেখে দিচ্ছ—স্বর যাতে পালাতে না পারে। ধ্বনি উৎপন্ন করতে গিয়ে চোয়াল এবং মুখের ভেতরকার অংশ স্থির রাখতে হবে। সংগীতের সময় কল্পনা করতে হবে যে মুক্ত কণ্ঠটি একটি বিরাট মন্দিরে (Cathedral) বাজানো হচ্ছে যার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।" প্রাথমিক শিক্ষায় কণ্ঠকে শুধু প্রয়োগ করবার কায়দা শেখাতে যেভাবে প্রণালী বাৎলানো হয় এবং এর পেছনে যে নিরীক্ষণ রয়েছে তা আমাদের দেশে কোন পর্যায়েই হয় নি। এজন্যে বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পদ্ধতি অনুসারে অনুশীলন রীতি সম্প্রসারিত করতে হবে। সংগীতশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে আজকাল এধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে। শুধু এদিক থেকে নয়, আমাদের শাস্ত্রে কণ্ঠের গুণগত বিশ্লেষণ যথেষ্টই হয়েছে কিন্তু কণ্ঠের ওজন ও পরিমিতিবোধ গ্রামগত-পরিচয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ কোথায়? কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ করবার মতো

সহজ ও বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন আলোচনা কোথায়? পাশ্চাত্ত্য সংগীতে বিভিন্ন প্রকৃতির কণ্ঠের গান শোনার জন্যে একটি মানসিক প্রস্তুতি সহজেই হয়। পাশ্চাত্ত্য-সংগীতে পুরুষের Bass, Baritone, Tenor ও মেয়েদের Contralto, Mezzo, Soprano প্রভৃতি আওয়াজের রূপ নির্ণয় করে গান শোনবার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি চলে এবং সেজন্যে শ্রোতাও জানে কি প্রকারের কণ্ঠে গান শুনতে পাবে। গায়কও তার কণ্ঠ-প্রকৃতিকে রক্ষা করে চলে। এসম্পর্কে বাংলা গান সম্বন্ধে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। সাধারণত গায়কেরা আওয়াজের মৌলিক প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করেন না। বিশেষ করে খাদ গলা বলতে যে প্রকৃতি বোঝায় তার সাময়িক প্রয়োগ ছাড়া এই সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগ হয় না। অর্থাৎ সাদা কথায় খাদের অংশের জন্যে খাদ গলা এবং চড়া অংশের জন্যে চড়া গলা। কৃষ্ণচন্দ্র দের গলায় অনেকটা খাদ প্রকৃতি ছিল, কিন্তু সংগীত সৃষ্টির সময় তিনি Baritone'ও অতিক্রম করে চলে আসেন। শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের কণ্ঠে মন্দ্রস্বর ও পৌরুষ এবং দৃঢ়তার প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমল্লিকের কতকগুলো গানে ঐ রূপটি স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয় না। শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠ সম্বন্ধেও একথা খাটে। অর্থাৎ বাংলাগানে মন্দ্রস্বরের অভাব, মুক্তকণ্ঠের প্রকৃত প্রয়োগের অভাব থেকেই জন্মেছে। কণ্ঠের মুক্ত প্রকৃতির জন্যে তিন চারটি প্রায় সমসাময়িকের উদাহরণ—কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুন্দনলাল সাইগল, পঙ্কজ-কুমার মল্লিক এবং শচীন দেববর্মন। এর মধ্যে অধিকাংশ গলাই পরবর্তীকালে mellowed বা অতিশয় মোলায়েমপন্থী হয়ে পড়েছে। তবু বলা যায় রবীন্দ্রনাথের দু'একটি বিশিষ্ট রূপের গান, যথা—"ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়" শ্রীপঙ্কজ কুমার মল্লিকের কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে যে ভাবে সুপ্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তীকালে আর এরূপ দেখা যায় নি। শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক তাঁর কণ্ঠের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রসংগীতকে মন্দ্র মধ্য কণ্ঠগুণের রূপে রূপায়িত করে প্রত্যক্ষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পর্যায়ের পরবর্তী শিল্পী শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আমি রবীন্দ্রসংগীতের থিওরি বা রীতির কথা বলছি না, কণ্ঠের কথা বলছি। প্রত্যক্ষ কণ্ঠচর্চার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান বেরিয়ে না এলে রবীন্দ্রসংগীতের মেলাডিতে পৌরুষ ও মন্দ্র নির্ঘোষ আছে কিনা—আজ এ ইঙ্গিত পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। সে অনুসারে পুরুষকণ্ঠের বৈচিত্র্য ক্ষমতা আজকাল দুর্বল হয়ে পড়েছে। লঘু সংগীতে মন্দ্র কণ্ঠের অভাবের কথা উল্লেখযোগ্য।

রাগসংগীতে আশ্চর্য অভিব্যক্তিময় মন্দ্র-কণ্ঠ ছিল ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর। এ কণ্ঠকে কোন্ সাধনার দ্বারা তিনি মহাকাব্যের উচ্চতম ভাব-শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন ভেবে অবাক হতে হয়। কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাগ-সংগীতে কণ্ঠের প্রকৃতি প্রায় একই লক্ষ্যের যাত্রী। অর্থাৎ, ধ্রুপদ চায় রাগস্ফূর্তি অবশ্য বিশিষ্ট ধরণের কায়দার মধ্য দিয়ে, খেয়ালেরও উদ্দেশ্য রাগ বিকাশ যদিও কায়দা স্বতন্ত্র, টপ্পার লক্ষ্য তান-রঞ্জন এবং ঠুমরী-দাদরায় প্রেমাভিব্যক্তি। প্রত্যেকটির জন্যে কণ্ঠের ক্ষমতা অর্জনের রীতি, গলার সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ ও গতিসৃষ্টির এক্সারসাইজ প্রায় একই রকম। কণ্ঠচর্চার পদ্ধতির ব্যতিক্রমে যদিও গলা স্বতন্ত্র রকমের শোনায়, তবু কণ্ঠ-বাজানোর কায়দা অধিকার না করা পর্যন্ত রাগসংগীত-শিল্পী লক্ষ্য সীমায় পৌঁছে না। ডক্টর অমিয়নাথ সান্যালের বিখ্যাত উক্তি "কণ্ঠবাদন" কথাটি এক্ষেত্রে স্মরণ করি। রাগসংগীতের সাধনা সত্যি কণ্ঠবাদনের সাধনা বলে কণ্ঠের সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ ও গতি-প্রধান হয়। বড়ে গোলাম আলী খাঁর কণ্ঠ একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারি খেয়াল গাইবার সময়ে তাতে সৃষ্টি হয় অপরিসীম গাম্ভীর্য এবং ঠুমরির সময়ে অপরূপ হাল্কা ভাবটি বিস্মিত করে দেয়।

লঘু সংগীতে কণ্ঠ প্রকৃতি

লঘু সংগীতের কণ্ঠের প্রকৃতি রাগসংগীতের কণ্ঠ থেকে স্বতন্ত্র। ওখানে অনেকটা যেন গানের প্রকৃতির সঙ্গে গলার প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবে সংমিশ্রিত, একই গলায় খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী গানের মতো একই কণ্ঠে সব গান উপযুক্ত ভাবে শোনা যায় না। যে সব গানে আমরা অতি-তারস্বরের গলায় শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মত রূপ ও রেখা পেয়েছি, সে গানগুলো একটি মন্দ্র অথবা মধ্য স্বরের কণ্ঠে গাওয়া হলে তারতম্য প্রমাণ হবে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠের গাওয়া "একি তন্দ্রাবিজড়িত আঁখি পাত" গানটি অতি তারস্বরের নারী কণ্ঠে প্রয়োগ করে দেখুন—কেরিকেচার বলে মনে হতেও পারে। পল্লীসংগীতের কতকগুলো গান মেয়েদের জন্যেই তৈরি। মেয়েদের কণ্ঠেই আমরা শুনেছি। "ওগো চাঁদবদনী ধনি নাচত রঙ্গে" গানটি সিলেট, করিমগঞ্জে, শিলচরে বৌনাচের মধ্যে মৃদু নারীকণ্ঠে গীত হয়। যখন কলকাতা পুরুষ পল্লীগীতি গায়কের মুখে শোনা যায়, আমাদের মত সংস্কারাবদ্ধ শ্রোতার কাছে ওটা 'কেরিকেচার' বলেই মনে হয়—যেন নারীকণ্ঠে শোনার সংস্কারটাই

এর রস। কিছুকাল পর হয়ত এ সংস্কার থাকবে না, সংগে মৌলিকতাও যাবে। "জলে ঢেউ দিও না" অনেকে পূর্ব বাংলায় নারীকণ্ঠেই শুনেছেন— এটা বিয়ের গান। পুরুষ কণ্ঠে রেকর্ডে অনুরূপ সংগীত শুনে হাস্যকর মনে হয়েছে। মোটামুটি এখনকার বক্তব্য এই : বাংলা সংগীতের বিপুল পরিধিতে গানের উপযুক্ত কণ্ঠ নির্বাচন, অথবা কণ্ঠের উপযুক্ত গান নির্বাচন বোধহয় একটি মূল্যবান প্রসঙ্গ। রাগ-সংগীতে ঠুমরী গান প্রধানত মেয়েদের গানই ছিল, প্রেম নিবেদনের বহু ইমোশান বিস্তার করবার পর তাল বৈচিত্র্যের মাধ্যমে খানিকটা নেচে আসার মত প্রসঙ্গ তাতে আছে। একই গানে কখনও বিরহ দুঃখ ও আনন্দ বা সোহাগ আছে। কিন্তু ঠুমরী রাগসংগীতের সীমানায় প্রবেশের পর, দ্বিতীয় অংশটি নৃত্যরস না হয়ে আর একটা স্বতন্ত্র আঙ্গিকে পরিণতি লাভ করেছে। লঘু-সংগীতে রবীন্দ্রনাথের অথবা নজরুলের বিভিন্ন নৃত্যের গান কি সকল গলায় সমান ভাবে অনিবার্য শোনায়? রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই বলেছেন 'কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত শুনছেন না যেন সাহানা দেবীকে শুনছেন।'

লঘু-সংগীতের একই গানে বিভিন্ন ইমোশান পরিবেশিত হতে পারে কি? একই গানে কি প্রেম, ব্যথা ও নৃত্যভঙ্গির সমন্বয় হতে পারে? তা পারে না। রাগসংগীতের এক একটি গান এক একটি ধারাবাহিক অভিব্যক্তি বা continued process, এজন্যে এর পরিমিতি সম্বন্ধে কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। বাংলা গানের কথার পরিমিতিই তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে অর্থাৎ লঘু সংগীতে একটি গান একটি ভাবেরই (mood) বা ইমোশানের গভীরতম অভিব্যক্তি, পরিমিতি তার বাঁধা। এজন্যেই লঘু সংগীতে বিশেষ গানের তারতম্য অনুসারে কণ্ঠের নির্বাচন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই নির্বাচন করবে কে? সুরকার, গায়ক, শিক্ষক না কি শ্রোতা ও সমালোচক? এই সম্বন্ধে আধুনিক লঘুসংগীত-গায়কদের সচেতন করে দেবে সমালোচক। সুরকারদের কাজের ওপরই মতামত ব্যক্ত করবে। অর্থাৎ, গীত অনুসারে সুরকার কণ্ঠ ও ব্যবহারের পন্থা আবিষ্কার করতে পারেন কি না?

তা হলে কি এ কথা স্বীকৃত যে গানের বেলায় পুরুষ ও নারীর জাতিভেদ করা প্রশস্ত। আমি সে কথা মোটেও সমর্থনযোগ্য মনে করি না। কিন্তু কথা ও ভাব অনুসারে পরিপূর্ণ-রূপের অভিব্যক্তিতে যদি সূক্ষ্ম ভেদাভেদ (finer discrimination of things) মেনে নেওয়া যায় তা হলে অনেক সময়ে এরূপ ভাবে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। কারণ লঘু সংগীতের

প্রত্যেকটি গানের যেমন স্বতন্ত্র keynote থাকে তেমনি অভ্যাসের ক্ষেত্রে না হলেও, বিশেষ পরিবেশন বা demonstration এর বেলায় কোন কোন রূপের তারতম্য দরকার। উদাহরণ উপরে দিয়েছি। মূল কথাটি নির্বাচন নিয়ে, সংগীত প্রযোজনার ক্ষেত্রে সুরকারের নির্বাচন প্রসংগ দাঁড়ায়। গানের বেলা গায়ক আপন রুচি ও রসবোধ অনুসারে এ বিষয়ে মুক্ত একথা স্বীকার করি।

কাব্যের উৎকর্ষ হিসেবে এবং গানের বিষয়বস্তু ও সুরের দিক থেকে বিশেষ গানের বিশেষ ভূমিকা স্বভাবতঃই দৃষ্ট হয়। পল্লীগীতি এবং ধর্মীয়গীতির আবেদনগুলো অনেকটা সাদাসিধা, আজকাল আধুনিক গানে ও কথায় বাস্তবতা আসছে বলে গানের মধ্যে কণ্ঠের অংশ ও ভূমিকার প্রশ্ন উত্থাপিত হল। সুরকারের কাজ যতই নির্বিশেষ ও সাধারণ বিষয়বস্তু থেকে বিশেষের মধ্যে থাকবে, নির্বাচন-ক্রিয়া ততই আসবে। এ ধরণের নির্বাচন প্রক্রিয়া আমি দুজন সুরকারের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। একজন শ্রীসলিল চৌধুরী এবং অন্যজনা শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। এঁদের কোন কোন গানের সংগীত-প্রযোজনায়, সুর নির্বাচনে এবং গানের ভঙ্গিতে এমন ভাবেই সুরের অংশ বা রচিত হয়েছে যা নারী কণ্ঠের অথবা পুরুষ কণ্ঠের আবেদন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে।

কণ্ঠের শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ

কণ্ঠের প্রয়োগের প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের কথা আলোচনা করা যাক। যদিও এ আলোচনাগুলো কিছু কিছু মনগড়া এবং এদের লক্ষ্য শাস্ত্রীয় সংগীত, তবুও বর্ণনাগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাস্তবক্ষেত্রেও কণ্ঠের দোষ গুণ বিচারে প্রযুক্ত হতে পারে কি? বর্ণনাগুলো এই প্রকার:

মৃষ্ট—মার্জিত কণ্ঠ

চেহাল—স্থূলও নয় কৃশও নয় এরূপ স্বর

ত্রিস্থাপক—মধ্য, মন্দ্র, তার, সব ক্ষেত্রেই যার ব্যাপ্তি

(লঘু সংগীতে এই ব্যাপ্তি কাজে লাগতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু লঘু সংগীত কণ্ঠ হয় মন্দ্র অথবামধ্য অথবা তারা প্রকৃতির হলেই রসসৃষ্টির উপযোগী।)

সুখাবহ—মনকে খুশি করবার "সুখদ" গুণ

প্রচুর—স্থূলতা যুক্ত কণ্ঠ

কোমল—কোকিলধ্বনির সৌকুমার্যের তুলনা হয় এমন

(কোকিলধ্বনি তীব্র-পঞ্চম স্বর এবং দৃঢ়। এর অর্থ অনুরূপ হওয়া সংগত)।

গাঢ়—সম্প্রসারণের ক্ষমতাপন্ন প্রবাহী কণ্ঠ।

শ্রাবক—দূরে বিস্তৃতির মত শক্তি সম্পন্ন।

(নতুন কণ্ঠচর্চা পদ্ধতিতে আর মাইক্রোফোনের ব্যবহারে এই গুণ বিরোধী মনে হতে পারে।)

করুণ—শ্রোতার চিত্তে দুঃখ অথবা কারুণ্য উৎপাদক।

(এটা কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য না হয়ে কণ্ঠভঙ্গি বা প্রকাশরীতির বৈশিষ্ট্য বলা যায়।)

ঘন—গভীরতা বোধক, অন্তঃসারযুক্ত ও দূর শ্রবণের উপযুক্ত।

স্নিগ্ধ—দূর সংশ্রাব্য কোমল কণ্ঠ।

শ্লক্ষ্ণ—মসৃণতার গুণ সম্বলিত।

রক্তিযুক্ত—অনুরাগ প্রযুক্ত।

ছবিমান—দীপ্তিময় কণ্ঠ, যাতে জ্যোতির প্রতীক উপলব্ধি হয়।

মুঘল যুগের ফকিরউল্লাহ কণ্ঠের সম্বন্ধে অনুরূপ বিশ্লেষণ গ্রহণ করে অন্য দুটো গুণের কথা উল্লেখ করেছেন :—

অস্থমান=পরিষ্কার (ছবিমাণ), মধুর—কণ্ঠ সোজা, তারাস্থানে ভ্রমণকারী ও মিষ্টতা সম্পন্ন।

কণ্ঠের দোষ আটটি :

রুক্ষ=অমসৃণ, স্নিগ্ধতা-বিহীন, অমধুর

স্ফুটিত=ভাঙা আওয়াজ, ফেটে যাওয়া

নিঃসার=অন্তঃসারশূন্য, ফাঁপা

কাকোলী=কাকের ডাকের মত নিষ্ঠুর

কেটি=ক্যাঁটকেটে, মাধুর্যহীন

কেনি=সঞ্চরণ ক্ষমতাশূন্য

কৃশ=অতি সূক্ষ্মতা

ভগ্ন=গর্দভের ধ্বনির মতো নীরস

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এসবগুলো শুধু গুণগত বি[illegible] কস্থানে পুনরুক্তি আছে এবং অনেক স্থলে নিতান্ত abstract বা গুণবাচক। দ্বিতীয়ত, গানের মধ্যে এর অধিকাংশ গুণ স্ফূর্তি হলেই তাকে যে ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে এই বর্ণনা সেইরূপ। অর্থাৎ শিল্পীর মূল্যায়নে এসব লক্ষণগুলো প্রয়োগ করে বোঝা যেতে পারে। মুশকিল হচ্ছে, এ সব গুণগুলোর কিছু অংশ সংগীত কুশলীর কণ্ঠে সৃষ্টি করতে হলে কি কি পদ্ধতি

অবলম্বন করা দরকার অনেকক্ষেত্রেই সে সম্বন্ধে কাজ করা হয় নি। শিল্পীদের ত্রুটি সম্বন্ধে যে কথা সংগীতরত্নাকরে কিংবা পরবর্তী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের অভাবে সেসব ত্রুটিগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষণের জন্যে উপযুক্ত পদ্ধতি পূর্ণরূপে বিকশিত হয় নি এ কথাটাই বিবেচ্য। যে পদ্ধতিতে রাগ-সংগীত শিক্ষা দেওয়া হয়, সর্বক্ষেত্রে সে পদ্ধতি অবলম্বন করা উপযুক্ত নয় বলে কলেজী শিক্ষায় নানা স্থানে কিছু কিছু অদলবদল দরকার। কিন্তু কণ্ঠ সাধনার ভিত্তিভূমি, স্বরপরিচিতি, রাগ-পরিচয়—সব জায়গায়ই প্রয়োজন। এ প্রস্তুতির জন্যে ভাল ভাল রচনা এখনো হয় নি। ফলে রাগ-সংগীত শিক্ষার বেলায় প্রস্তুতি যেমন সুদৃঢ় হতে পারে লঘু সংগীতের ক্ষেত্রে তা হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই সহজ-সরল কণ্ঠের স্বাভাবিক গুণাবলীর নির্ভরশীলতায় সরাসরি গান শিক্ষা আরম্ভ হয়ে যায় এবং কণ্ঠের জন্যে উপযুক্ত ভিত্তি প্রস্তুত হয় না। এই জন্যেই গায়কের মধ্যে মৌলিকতা সৃষ্টি হতে পারে না, গানের মধ্যে সৃষ্টির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সংগীত-কেরিয়ার নিস্তেজ হয়ে পড়ে, শ্রোতার চাহিদা ফুরিয়ে আসে।

লঘুসংগীতে কণ্ঠের প্রয়োগ

রাগসংগীত পরিচর্যার জন্যে যে ধরণের কণ্ঠ অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, অনেক ক্ষেত্রে লঘুসংগীতের কণ্ঠ অনুশীলন সে ধরণের হতে পারে না—একথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাগসংগীতে গানের প্রয়োগ-বিধি স্বতন্ত্র। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা গানের প্রতি আঙ্গিকেই ক্রমাগত দমের প্রয়োগ এবং স্বর-সংকোচন ও বিভাজনের অভ্যাসে কণ্ঠ-প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষত্ব থাকে। বিশেষ করে বিস্তার ও তানের প্রয়োগেও কণ্ঠ-প্রক্রিয়াতে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। শিল্পীর মনও এই উদ্দেশ্যে রাগসংগীতে অবিকৃত থেকে স্বর বিস্তার করতে চায়। দুই স্থলে ক্রিয়া দুটি বিভিন্ন প্রকারের। রাগসংগীতে কণ্ঠ বেগ, গতি ও তীব্রতা অবলম্বন করে, অনেক সময়ে মাধুর্য সংরক্ষণ সমস্যা হয়ে পড়ে, এজন্যে কৌশল অবলম্বন করা দরকার হয়ে পড়ে। লঘু সংগীতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর বিকাশ অনেকটা ঝরণা বা ফোয়ারার মতো। এখানে সুরের স্থিতি ও সহজ স্ফূর্তির কায়দা আয়ত্ত করা দরকার হয়ে পড়ে। কণ্ঠের

গুণাবলী বাড়াবার জন্যে যেমন অতিরিক্ত ও বিশেষ কৌশল দরকার তেমনি কণ্ঠের ছোট ছোট অংশের সঞ্চরণশীলতাও বাড়ানো প্রয়োজন। লঘুসংগীতের কণ্ঠ কতকটা নমনীয়, কমনীয়, কোমল ও স্নিগ্ধ বা মসৃণতার গুণ-সমন্বিত হতে চায়। অভ্যাসের ত্রুটির জন্যে কণ্ঠে কয়েকটি গুণের অধিকার করতে গিয়ে শিল্পীরা মুক্তকণ্ঠ বা খোলা গলা হারিয়ে ফেলেন। সহজেই গায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন করবার জন্যে কিছু প্রশ্রয় দেওয়া হয় লঘুসংগীতে। দেখা গেছে রাগসংগীত অসংযত কম্পনকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু লঘুসংগীতে ত্রুটিপূর্ণ কম্পনও ব্যবহৃত হচ্ছে।

আজকাল আধুনিক গানে effect সৃষ্টি বা আবহ-সংগীত দ্বারা আকস্মিক-আকর্ষণ সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। গানের মধ্যে নানা রকমের শব্দ ব্যবহার, কোন প্রাকৃতিক শব্দ সৃষ্টি অথবা যন্ত্রের নানারূপ শব্দের সাহায্যে গানের মধ্যে বাস্তব-রস প্রয়োগ এই কাজের উদ্দেশ্য। আবহ-সংগীত গানকে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করছে। শুধু সিনেমার গান নয়, বহুদেশের আঞ্চলিক লঘু গীতিও এইভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে। এই বাস্তবতা সৃষ্টির কাজকে মৌলিক সংগীতের প্রচেষ্টা বলা যায় না। ঝড়ের গানে ঝড়, পাখীর কাকলীর স্থানে কাকলী, কোথাও একটু শিস, কোথাও জল-কল্লোল, কোথাও নানারূপ ভঙ্গিপূর্ণ বা ইঙ্গিত-জ্ঞাপক কণ্ঠধ্বনি সংযোগ এবং যন্ত্রের সাহায্যে নানা অপ্রাকৃত শব্দের প্রয়োগও উল্লেখযোগ্য। মাইক্রোফোন এসব কাজে সাহায্য করেছে বেশি। এই সুযোগ নেবার চেষ্টায় বহু কৃত্রিমতাও গানের মধ্যে এসে যায়। এ কায়দা-গুলোকে সমর্থন করা যাবে কি যাবে না—আমাদের বিচার করবার নয়। যে কোন নতুন এক্সপেরিমেন্ট সর্বদাই সমর্থন করা যায়। কিন্তু মৌলিক কণ্ঠ ও তার প্রকাশের ক্ষমতাকে দূরে রাখা যায় না।

মাইক্রোফোন ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত শিল্পীকে অনেক ক্ষেত্রে কণ্ঠকে দাবিয়ে রাখতে দেখা যায়। এইরূপ কণ্ঠরীতির প্রভাব, যান্ত্রিক সহযোগিতার ফলে, এমন ভাবেই প্রচলিত হতে চলেছে যে গানের মৌলিকতা লুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। মাইক্রোফোনে অবদমিত কণ্ঠে বা চাপা গলায় সুর দেওয়া চলে। অর্থাৎ কণ্ঠ অবদমিত করে গুন্ গুন্ করে গাওয়া chrooning-এর পর্যায়ে পড়ে। মৌলিক সংগীত সৃষ্টির পন্থা এটা নয়। কণ্ঠের গভীরতা, ঘনত্ব, এবং সরসতা নষ্ট করে দেবার এমন কায়দা আর হয় না। গলাকে যন্ত্রের সঙ্গে গাইবার জন্যে উপযুক্ত করে তোলার কাজ হয়ে ওঠে মুখ্য, গলার স্বাধীন রূপটি

বিকশিত হবার পথ থাকে না। ফলে গলার জন্যে যে রেয়াজ অবশ্য কর্তব্য তা হয়ে যায় গৌণ।

যে কোন অবস্থায় কণ্ঠের অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য। দম ও নিঃশ্বাসের কায়দা তাকে সুদৃঢ় করে। কণ্ঠ পরিচালনার নিয়মিত অভ্যাস, স্বরের সঙ্গে স্বরের সম্পর্ক স্থাপনের বোধ, ছন্দ বোধ, সাবলীল কায়দা ও অলঙ্কার প্রয়োগ—এসব নিয়মিত অভ্যাস ছাড়া সম্ভব নয়।

পল্লীগীতি ও কণ্ঠ

এবারে পল্লী-সংগীতের ক্ষেত্রে কণ্ঠ পরিচর্যা চলে কিনা সে প্রশ্নে আসা যাক। পল্লীগীতিকে সরস করতে গিয়ে কণ্ঠের মুক্ত উৎক্ষেপণ (যথা, সারিগানের ছন্দোবদ্ধ চিৎকার) এবং অতিরিক্ত সঙ্কোচন প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক গানে এই কাজে কোন বিরোধ হয় না। কারণ, এগুলো বাস্তব প্রয়োজনে সৃষ্ট অলঙ্কার। পল্লী-সংগীত বা কীর্তনে ব্যবহৃত কণ্ঠ-প্রকৃতি অনেকটাই মুক্ত। কণ্ঠ-পরিচর্যা সেই সহজ অভিব্যক্তিকে বিনষ্ট করে গান sophisticated এবং সংস্কারাবদ্ধ করে তোলে কিনা সেও একটা সমস্যা। স্থানান্তরে আলোচনা করেছি যে শিল্পী যদি পল্লীসংগীত ও কীর্তনে গানের সঙ্গে আত্মিক-সম্পর্ক সংস্থাপন করতে না পারেন, তাহলে সুকণ্ঠ হলেও পল্লীসংগীত কিংবা কীর্তন তাঁদের কণ্ঠে স্ফূর্তি লাভ করে না। এ ক্ষেত্রে সুকণ্ঠই একমাত্র প্রধান অবলম্বন নয়। প্রশ্ন হতে পরে, যদি তা না হয় তা হলে কণ্ঠ মার্জনার বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজনও সেখানে আছে কি? অথবা কণ্ঠের অনুশীলন কি পল্লীসংগীতের বিরোধী? আগেই বলেছি কোন একটি বিশিষ্ট গানের সঙ্গে আত্মিক-সম্বন্ধ সংস্থাপন না করতে পারলে সে সংগীতের শিল্পী হওয়া যায় না। গান সেখানে বিরূপ হয়ে যাজে। গায়ন পদ্ধতির দিক থেকে পল্লীগানের দুটো প্রধান ভাগ করে নেওয়া যায়। একটি Urbanised folk tune—অর্থাৎ কতকগুলো গানের পরিশীলিত ও প্রচলিত ভঙ্গি—যথা বাউল, ভাটিয়ালী, বিশেষ কতক-গুলো ভাওয়াইয়া এবং কীর্তন-প্রভাবিত কতকগুলো গান। এ সব গানের ভঙ্গি ও সুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা মোটামুটি অনেকেরই আছে। এই সব মৌলিক গানগুলো নতুন ভাবে রূপান্তরিত হয়ে প্রযোজিতও হচ্ছে এবং এই গান অবলম্বন করে এক ধরণের নৃত্যগীতির প্রচলনও দেখা যায়।

আইডিয়া হিসেবে এটা গ্রাহ্য। কিন্তু রূপটির পরিসর সীমিত। এবং বহু স্থলেই পল্লীসংগীতের মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন Urbanised folk music রূপে পরিগণিত হবার সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রেও পল্লীর সঙ্গে যোগসূত্রটি দৃঢ় হওয়া দরকার—প্রযোজক ও রচয়িতার দায়িত্ব এখানে বিশেষ। শিল্পীর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পল্লীগীতির মৌলিক রূপের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করবে। গলাটিও সে ভাবে বাছাই করা হবে।

পল্লীসংগীতের অনেক শ্রেণীর গান সম্পূর্ণরূপে ভৌগোলিক, ভাষারূপটিও অনুকরণ করা দুঃসাধ্য। এই গানের আঞ্চলিক রূপই সত্যিকার রূপ। বড় জোর তাকে অনুকরণ করে আঞ্চলিক-সংগীতের রূপান্তর বলে চালানো যেতে পারে। এ ভঙ্গির স্বীকরণ বা assimilation সহজ নয়। আজকাল urbanised folk party বা নানান নাগরিক-সংঘ থেকে এসব গান সমবেত কণ্ঠে গাইবার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি কথাই বিশেষ বক্তব্য—মূল সংগীতকে ভ্রষ্ট করবার অধিকার কোন শিল্পীরই থাকা উচিত নয়। তা ছাড়া এসব গানের জন্যে কণ্ঠ-চর্চারও দরকার নেই। আজকাল পল্লীর মূল-সুর ব্যক্তিগত প্রয়োগ-বিধির দ্বারা রূপান্তরিত করে অনেকে পল্লীর সংগীত বলে চালাতে চান। এ কাজটিও ক্ষমার্হ নয়। এঁরা মৌলিক গীতির সংগে (বৈদেশিকও হতে পারে এমন) কণ্ঠভঙ্গিকে মিশ্রিত করে দেশজগান বলে প্রচার করতে চান। পল্লীসুর সংগ্রহ করে গ্রামীণ কথায় সুর সংযোজনার বিধি বাংলায় চলিত থাকলেও, এই ধরণের রচনার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। উড়িষ্যায় আকাশবাণীর সংগীত অনুষ্ঠানে পল্লী-স্বর-গীত বলে এক শ্রেণীর গান চালু হয়েছে। সে গানের কথাতে পল্লীর বিষয়বস্তু ও ভাব নিয়ে পল্লীর সুর সংযোজন করে গাওয়া হয়। পল্লীসংগীতের সুর ও ভাবসম্পদকে সংগীতে প্রয়োগের সুবিধের জন্যে এই ব্যবস্থা। এতেও মৌলিক রস-সৃষ্টির পরিসর সঙ্কীর্ণ। তবু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করা যায় না। মোটামুটি বলা যায়, প্রণালীবদ্ধ কণ্ঠ-অনুশীলন কিছু কিছু পল্লীগীতির পক্ষেও বাধা নয়। কারণ গানের সংগীতরূপই আমাদের প্রয়োজন। শুধু বলব, শিল্পীর মধ্যে প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপনের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতা দরকার। কণ্ঠ এর ছবি।

শিল্পীর ব্যক্তিত্ব—কণ্ঠ

আধুনিক গানে কণ্ঠের দুর্বলতা আজকাল বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাতে অনেক সময়ে সাধারণের কানে মুড়ি-মিছরির একদরের মতোই অনুভূতি আসে। কোন্ গান কোন্ ধরণের গলায় খাপ খায় এবং সে গানের অনুযায়ী কোন্ রীতিটি অবলম্বন করা যেতে পারে তা শিল্পীমাত্রেই হয়ত ভাবেন। কিন্তু, এসব জায়গায়, প্রযোজিত সংগীতে সুরকার ও প্রযোজকের মন আরো বেশি ক্রিয়াশীল। একটি বর্ণনাত্মক কাহিনী-গানে কথার আবৃত্তিই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে—যেখানে একঘেয়েমির সৃষ্টি হয়। এই একঘেয়ে ভাবটি ভেঙে দেবার জন্যে একটি বিশেষ সুর-মুহূর্ত সৃষ্টি করা যাবে কিনা, না আবহ-সংগীত প্রয়োগ ভাল হতে পারে—এ ধরণের চিন্তা গ্রামোফোন রেকর্ডের গানের প্রযোজনায় লক্ষ্য করা গেছে। এক একটি দীর্ঘ একঘেয়ে সুরের মধ্যে স্থান বিশেষে সূক্ষ্ম কারিগরি অনেক সময়ে চমকপ্রদ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। সামান্য প্রয়োগই এসব গানে অসামান্য হতে পারে। প্রযোজিত গানের একঘেয়ে সুরের মধ্যেও সৃষ্টির যে পথ আছে পল্লীগীতিতে তা নেই। এখানে গায়কের মৌলিকতা ফুটে ওঠবার সুবিধেও থাকে। অর্থাৎ ছোট ও সূক্ষ্ম কারিগরি আধুনিক গানের মূল কথা। পল্লীগীতি একঘেয়ে হলেও তাকে সুন্দর করবার কোন পন্থা নেই। শুধু ছন্দের তারতম্য এবং গতির বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক। অর্থাৎ গানের সার্থকতা কণ্ঠের ওপরেই নির্ভরশীল।

আধুনিক গানের একধরণের শ্রেণীবিভাগে কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য বড় বিবেচ্য। রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরীর জন্যে নির্বাচিত গলা স্বতন্ত্র প্রকৃতির রস-সৃষ্টিতে সক্ষম—শুধু কৌশল ও অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য দ্বারা। লঘুসংগীতের এক একটি গান কণ্ঠের তারতম্য অনুসারে স্বতন্ত্র শোনাতে পারে। কোন কোন কণ্ঠ স্বকীয় উচ্চারণ-পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ ধরণের গানের জন্যেই উপযুক্ত মনে হয়। এসব কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীত অথবা আধুনিক গানও উপযুক্ত মনে না হতে পারে। অর্থাৎ পরিশীলিত গলা যে ভাবে অভ্যস্ত সেভাবেই বিভিন্ন রূপের গানকে প্রকাশ করতে সক্ষম। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলছেন, রবীন্দ্রসংগীত সকল কণ্ঠের উপযুক্ত, তবে "গানের কথার দ্বারা তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যে হৃদয়াবেগটিকে বেঁধেছেন তাকে প্রকাশ করতে হবে অনুকূল কণ্ঠস্বরের বিকাশে।"* অনুকূল কণ্ঠস্বর বলতে কি বোঝায়? নিশ্চয়ই নির্বাচিত কণ্ঠ। বর্তমানে ছুটো কণ্ঠ রবীন্দ্রসংগীতের রূপের অনুকূলতার

উদাহরণ, একটি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যটি সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠ। শুধু দুটো অতিপরিচিত স্বতন্ত্র ধরণের কণ্ঠের কথাই উল্লেখ করা গেল। এই সঙ্গে কখনো উৎকৃষ্ট রাগসংগীত-পন্থী কোন কণ্ঠের সামঞ্জস্যের কথা বলব না। কারণ অনুকূলতা সেখানে নেই।

আধুনিক গানের জন্যে বিভিন্ন প্রকৃতির কণ্ঠের প্রয়োজন—ঘন, গভীর ও ব্যাপ্ত। কিন্তু মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করব ভারতীয় মতে মন্দ্র, মধ্য অথবা তারস্বরের প্রকৃতিতে। প্রকৃত অনুশীলনের ফলে রসবোধ-সম্পন্ন শিল্পী আপনার গানের বিষয় সহজে নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু এসব স্থলে সুরকারের কাজ বিশেষ তাৎপর্যমূলক হয়। সুরকার বিশেষ গানের রূপ দেবার জন্যে বিশেষ কণ্ঠটিকে খুঁজে বেড়াবেন। কণ্ঠ নির্বাচনের জন্যে সুরকার গানের রূপটি গোড়ায় পরিকল্পনা করবেন। আজকালের চলচ্চিত্র সংগীতের প্রযোজনায় এ লক্ষণটি বিশেষ পরিস্ফুট। অভ্যাসের জন্যে সাধারণ গানের সুর রচনা এখনো তেমন ভাবে চালু হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন স্থলে লক্ষ্য করেছি এ ধরণের পরিকল্পনারও প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ আধুনিক সংগীতের সুর রচনার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ আছে বলে বিশ্বাস করি। আকাশবাণীর লঘুসংগীতের জন্যে শিল্পীদের যখন নতুন নতুন সুর রচনার আগ্রহ সহকারে বিভিন্ন সুরকারের কাছে যাতায়াত করতে দেখি তখনই এ সত্যটি আরও উপলব্ধি করা যায়। তাঁরা পুরোনো গান গাইবেন না। আরো নতুন রূপ চাই। নতুন সংযোজন চাই। কারিগরির সুবিধে চাই, গলা অনুসারে তারা অথবা মধ্য গ্রামের বিশেষ ধরণের কাজ চাই, চমকপ্রদ কথায় চমকপ্রদ সুরের অংশ চাই।

গায়কী কণ্ঠের ত্রুটি

শ্রোতা-সাধারণের কাছে আজকালকার লঘু-সংগীতের সমালোচনায়, বিশেষ করে আধুনিক গানের সম্বন্ধে এই দুটি ত্রুটির কথা শোনা যায়—(১) গান শুধু কথার সমষ্টি এবং (২) গায়ন পদ্ধতিতে আবৃত্তিমূলকতা। এ ছাড়াও আর একটি তৃতীয় সমালোচনাও আছে, সে হচ্ছে গানের রুচি সম্পর্কিত। সুরে অথবা কথায় হাল্কা বা লঘুতম ভাব, শ্লীলতা অথবা অশ্লীলতা ইত্যাদি। এসব ত্রুটিগুলো শিল্পীর সংগীত-ভাবনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সংগীতের

রূপ ও রসের দিক থেকে বা লঘুসংগীতের প্রকৃতি বিচারে এসব আলোচনা উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ, লঘুসংগীতের পরিধি এত বিস্তৃত যে তাতে সব কিছুর জায়গা হতে পারে। মূল্যায়ন হয় প্রয়োজনানুসারে। রুচিবোধ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো আসে বিশেষ রচনা ও শিল্পীর গুণ-দোষের তারতম্য অনুসারে। সাধারণ কথাপ্রধান গানকে সুন্দর আঙ্গিকে গাইবার যথেষ্ট সুযোগ থাকতে পারে, মৌলিক গায়নপদ্ধতি একটি আবৃত্তিকেও contrast বা বিপরীত সুর স্থাপনের দ্বারা সুন্দর গানে পরিণত করতে পারে। মোটামুটি গানকে সরস করে গাওয়া মানে নিছক গান শেখা ও গাওয়া নয়। এর পিছনে অতিরিক্ত প্রয়োগ-চিন্তা দরকার।

শিল্পী বা গায়কের গলার ত্রুটি সম্বন্ধে, অর্থাৎ শিল্পের কলা-কৌশলের ত্রুটি সম্বন্ধে কতকগুলো বিষয় শাস্ত্রকাররা উল্লেখ করেছেন। ত্রুটিগুলো গায়কের ব্যক্তিত্বের সমালোচনায় কার্যকরী কিনা বিচার করে দেখা যেতে পারে। এই তালিকার অধিকাংশ ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হলে মূল শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতিটি পর্যায়ে নানা কৌশল অবলম্বন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার। অবশ্য এখানে এই ভাবনা অবান্তর মনে হবে। কতকগুলো লক্ষণ রাগসংগীত-শিল্পীর গায়ন-পদ্ধতিতে প্রযোজ্য। লক্ষণগুলো :

সন্দষ্ট = দাঁতে চেপে গান।
উদ্‌ঘুষ্ট = ফুৎকারী নিশ্বাস টেনে।
ভীত = দুর্বলচিত্ত।
শঙ্কিত = ত্বরান্বিত।
কম্পিত = অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন।
করালী = মুখ ফাঁক করে গান।
কাকী = কাকের মত কর্কশ।
বিকল = সুর কম-বেশি হওয়া।
বিতাল = তালের ধারণা যার দুর্বল—আন্দাজহীন।
করভ = উটের মত মাথা নীচু করে গান।
অধির = ছাগলের মতো আওয়াজ।
বোম্বক = শিব কপাল, গ্রীবা, মুখ বিকৃত।
তুম্ব = লাউয়ের মত গলা ফুলিয়ে।
বক্রী = গলা বক্র করে।

প্রসারী = অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্লথ।

বিনিমীলক = চোখ বুজে গান করা।

বিরস = রসহীন।

অপস্বর = সুর রক্ষণের অক্ষমতা।

মুঘল যুগের ফকীর-উল্লাহের গ্রন্থে এর অতিরিক্ত।

অব্যক্ত = কথা স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণের অভাব এবং কণ্ঠনালী থেকে ধ্বনি নির্গত না হওয়া।

স্থানভ্রষ্ট = মন্দ্র, মধ্য, তারা—তিন স্থানে গলা পৌছাতে অক্ষম বা সুরভ্রষ্ট।

অব্যবহিত = প্রত্যয়হীনতা।

মিশ্রক = রাগ মিশ্রিত করে ফেলা।

অনবধান = গীতের কথা সম্বন্ধে অবহিত না থাকা।

অনুনাসিক = নাকী।

পূর্বেই বলেছি এর কিছু কিছু লক্ষণ অবান্তর এবং কয়েকটি রাগসংগীতের জন্যে উপযুক্ত। আজকালের গানের ত্রুটিগুলো আরো স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, যথা—অস্পষ্টতা, একঘেয়েমি, সূক্ষ্মতাবিহীনতা, অনুকরণশীলতা, সুর-বিহীনতা, ওজনবোধের অভাব, কথা ও সুরের সামঞ্জস্য সাধনের অভাব, আবৃত্তি-প্রধানতা, যতির অপপ্রয়োগ, মুদ্রাদোষ, সুর সংকোচন ও সম্প্রসারণের অক্ষমতা, অতি-আবেগপ্রবণতা ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব ত্রুটিগুলো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মূলতঃ কণ্ঠ পরিচর্যার অভাবে এগুলোর সৃষ্টি হয় এবং নিয়মিত অভ্যাসে এর অনেকটাই দূরীভূত করতে পারা যায়। লঘুসংগীতে এর যে কোন একটি ত্রুটিতে সম্পূর্ণ গানটিকে অগ্রাহ্য করে দেওয়া যায়, অথবা এসব ত্রুটি শিল্পীকে নিম্নমানে নিয়ে যেতে পারে। রাগসংগীতে বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গায়কের গান শ্রোতার গ্রাহ্য হয়ে যায় বিশেষ বিশেষ কারণে। একক্ষেত্রে লঘুসংগীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি গানকে কখনোই গ্রহণযোগ্য করে না। প্রধান কারণ, লঘুসংগীতের কাঠামোটা অত্যন্ত ছোট এবং এর সম্পূর্ণ অঙ্গে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে না পারলে গায়ক শিল্পী হবার অযোগ্য বলে বাতিল হয়ে যেতে পারেন।

কণ্ঠের বয়স

লঘুসংগীতে কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা পর্যন্তই শিল্পীর জীবন। কণ্ঠ দুর্বল অথবা অথর্বতার স্পর্শ পেলে তাকে শ্রোতা সাধারণের কাছ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বিদায় হয়ে যেতে হয়। কিন্তু রাগসংগীতের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। বৃদ্ধ-কণ্ঠের মধ্য দিয়ে সংগীতের যে ইঙ্গিত ভেসে আসে কোন কোন শ্রোতা তাকেও আস্বাদন করতে পারেন, এমন দেখেছি। জনৈক সংগীত-সমালোচক মনে করেন পুরোনো সেরা কীর্তনীয়াদের অনেকের কণ্ঠ সাধারণ শ্রোতার মূল্যায়নে অগ্রাহ্য মনে হতে পারে, কিন্তু সে কণ্ঠের মধ্যে বৃহত্তর ভাব ও সংগীতের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাকে সংরক্ষণ করা দরকার। সাধারণ শ্রোতার মধ্যে এ ধরণের কল্পনাশক্তি কতটা আছে বা এরূপ কল্পনাশক্তি দাবী করা যায় কিনা তা বিচার-সাপেক্ষ। সংগীত পূর্ণ-সংগীতরূপে অভিব্যক্ত না হলে শ্রোতাসাধারণের কাছে তার দাম নেই, একথা নিশ্চিত। সেজন্যে কণ্ঠের বয়স আছে একথা মানতেই হবে, এবং গায়ককে খেলোয়াড়ের মত অবসর গ্রহণ করতে হবে।

যৌথ বা বৃন্দ গান ও কণ্ঠ

লঘুসংগীতের কণ্ঠের শ্রেণীবিভাগ যেমন প্রয়োজন, তেমনি সকল কণ্ঠই তিন গ্রামে সমান ভাবে বিচরণ করতে পারবে—এ ধারণাও অবাস্তব। লঘুসংগীতের ক্ষেত্রে এমন বহু কণ্ঠ আছে যাদের জন্যে স্বতন্ত্র ভাবে গান তৈরি করে দেওয়া দরকার। বিশেষ কতকগুলো গলাকে বৃন্দ-সংগীতের জন্যেই ব্যবহার করা চলে। বৃন্দ-সংগীতের উপযুক্ত গলার অভাবের কথা উল্লেখযোগ্য। বৃন্দ-সংগীতের ব্যবস্থা ভারতীয় সংগীতে ছিল এবং নানারূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান লোক-প্রচলিত গানে বৃন্দ-সংগীতের রচনাশৈলী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত নাট্যসংগীতের সাংগীতিক ধারণাটি এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। "নাট্য-সংগীত নামে যদি এই হয় যে তা হবে মুখ্যতঃ নাট্যরসপ্রধান সংগীত, বাণী আর সুরের দিক থেকে তাতে নাটকীয় রসের প্রচুর উপাদান থাকবে, তার রূপ একক না হয়ে হবে যৌথ, তা হলে নাট্যসংগীতের প্রতি সাগ্রহ

সমর্থন না জানিয়ে পারা যায় না।" আরো বলেছেন, "সত্য বটে যৌথ সংগীতের সংস্কার এখনও এদেশে গড়ে ওঠে নি, তবে গড়ে ওঠবার পথে বাধাই বা কোথায়! ইয়োরোপীয় সংগীত থেকে 'কোরাস'-এর আদর্শ আমরা পূর্বেই গ্রহণ করেছি। এদিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ পথিকৃতের মর্যাদা দাবি করতে পারেন। পরবর্তী যুগে অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং দিলীপকুমার কোরাস গানে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। রেওয়াজটা মরে যায় নি, বরং দিন দিন বাড়ছে।"

এই গেল সাদামাঠা ভাবে কয়েকটি উক্তি, যৌথগান বা বৃন্দগানের জন্যে যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তা নাটকীয় না সাধারণ সে কথা সংগীতের আংগিকের দিক থেকে আলোচ্য নয়। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী অবশ্য সে দিক থেকেও স্পষ্ট কথা বলেছেন—সমষ্টি-সংগীত একক সংগীতের তুলনায় অমার্জিত হতে পারে, সূক্ষ্ম সুর তাতে চাপানো যেতে পারে, ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে, এবং পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ঢঙ ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করা যেতে পারে, কারণ কোরাস গানের কাঠামো যা হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। হার্মনির প্রয়োগের দ্বারা বিরোধী সুরের সংঘাত ও সমন্বয় সৃষ্টি করে যৌথ সংগীত গড়তে হবে, এটা সমষ্টির আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরীর কয়েকটি কথা উল্লেখ করা দরকার। বৃন্দসংগীত বা যৌথসংগীতের ব্যাপারে নির্বাচন, সংগ্রহ এবং প্রয়োগশিল্পের কারুকার্যই বিশেষ প্রয়োজন, অর্থাৎ সুরকার এবং প্রযোজকের কারুকলা। 'হার্মনি'তে ধারাবাহিকতা নেই, আছে 'স্বরের' পাশাপাশি অবস্থানের জন্যে ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থাপনার চিন্তা আজকাল নতুন করে সুরকারের মধ্যে এসেছে বলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ধরণের বৃন্দগান আধুনিক ও ভজনে বেশি প্রযোজিত হচ্ছে। সুরকার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই প্রসঙ্গটি আর একটু বিশ্লেষণ করা যাবে। কিন্তু এখানে বক্তব্য কণ্ঠ-নির্বাচন। বৃন্দগানকে ফুটিয়ে তুলতে হলে আধুনিক গানের সমর্থনে কণ্ঠের শ্রেণীবিভাগ এবং কণ্ঠকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নির্বাচন করে তাকে সংগীতের অংশবিশেষ গাইতে দেওয়া। আমাদের সংগীতের পদ্ধতিতে কণ্ঠের একাকারই প্রচলিত, এতে বৃন্দগান তৈরি হতে পারে না—একথা পূর্বে বলেছি। মন্দ্র, মধ্য এবং তারা স্বরের কণ্ঠ সম্বন্ধে এবং এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আওয়াজের তারতম্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান

দরকার। সুখের বিষয়, যদিও শ্রীচৌধুরী আধুনিক গানের রূপকে তেমন ভাবে সমর্থন দিচ্ছেন না কিন্তু স্বীকার করেছেন যে আধুনিক গানের বর্তমান রচনায় সুরকারের কাজ যে ভাবে চলেছে আজ পর্যন্ত তাকে স্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নি। সুরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলে এ ব্যাপারে আর একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

মোটামুটি, শিল্পীকে লঘুসংগীতের পথে পরিচালনার দায়িত্ব আজ নিয়েছেন সুরকার ও প্রযোজক। কণ্ঠকে বাছাই করা, কণ্ঠের গ্রাম-পরিক্রমণ ক্ষমতা অনুসারে সুর প্রয়োগ করা, প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির পথপ্রদর্শন—সুরকার প্রয়োজকের দায়িত্ব। এ সমস্তের মূলে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সার্থকতাও নির্দেশ করা যায়। অর্থাৎ কোন কণ্ঠকে কি ভাবে ব্যবহার করলে অভিনবত্ব সৃষ্টি হতে পারে? বহুকালে যে কণ্ঠ জনসাধারণের কানে একঘেয়ে হয়ে গেছে, সুর-প্রয়োগ ও প্রয়োজনার গুণে তাকে স্বাতন্ত্র্য দান অনেকটা সুরকারের উপর নির্ভরশীল। যে কণ্ঠ তারা গ্রামে আর বহুবিস্তৃত হয় না—তাকে সংকোচন করা, যে কণ্ঠ মন্দ্র স্বরে বিশেষ রস সৃষ্টি করতে পারে তাকে প্রয়োগ করা, সমবেত সম্মিলিত বিশেষ বিশেষ কণ্ঠগুলো কি ধরণের প্রভাব সৃষ্টি করবে বুঝে নেওয়া—এ সকলই সুরকারের দায়িত্ব।

সংগীত-প্রযোজনায় সুরকার

১

কয়েকজন সুরকারের কথা আধুনিক গান আলোচনা সম্পর্কে উদাহরণরূপে উল্লেখ করেছি,—এঁরা স্বর্গত হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, সুধীরলাল চক্রবর্তী, শৈলেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত ও অনুপম ঘটক। সুরকার সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নেই বলে আধুনিক গানের পটভূমিকার আড়ালের এই সমস্ত কারিগর সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার মনে করি। সংগীতশিল্পীর প্রাধান্য সম্বন্ধে শ্রোতা 'সচেতন', কিন্তু দক্ষ সুরকারের সুর ও প্রযোজনের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকায় কোন কোন সংগীত-সমালোচককেও দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলতে দেখা যায়। সুরকারের দক্ষতা কারিগরির রূপেই প্রকাশিত হয়। তিনি যেন সত্যি একজন craftsman—ব্যবস্থাপনা ও কুশলতাই যেন তাঁর কাজ। শিল্পী নির্বাচন, রূপ-বাতলানো, সংগীতের সহযোগিতা সম্বন্ধে ভাবনা—এসব কাজই তাঁকে করতে হয়, সুর-শিল্পীর বা গায়কের মনের ভাবনা এঁর নয়। কিন্তু সুরকারের কাজ যে শুধু কারিগরি নয়, তিনি যে স্বতন্ত্র একটি সংগীত-জগতে প্রবেশ করবার একমাত্র পথপ্রদর্শক একথা জানা দরকার।

নজরুলের সমসাময়িক কালে যাঁরা লঘুসংগীতের সুররচনায় প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়ে একাজের পথপ্রদর্শক হয়েছেন তাঁদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় ও হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। দিলীপকুমার প্রথমে সুরসংযোজনায় অংশ-তানের ব্যবহার করেন। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের গান, কিছু কিছু প্রচলিত ভক্তিমূলক গান এবং সমসাময়িক কাব্যগীতি নানা ভাবেই প্রচারিত করতে চেষ্টা করেন। বিশিষ্ট কোন লক্ষণ দ্বারা তৎকালীন দিলীপকুমার রায়ের সুরকারের কাজ ব্যাখ্যা করা যায় না, যেমনটা করা যায় হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের কাজ। হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্যের গীতি অবলম্বন করে প্রথমে রাগসংগীতের রূপে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেন। যদিও গোড়া পত্তন হয়েছিল রবীন্দ্রসংগীতে, কিন্তু রাগরূপের প্রতিফলনই হিমাংশুকুমারের রচনায় জনপ্রিয় ও সার্থক হয়ে ওঠে। সুরসাগর সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী 'সংগীত-পরিক্রমা' গ্রন্থে লিখেছেন, গজল দিয়ে সুর যোজনার কাজ সুরু করেছিলেন। পরে আদ্ধা ও কার্ফাতে কিছু গান রচনা

করেন। এর পরের যুগে সুর-রচনায় হালকা ভাব কমে আসে এবং গানের বিভিন্ন স্তরের সুর-যোজনা সম্বন্ধে ভাবলেন ("রবীন্দ্র-সংগীতের অলস মাধুর্য যেমন তাঁর সঞ্চারীতে, হিমাংশু দত্তও তাঁর গানের সঞ্চারীগুলিতে তাঁর হৃদয়ের সঞ্চিত মাধুর্য নিঃশেষে ঢেলে দিলেন")। এ সময়ে কিছু ঠুমরী-ভাবান্বিত গানও রচনা করেন। এরপর তাঁর ঝোঁক গেল হিন্দী খেয়াল ভেঙে গান রচনার দিকে—এসব গানে "খাঁটি বাংলা সুরের আদল এসে গেল"—তাকে "আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করল"। গানগুলো: "যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরেগো দ্বারে", "আলোছায়া দোলা", "মম মন্দিরে এলে কে তুমি", "মধুরাতে আজি", "নতুন ফাগুনে যবে", "ফাগুনের সমীরণ সনে", "ছিল চাঁদ মেঘের পারে", ইত্যাদি। এরপর সিনেমাতে যোগদান করেছিলেন সুরকার হিসাবে। কিন্তু পরবর্তী কালের রচনা "তাজমহল", "প্রেমের না হবে ক্ষয়", "চাঁদ ভোলে নাই চামেলিরে তার", প্রভৃতি গানে তাঁর রচনার পূর্বধারাটি বজায় রয়েছে। নির্বিচার রাগ-মিশ্রণ তিনি করেননি।

হিমাংশু দত্তের সুর-রচনা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে হিমাংশুকুমারের রচনা রাগ-নির্ভর, কিন্তু "রবীন্দ্র-অনুসারী" বলা যায় না। হিমাংশুকুমারের গান রাগসংগীত নয় একথা সত্য। তিনি বাংলার জারক রসে গানের সুর জারিত করে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। অলঙ্কারের ব্যবহারের দ্বারাই হিমাংশুকুমার পূর্ব যুগ থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ অলঙ্কারের প্রশ্রয় দেন নি। হিমাংশুকুমার অলংকারে বৈচিত্র্য এনেছেন (দিলীপবাবুর সার্থক উক্তি অনুসরণ করে বলব) "চূর্ণ সুরের ঢেউ"এ। খেয়াল ও ঠুমরীর অন্তর্গত কতকগুলো বিশেষ ধরণের খণ্ডতান, ঝটকা ও বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ মীড়ের রাগ-অনুসারী প্রয়োগের মধ্য দিয়েই এই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। হিমাংশুকুমার দত্তের রচনায় আবেগ-প্রবণতার প্রবাহ ছিল। নজরুলের মধ্যেও কোথাও কোথাও আবেগ-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের নতুন সৃষ্ট গজল-ভঙ্গিম গানের চটুলতা বোধহয় হিমাংশুকুমারের রচনাকে গোড়ার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু হিমাংশুকুমার ভাতখণ্ডে পদ্ধতির খেয়ালী ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে নিজের পথ বেছে নিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, সুরবোধ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রত্যয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার মত সৌন্দর্যবোধ হিমাংশু দত্তের ছিল। সুরকারের সম্পূর্ণ সার্থকতা নির্ভর করে নির্বাচনী শক্তিতে। সব দিক থেকেই তিনি সার্থকতা অর্জন করেছিলেন—গীতি নির্বাচনে, শিল্পীর গুণাগুণ-

নির্বাচনে। এ সকলের মধ্যেই ভাবনার সুসংগতি এবং চিন্তার ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্যুত হন নি। সুরকারের সৃষ্টিতে ধারাবাহিক সুসংগতি হিমাংশু দত্তের বৈশিষ্ট্য। আপনার ভাব-সমগ্রতাকে তিনি আগাগোড়া সংরক্ষণ করেছেন। সমসাময়িক শৈলেশচন্দ্র দত্তগুপ্তের রচনাও অনেকাংশে রাগ-নির্ভর ছিল। কিন্তু ছন্দের গতি সৃষ্টি ও বৈদেশিক রূপ আহরণের কাজ করেও শেষ পর্যন্ত শৈলেশচন্দ্র ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার কোন স্পষ্ট ছাপ রেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু এঁর সুকৌশল প্রয়োগরীতিও সামান্য ছিল না।

হিমাংশুবাবুর কিছু পূর্ব থেকেই নজরুলের সুর-রচনার সুরু হয়েছিল এবং গজল গান ও দেশাত্মবোধক গান প্রচারিত হয়েছিল। সুর-সংযোজনার দিক থেকে নজরুলের ভাবনার অবকাশ বেশি ছিল না। একথা ব্যাখ্যা করেছি এবং রাগসংগীত ও প্রচলিত গানের বহু বৈচিত্র্যই নজরুলকে আকর্ষণ করেছিল, একথাও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুর নিয়ে নজরুলের মাতামাতির অন্ত ছিল না। যে গানই ভাল লাগত, যে সুরই কানের মধ্য দিয়ে ছন্দ সহকারে এসে উপস্থিত হত, তাকে নজরুল সমগ্রভাবে একটি গানের আধারে সংগ্রহ করতে চাইতেন। এ কথাটি বেশ বোঝা যায় তৎকালীন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর জন্যে নজরুলের অজস্র রচনা প্রসঙ্গে। নিম্নলিখিত কতকগুলো ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের জন্যে নজরুল গান রচনা ও সংগীত পরিবেষণের কাজে যুক্ত ছিলেন: (১) হারামণি—এই নামে হারিয়ে যাওয়া রাগকে বাংলা গানে রূপদান, (২) নবরাগমালিকা—নতুন সমন্বয়-মূলক রাগরূপের বাংলা গান এবং (৩) গীতি বিচিত্রা—প্রাচীন ভাবধারা অথবা নতুন বিষয়বস্তু অবলম্বনে প্রতিটি অনুষ্ঠানে কয়েকটি করে গানের রূপকানুষ্ঠান। এই তৃতীয় অনুষ্ঠানটিতেই 'কাবেরী নদীতীরে' গীতি আলেখ্যটি প্রচারিত হয়েছিল, এবং এর আরো দুটি পরিচিত রূপক "ছান্দসী", "কাফেলা" ইত্যাদি। এই সকল পরিকল্পনার মূলে ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। রাগের রূপ বাংলা গানে ধরে দেবার জন্যে নজরুলকে ইনি সাহায্য করতেন। নজরুল রাগকে গানের আধারে বসিয়ে দিতেন। এসব গানগুলো প্রকৃত ব্যবসায়িকভাবে প্রযোজনার সুযোগ পেলে রাগ-অনুসারী বাংলা গানের একটা বিশেষ দিক প্রসারিত হত সন্দেহ নেই। বেতারে প্রচারিত বিষয়বস্তু ও প্রযোজনায় মূলত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন বলেই নজরুল নিজ সৃষ্টিকে পরিবেষণ করে নিষ্কৃতি পেতেন। গীতসৃষ্টির

প্রাচুর্যের জন্তেই নজরুল প্রযোজনা ও সংরক্ষণের দিকে নজর দিতে পারেন নি, সময়ের স্বল্পতা ও সহায়হীনতা এর কারণ বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্য যে গানগুলোতে সুরযোজনার পর উপযুক্ত কণ্ঠে ও যান্ত্রিক সহযোগিতায় রূপদান যাঁরা করতে পারেন, সেরূপ প্রযোজকের সংস্পর্শ ছিল শুধু গ্রামোফান রেকর্ডের ক্ষেত্রে। তৎকালীন গানকে ধরে রাখার ব্যাপারে গ্রামোফোন রেকর্ডই কতকটা কাজ করেছে এবং তা হয়েছে প্রযোজনার জন্তে। এ সব অনুষ্ঠানের কয়েকটি গান এরূপ সহযোগী সংগীত-প্রযোজকের জন্তেই আজ কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। নজরুলের মৌলিক রাগসংগীতের আকর্ষণের পক্ষে মঞ্জুসাহেব ও জমিরুদ্দিন খানের সংসর্গের কথা অনেকে বলেন। বহু বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য থাকায় এবং বিশেষ করে কবিমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিরন্তর ভাষা রচনায় যুক্ত থাকায়, সুর রচনা করবার পরের কাজের জন্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজকের ওপর নির্ভর করতে হত। অর্থাৎ, সুর প্রযোজনার জন্তে যে যে ভাবনা সুরকারকে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলে নজরুলের সেই অবকাশ ছিল না। যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে নজরুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীকমল দাশগুপ্ত, গিরিণ চক্রবর্তী, চিত্ত রায়, শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই নজরুল সুরের বহু বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে পেরেছিলেন। নজরুলের সুরের কাঠামোটা মুক্ত ছিল বলে, বিশেষ করে রাগসংগীতের গায়ক বাঁধাবাঁধির মধ্যে ঠেকে থাকতো না। এই স্বাধীনতা দেবার জন্তে নজরুলের বহু রচনা একটা স্থির রূপের পরিসরের মধ্যে আসে নি। এজন্তে সুর রচনায় সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। এদিক থেকে যদিও নজরুলের রচনা আধুনিক যুগের প্রারম্ভ সূচনা করে, সুরকার হিসেবে নজরুলের গভীরতা ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করা যায় না। কিছু রচনা আবেগ-প্রধান, কতকগুলো চটুল রূপান্তর (সুরকারের সুষম রচনায় "অনুকরণ" শব্দটি আমি ব্যবহার করব না যদি রচনাটি নিতান্ত অনুবাদ না হয়), কিছু কিছু রচনা কথার ঐশ্বর্যে এবং বৈদেশিক ভঙ্গিকে উদ্ভাবন করবার কায়দায় চমকপ্রদভাবে মৌলিক হয়েছে। নজরুলের সুর-রচনায় ধারা-বাহিকতা ও পদ্ধতির কোন নিশ্চিত লক্ষণ নেই বলে আজ নজরুল-রচনা আধুনিক গান থেকে স্বতন্ত্র পথ বেছে নেয় নি। এজন্তেই আধুনিক সংগীতদেহে সুরকার নজরুল ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন।

যাঁরা নজরুলের সুরযোজনা ও প্রযোজনায় ভার নিয়ে তাঁর কাজটি সমাপ্ত

করেছেন তাঁদের মধ্যে ইনি কমল দাশগুপ্তের অভিজ্ঞতাকে সার্থক প্রেরণা দিয়েছিলেন। কমল দাশগুপ্তের সহজ সুর-রচনাকে এভাবেই বিশ্লেষণ করা চলে। হিমাংশু দত্ত একশ্রেণীর গানে সুরকলি চয়ন, নির্বাচন এবং প্রয়োগ-বিধিতে নজরুল থেকে আরো ভাবগভীর, ধীর এবং অনিবার্য। একটু বিশ্লেষণ করলে এ অভিজ্ঞতাই মিলে। যে কোন emotional বা আবেগপ্রধান রচনায় যে গুণ আছে নজরুলের সুর রচনা সে গুণে বিশেষত্ব লাভ করেছে বলেই, কোন কোন গানের সুর বাক্য-সমৃদ্ধির সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়ে প্রবল বেগ সৃষ্টি করেছে এবং গতি অর্জন করেছে। মার্চের গান বা বীরত্বব্যঞ্জক সুর রচনা সে পর্যায়ের। রাগপ্রধান নামে আজও প্রচলিত গানগুলির সুরে নজরুল আত্ম-বিলোপ করে শিল্পীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। শ্যামাসংগীত রচনায় নিজেকে ট্রাডিশনের সঙ্গে একাত্ম করেও মৌলিকতা রক্ষা করেছেন—মৃণালকান্তি ঘোষের গাওয়া গানগুলো একথাই প্রমাণ করে। হিমাংশু দত্তের সুর রচনা এই দুটো লক্ষণ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। মোটামুটি হিমাংশু দত্ত সম্বন্ধে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের দুটো উক্তি স্মরণ করি—"নব ভঙ্গিম বৈদেশিক ভঙ্গি, ঠুমরীর উৎকর্ষ", "চূর্ণ সুরের ঢেউ" এবং মূল প্রেরণা "ধ্যানপ্রতি" বা "ধ্যান-দৃষ্টি"—যেসব গুণে সুরকারের কল্পনাশক্তি ক্রিয়াশীল হয়। এই কল্পনাশক্তি রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ যুগের কল্পনাশক্তি নয়। অর্থাৎ সে যুগের মত সুরকলি-নির্বাচন প্রক্রিয়া সাদামাঠা নয়। শিল্পের জীবন্ত মূর্তি অনেকটা mechanised বা 'প্রস্তরীভূত' তা প্রচার যন্ত্রের জন্যই হোক আর যন্ত্র প্রসারের ফলেই হোক। নজরুলকে আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ পংক্তির মনে হয় কিন্তু নজরুল সুর-রচনার দিক থেকে অনেকটাই বাস্তবমুখী, অর্থাৎ সুরের পর সুর চয়ন করেছেন অপরিসীম আহরণী শক্তি নিয়ে, যে কোন লক্ষ্যভূত সুরকে টেনে নিয়ে আসতে দ্বিধা করেন নি আর শ্রোতা এবং শিল্পীর দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

আধুনিক গানের আলোচনা সম্পর্কে সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুর-রচনার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুধীরলালের সুর-রচনায় ধারাবাহিকতা আছে, অর্থাৎ অধিকাংশ রচনার মধ্যে সংগতি আছে একথা অনস্বীকার্য। সমসাময়িক সুরকারদের মধ্যে সুধীরলাল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছিলেন। কিন্তু রাগ-সংগীতের অভিজ্ঞতা এবং পরিবেষণ ক্ষমতা তাঁকে সুরকারে পরিণত করেছিল। সুরকারের প্রকৃতির জীবনে অভিজ্ঞতার নানা স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া

বিশেষ প্রয়োজন। নিয়মিত অভিজ্ঞতা এবং ক্ষেত্র-প্রস্তুতি না হলে সুর-নির্বাচন ও সংযোজনার কাজে মানসিকতার স্ফূর্তি হয় না। গুণী সংগীত-সমালোচক সাহিত্যিক কিংবা শিল্পীর সঙ্গে আলোচনা করে মনে হয়েছে, এখনো অনেকেই ভাবেন যে সুরকার হবার ক্ষমতাটি স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। যেহেতু কোন সংগীতরসিকের বাড়িতে সংগীতের ট্র্যাডিশান গড়ে উঠেছে এবং কিছু গান করতে তিনি সক্ষম, সেই হেতু সুরকার হবার দাবীও তাঁর আছে—ঐ চিন্তাটি সংগীতের ক্ষেত্রে মারাত্মক রকমের ভুল ধারণা। অর্থাৎ "যেহেতু আমি গান ভালবাসি বা ভাল গান শিখেছি, সেহেতু আমি সুরকার হতে সক্ষম"—এরূপ চিন্তা অপাংক্তেয়। "আমি যেহেতু গীতি-রচয়িতা, এবং অতীতে গীতিকাররা সুরকার ছিলেন, সেহেতু আমি সুরকার"—এ দাবীও আজ অচল। এমনও উদাহরণ প্রচার-যন্ত্রের মাধ্যমে গোচরে আসা সম্ভব হয়েছে যে হঠাৎ কেউ কেউ সুরকার রূপে স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। হঠাৎ কোন গায়ক একটি গান রচনা করে সার্থক হলেন এবং গানটি সাধারণ্যে চমকপ্রদ রূপে প্রচারিত হল, কিন্তু তা বলে সেই মুহূর্ত থেকে কেউ সুরকারে পরিণত হলেন এমন কথা স্বীকার করা যায় না। সুরকারের কাজটি এধরণের নয়। নির্বাচন-প্রক্রিয়া, যন্ত্র-সংগীতের অভিজ্ঞতা এবং সুর ও সুরকলির গ্রহণ-বর্জনের কাজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এগিয়ে যায়। যে সুরকারের তৈরির গোড়ায় সুর-প্রয়োগ সম্বন্ধে রীতিমত চিন্তাশীলতা নেই তিনি সত্যিকারের সুবকার নন। যেদিন থেকে সুর সম্বন্ধে চিন্তার প্রবাহ (বা process) সুরু হয়ে পথ চলবে তখন থেকেই সুরকারের কার্যধারা সুরু। সুধীরলালের স্বল্প বয়সের মধ্যেই এই ধরণের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার অবকাশ হয়েছিল, যা হয়ত তখনকার বহু সুপ্রতিষ্ঠিত গায়ক-বাদকেরও হয়নি। সে জন্যেই সুধীরলালের সুর-রচনায় রাগ থেকে সুরকলি সংগ্রহ, ছোট ছোট অংশ-তানের ব্যবহার, সহজ কিন্তু একটু কারিগরি-প্রসূত সুর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। পূর্বেই বলেছি মোলায়েম কণ্ঠ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এবং তারস্বরের ও মধ্যমগ্রামের স্বরের দূরত্ব ঘুচিয়ে একসংগে স্বর স্থাপন করার কাজটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সরল প্রকৃতির দুএকটি গানের কথা ও সুরের সামঞ্জস্য সাধনের কৃতিত্বও কম নয় (একটি গানের বিষয়বস্তু—'মাকে মনে পড়ে')। আধুনিক গানের রীতি অনুসারী একটি ক্ষীণ ধারা সুধীরলালের স্বরসংযোজনার ফলশ্রুতি বলে কেউ কেউ বলেন। সম্ভবত, শ্যামল মিত্র সুধীরলালকে অনুসরণ করে কাজ আরম্ভ

করেছেন, যদিও ক্রমবিকাশ, বিবর্তন, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সঙ্গে পরিণতি ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ আশা করা যেতে পারে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের অসংখ্য অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বহু অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে তাঁর রচনা বিশিষ্ট লক্ষণ অর্জন করেছে। গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রচারিত দুএকটি গান ছাড়া অধিকাংশ রচনাই আকাশবাণী লঘুসংগীতের রম্যগীতি নামক অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। যে ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শ্রীঘোষকে নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছে তা হচ্ছে সংক্ষেপে : (১) যন্ত্র ব্যবহারে পাশ্চাত্য সংগীতের "হার্মনি"কে এদেশীয় মেলডির আনুগত্য রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার, (২) সমবেত কণ্ঠে অথবা যুগ্ম কণ্ঠে যৌথ-গানের বহু প্রকারের মার্জিত অভিব্যক্তি ('মার্জিত' শব্দটি ব্যবহার করবার কারণ, বহু অনুকরণশীল অমার্জিত যৌথ-গান আবহ সংগীতের সঙ্গে মিশিয়ে চলচ্চিত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত করে প্রচারিত করা হচ্ছে,—যেখানে বৈদেশিক প্রভাব, "জাজ্"-সংগীতের প্রয়োগও অত্যন্ত স্থূল ভাবে হয়ে থাকে), (৩) সমবেত কণ্ঠের যৌথ-গান শুধু কণ্ঠসামঞ্জস্যে যন্ত্রসহযোগিতা ছাড়া তৈরী, (৪) একক রাগের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে সুর প্রয়োগ, (৫) গানের যন্ত্রসংগীত সহযোগিতায় বিভিন্ন রকমের যন্ত্রের প্রয়োগ (যথা—শাহ্‌নাই ব্যবহার), (৬) তালযন্ত্রের বিচিত্র ব্যবহার এবং (৭) কোথাও কোথাও আবহসংগীতের ব্যবহার।

যন্ত্রসংগীতের সহযোগিতায় সূক্ষ্ম কারুকলা ও সুর সন্নিবেশের কায়দা আমরা অনেকটাই পাশ্চাত্য সংগীতের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। বিশেষ করে বাদ্যবৃন্দের মারফতে সুরকলিতে স্বর-সংগতির (harmony) সৃষ্টি এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা দরকার। এ বিষয়ে বহু সুরকারই আজ নানা ভাবে সুর রচনা ও প্রযোজনা করছেন। শ্রীঘোষের সুর প্রযোজনার পেছনে একটি গৌণ (mild) এবং রাগ অনুসারী স্বরসংগতি বা harmony সৃষ্টির চেষ্টা আছে। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বিশেষ কতকগুলো রচনার বৈশিষ্ট্য যা লক্ষ্য করেছি, তাতে বলা চলে, গানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রেখে তাতে যন্ত্র সহযোগিতায় সুষম রূপ-দান করবার লক্ষ্যই প্রধান। বহু পল্লীগীতিকে সংগতিপূর্ণ যন্ত্র সহযোগিতার ব্যবস্থা ও প্রযোজনা করে দেখিয়েছেন—গানের মৌলিক রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে সুনির্বাচিত, সুপরিচ্ছন্ন প্রযোজনায় সার্থক ভাবে, সুরের প্রতীক রূপে উপস্থাপিত করা যায়। শ্রীঘোষের সুর-সংযোজনায় গানের মধ্যে উচ্চারণের

স্বাতন্ত্র্যে যতি ও জোরের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রাগের নির্বাচিত অংশ-যোজনাও একটি বিশেষ গুণ।

সম্প্রতি বৃহত্তর ভারতের সংগীতে এমন একটা রূপ-সংহতির দিন এসেছে যে বাংলা আধুনিক গানের বিশিষ্ট রূপ বলে আর কোন কিছু বিশিষ্ট প্রকৃতি অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ সুরকার ও প্রযোজকের দিক থেকে গান অনেকটা তাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজকে বাংলায় যা আধুনিক হিন্দীর সে ভঙ্গিটাই গীত্ এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষ করে ওড়িয়া অসমীয়া ভাষায়ও তা আধুনিক। রচনার মূল্য নিরূপণ, উৎকর্ষ বিচারের পন্থা এক। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বহু সুর সংযোজনার সুষম রূপ পাওয়া যাবে কিছু সংখ্যক হিন্দী গানে। হিন্দী ভজনগুলোতে স্বরসংগতি (harmony) প্রয়োগ করা হয়েছে ভাবরূপ রক্ষা করে। বহু পুরোনো ভজনে সুরের আশ্চর্য প্রয়োগ করেছেন। বিশেষ করে কয়েকটি হিন্দী গীতের রূপ সুর-সমৃদ্ধির উৎকর্ষ প্রমাণ করে। যাঁরা সুর-রচনার কৌশল সম্বন্ধে অবহিত আছেন শ্রীজ্ঞান-প্রকাশ ঘোষের সুরকে তাঁরা চিনে নিতে পারেন—এটা সুরকারের চারিত্র বলা বলতে পারা যায়। সুরকারের বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে একথা বলা হচ্ছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পূর্বযুগের সুরকারগণ গতানুগতিক নিয়ম অনুসারে কানে ভাল শোনায় এমন সুরকলির ব্যবহার করতেন, এবং গানের সুরের বিকাশের মধ্যে সংগতিপূর্ণ আকর্ষণীয় অংশ ব্যবহার করতেন। যথা—শুদ্ধ স্বরে পঞ্চমযুক্ত কোমল ধৈবত, কোমলনিষাদ যুক্ত ধৈবত, মধ্যমযুক্ত কোমল গান্ধার, কোমল নিখাদের সুসম্মিলিত প্রয়োগ ইত্যাদি। এজন্যে ভৈরবীসুর কানে ভাল শোনায় বলে সেই প্রচলিত সুরগুচ্ছের ব্যবহার যে বাংলা গানে কত বেশি করে হয়েছে, তা গুণে শেষ করা যায় না। সুরকে মনোহারী করবার এসব কায়দা অনেকেই জানেন। কিন্তু পঞ্চম থেকে শুদ্ধ ধৈবত নিখাদের সুর মিশ্রণ—এসব ধরণের কায়দা, যাকে বিশিষ্ট সুরকে লাগাবার কায়দা বলা হয়ে থাকে, এই উদ্ভাবনের চিন্তা শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের গানের মধ্যে দেখা যায়। অর্থাৎ যে কোন সুর থেকে যে কোন সুর ব্যবহারের বেলায় দূরত্বকে এবং সরল রীতিকে পাশ কাটিয়ে কৌশলপূর্ণ মনোহারী প্রয়োগের কথা বলছি, যেধরণের কৌশল রাগসংগীতের ঠুমরী গানের রীতিতে ষড়জ পরিবর্তন দেখিয়ে করা হত। এটা উদাহরণ মাত্র। বাংলা গানে এযাবৎ অধি-কাংশ ক্ষেত্রেই সরল রীতিই চালু ছিল। প্রচলিত সহজ রীতিতে সুরের ছোট

ছোট সন্নিবেশের এরূপ ভাবনা পূর্বযুগের গীতিকার-সুরকারের যুগে হয়নি গীতিকার-সুরকারের গান সাধারণত pattern বা রূপকল্প-পন্থী ছিল। এমন কি নজরুলের সুরেও রূপকল্প বা pattern-এর যথেষ্ট অবলম্বন হয়েছে। সাধারণভাবে যা discord বা বিস্বর হতে পারে তাকে স্বর-ঐক্যের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা এ যুগের সুরকারের বিশেষ একটি experiment বা পরীক্ষা। আধুনিক সুরকারেরা বহুক্ষেত্রেই প্রচলিত pattern থেকে মুক্তির চেষ্টা করেছেন। এবিষয়ে শ্রীসলিল চৌধুরীর কথা পরে বলব। Pattern বা গতানুগতিক রূপকল্প থেকে মুক্তির একটি প্রবল প্রতিভা শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। শ্রীঘোষের এসব অভিজ্ঞতার গোড়াপত্তন শুধু গানের মধ্য দিয়ে হয় নি, যন্ত্রসংগীতের অভিজ্ঞতা এবিষয়ে মনের মধ্যে ক্রিয়া করেছে। সম্ভবত প্রথমে রেকর্ডে যন্ত্রসংগীতের (গীটারে) সহযোগিতায় আত্মপ্রকাশ করেন, এবং এরূপ যান্ত্রিক সুর-প্রকরণ অভিজ্ঞতাকে পরিণতির পথে নিয়ে গিয়েছে।

সুরকারের সুরসংযোজনা ও প্রযোজনার কাজের দ্বারা শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা সুর অবলম্বনে শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করবার জন্যে যে বিশেষ ক্ষমতার স্ফূর্তি দেখা যায়—তাকে কল্পনাশক্তির ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। কল্পনাশক্তিই গান নির্বাচন ও গানের সুরসৃজনে সহায়তা করে। এই শক্তিকে দিলীপবাবু "ধ্যানদৃষ্টির" ক্ষমতা বলেছেন। আধুনিক কালে এমন একটি অভাবনীয় প্রতিভার অধিকারী শ্রীসলিল চৌধুরী। বহু রচনার মধ্যে তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্য দেখা গেছে। গতানুগতিক pattern বা রূপকল্প থেকে মুক্তির এমন প্রতিভা পূর্বে দেখা যায়নি। এক একটি গানের সুর-সংযোজনায় অভাবনীয়তা ও বিস্ময়-রসের ফসল ফলিয়েছেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে বহু গান প্রযোজনায় শ্রীচৌধুরীর কল্পনাশক্তির কৌলীন্য অনস্বীকার্য। Pattern বা বাঁধা ছক থেকে তাঁর মুক্তির কথাও স্বীকৃত। তাঁর সুরকলি আহরণের কোন বাঁধা নিয়ম নেই এবং গানের সুরের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে ভাবনাও গৌণ। সুরগুচ্ছ ও সুরকলি উদ্ভাবন এবং এর মধ্যেই ভাব-সন্নিবেশ শ্রীচৌধুরীর রচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। কথাবস্তুর আইডিয়াকে খাড়া রেখে সম্পূর্ণ মেলডি অথবা বিভিন্ন ধরণের সুরকলি সংযোজনাই এঁর কাজ। কোথাও আবহসংগীতের ব্যবহারও দেখা যায়। এ যুগের অন্যান্য সেরা সুরকারদের মধ্যে এজন্যে শ্রীসলিল চৌধুরীর অনন্যতা আছে এবং আছে স্বাতন্ত্র্য। মনে হয় পরীক্ষা নিরীক্ষার

প্রচেষ্টা তাঁর নেই। শ্রীচৌধুরীর সুর-রচনায়, অধিকাংশ সংযোজনাই ভাব-নির্ভর এবং গ্রন্থনের মধ্যে রূপ-রেখাগুলো স্পষ্ট। সলিল চৌধুরী দক্ষ কারিগর। স্বতন্ত্র প্রকৃতির সুরকলিগুলোর একযোগে কৌশল-প্রয়োগ শ্রীচৌধুরীর রচনায় ভাবগভীর রং সৃষ্টি করে। সলিল চৌধুরীর সুরজগৎটি বড় ব্যাপক। নিজের রচিত রূপকল্পগুলো কিভাবে মনের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। মোটামুটি এগুলো কল্পনাপ্রসূত ও ভাব-নির্ভর। সলিল চৌধুরীর সুরের কল্পনা সর্বত্রই প্রচলিত রূপ অবলম্বন করেই দাঁড়ায় একথা বলা চলে না। গ্রন্থন পদ্ধতিতে বাস্তবমুখিতা লক্ষ্য করবার মতো। কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে ইনি আধুনিক গানের সুরকারদের মধ্যে সেরা দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক। এ পর্যায়ে নির্বাচনী ও উদ্ভাবনী শক্তিতে শ্রীসুধীন দাশগুপ্তের ধারাবাহিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রী নচিকেতা ঘোষের কৌলীন্য উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৌধুরীর ধারাটি অনুসৃত হয়েছে কিনা বলতে পারি না, অর্থাৎ মৌলিক সুররচনায় পূর্বসূরীর আনুগত্য বলে কিছু থাকা সম্ভব কিনা তাও বলা যায় না। কল্পনা, চিন্তাশক্তি, ধ্যানদৃষ্টি, রূপকল্প সৃষ্টি, যন্ত্রসন্নিবেশ, আবহসংগীত সংযোগ প্রভৃতি সুরকারের অন্তঃস্থ প্রকৃতি এবং গানের ছন্দ ও গতি ও কথার প্রকৃতি প্রভৃতির গাঁথুনি প্রতি সুরকারকে স্বতন্ত্রভাবেই ক্রিয়াশীল করে তোলে।

২

সুরকারের অভিজ্ঞতা-প্রসূত কর্মশক্তি সুরের গাঁথুনিতে কিরূপে বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল হয় তার বিশেষ উদাহরণ স্বরূপ দুজন সুরকারকে একযোগে বর্ণনা করছি। (আমাদের উদ্দেশ্য কোন সুরকারের সমালোচনা নয়, শ্রোতা ও সমালোচকের দিক থেকে সুরকারের কাজটি বুঝে নেবার উদ্যোগ মাত্র, কারণ এসম্বন্ধে নানান ভ্রান্ত ধারণা চলিত আছে, একথা আগেই বলেছি।) কতকগুলো রূপকল্প বা pattern রচনার বৈশিষ্ট্যে একজন সুরকার অন্য সুরকার থেকে স্বতন্ত্র। সুরের গাঁথুনিতে অলঙ্কারের রচনা দুজন সুরকারের রীতির তারতম্য দেখিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকমল দাশগুপ্তের সাধারণ সুরের গ্রন্থন এবং শ্রীঅনিল বাগচীর আলঙ্কারিকতা ও চূর্ণ সুরের কারুকর্ম—এ দুটোতে দুয়ের স্বাতন্ত্র্য আছে। এক যুগে শ্রীকমল দাশগুপ্ত সরল সহজ ও স্বচ্ছ সুরকলি প্রয়োগ করে শ্রোতার মন কেড়ে নিয়েছিলেন। এইরূপ গীতের নির্বাচনে এবং সুররচনার সংগতিতে শ্রীকমল দাশগুপ্তের সরলতার একটা বিশেষ

ধারাবাহিকতা আছে। অন্যদিকে অনিল বাগচীর আছে—চূর্ণ সুরের আঁকা বাঁকা রেখাসৃষ্টির প্রবণতা। সূক্ষ্মতা ও জটিলতায় মনের ভাবস্থাপনের কারুশিল্প বুদ্ধি প্রয়োগের ইচ্ছে জানায় এবং এই রীতিতে সাধারণ শ্রোতার কাছে খ্যাতি অর্জনের পথ কতটা থাকে বলা মুস্কিল। কিন্তু একথা সত্য যে সুরকারের কাজের মধ্য দিয়ে এরূপ একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেলে তাকে বুঝতেও অসুবিধা হয় না। তা বলে শ্রীঅনিল বাগচী সাধারণের কান থেকে দূরে নন। তা না হলে দু একটি চিত্রগীতির সুররচনায় ইনি সার্থক হতেন না।

সরল ও সহজ গতানুগতিক রূপকল্প নিয়ে যারা সুর সংযোজনার কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রবীণ—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক। ভাবনার চেয়ে অভ্যাসের ও অনুভবের চাপ শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের মধ্যে রূপ লাভ করছে, সেজন্যে রবীন্দ্র-অনুসারী সুর রচনার ছবি শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের মধ্যে ব্যাপক ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। সুরকার হিসেবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে শ্রীমল্লিকের স্থান অপ্রধান, কিন্তু আকাশবাণীতে প্রচারিত রূপক "মহিষাসুরমর্দিনীর" মধ্যে বহুকালব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসলরূপে তাঁর সুর প্রযোজনার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারে। একক সুর প্রযোজনা থেকে ক্রমশঃ হার্মনির দিকে শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের লক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এই রূপকটিতে সুরের দ্বারাই ভক্তিমূলক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীপঙ্কজ মল্লিকের রচনায় দৃঢ়তা এবং স্পষ্টতার, boldness ও robustness-এর সঙ্গে কমনীয়তার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

প্রখ্যাত শিল্পী বা গায়কদের মধ্যে আরো দুজন সুরকারের উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। এঁরা—শ্রীশচীন দেববর্মন এবং শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শ্রীশচীন দেববর্মনের গানে যে অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়েছিল, সুরকার এবং প্রযোজক হিসেবে সে ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইনি হয়েছেন বলে মনে হয় না। আধুনিক বাংলা গানের সুরকার হিসেবে এখনো তেমন কোন ভাবনার বিষয় দাঁড় করিয়েছেন কিনা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় রাগানুসারী বাংলা গান এবং পল্লীগানের ভঙ্গিকে—বিশেষ করে কতকগুলো রূপকল্পকে বা patternকে তিনি সার্থক প্রয়োগ করেছেন। গায়কবৃত্তির সফলতা এবং উৎকর্ষ কখনোই সুরকারের উৎকর্ষের সমগোত্রীয় হতে পারে না। গায়ক-বৃত্তি স্বকপোল-কল্পিত সুর-সম্পর্ক ছাড়া স্বতন্ত্ররূপের সন্ধান দেবার মত অবসর পায়

কিনা সন্দেহ। সুরশিল্পীর দৃষ্টি আপনলোকেই ন্যস্ত। কিন্তু সুরকারের লক্ষ্য অন্যের উপর, সম্পূর্ণ objective—দুটো বৃত্তিই আলাদা রকমের। এদের মনের ক্রিয়াও সেইরূপ। এজন্যে গায়ক শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সুরকার মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র। শ্রীশচীন দেববর্মন সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে প্রায় একই ধারণা প্রযোজ্য। এঁদের মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা নিজের গীতরীতিকেই কেন্দ্র করে, তাই এখানেও শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরকার-বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তথাকথিত বা বাঁধা কতকগুলো রূপকল্প এবং ভঙ্গি ছাডা তেমন কিছু মূলধন মজুত পাওয়া যায় না। কয়েকটি চিত্রগীতিতে শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় সার্থক ও জনপ্রিয় সুরকার হয়েছেন। চিত্রগীতিগুলো উদ্দেশ্যমূলক বা purposive রচনা, art music গোত্রীয় নয়, অন্ততঃ সে কৌলীন্যের স্তবে উপস্থাপিত করা যায় না। চলচ্চিত্র-গীতিতে composer-এর বৈশিষ্ট্য যেরূপই প্রতিফলিত হোক, সংগীত রচনা ও সমালোচনার দিক থেকে তাকে ব্যবসায়িক সুররচনা বলেই ধরা যেতে পারে এবং এর লক্ষ্য একপেশে এবং একচোখো। স্বাধীন, সৃষ্টিশীল সুররচনা, কল্পনার বৃত্তি। চলচ্চিত্রগীতিতে স্বতন্ত্র বকমেব পরিকল্পনা বিশিষ্ট লক্ষ্যে পৌছোতে চায়। এখানে সুরকারের স্বাধীন ভাবনা ও সৃষ্টিমূলক শিল্প কদাচিৎ পরিস্ফুট হতে পারে এবং চলচ্চিত্রগীতির জন্যে একটি স্বতন্ত্র পংক্তি নির্দিষ্ট আছে দেখে সংগীত-রসিক হয়ত সন্তুষ্ট হন। যদি কোন চলচ্চিত্রগীতি অবলম্বন করে কোন মহৎ সৃষ্টি হয় বা কোন সুরকারের স্বাধীন সৃষ্টিক্রিয়ার প্রতিফলন হয়, তবে তার রচনার মূল্যায়ন হবে ভবিষ্যতে। সমসাময়িক যুগে তা সম্ভব নয়। সুরকারের মানসিকতা যদি দীর্ঘসময়ব্যাপী একটি ধারাবাহিকতা বা process-এর মধ্য দিয়ে কোন বিশিষ্ট রীতি ধরে দিতে পারে, তবেই তাঁকে বিশিষ্ট composer বলতে পারি। নয়ত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট চিত্র-গীতির সুররচনা অবলম্বন করে সুরকারের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বিশ্লেষণের সার্থকতা অন্ততঃ সাধারণ সংগীতের বা art musicএর ক্ষেত্রে গৌণ। কিন্তু আজকাল বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পথ নেই বলে, সকল প্রকার আলোচনাই একাকার হয়ে যায়।

গতানুগতিক রূপকল্প নিয়ে যাঁরা রচনা করছেন তাঁদের মধ্যেও নিশ্চয়ই দিগন্ত-বিস্তৃত দীপ্ত মেঘের ওপর সোনালী রেখার মত বহু রং ও রূপ ভাস্বর হয়েছে। এর মধ্যে গ্রামোফোন রেকর্ড এবং আকাশবাণীর সুরপ্রযোজনার

মাধ্যমে কিছু কিছু নাম সকলের মনে আসবে: শ্রীরাইচাঁদ বড়াল, ৺অনিল ভট্টাচার্য, শ্রীহিতেন বসু, ৺সুবল দাশগুপ্ত, শ্রীগোপাল দাশগুপ্ত, শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য, শ্রীদুর্গা সেন, শ্রীপ্রকাশকালী ঘোষাল, শ্রীবীরেন ভট্টাচার্য, শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

৩

এশতকের কয়েকটি দশক ভরে প্রকীর্ণ এবং সুবিন্যস্ত যন্ত্র-সহযোগিতার চেষ্টা হচ্চে। যন্ত্রসংগীত বহু রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসলরূপে আমাদের কানে আসছে, তাতে গানের সঙ্গে যন্ত্র-সহযোগিতার ও বাদ্যযন্ত্রের নতুন যুগের সন্ধান পাচ্ছি। ভারতীয় সংগীতের যন্ত্র-সহযোগিতা পাশ্চাত্য সংগীতের বাদ্য-যন্ত্রের প্রয়োগ এবং বাদ্যবৃন্দের উদ্ভব সম্পর্কে সমালোচনার অবকাশও যথেষ্ট। আজকাল অত্যন্ত লঘু জাজ্-সংগীতের প্রভাব দুর্বল যুব মনকে আশ্রয় করছে। অন্যদিকে সহজলভ্য সংগীতের হাল্কা দোলা এক শ্রেণীর শ্রোতার মন খুশি করছে। এ থেকে একটা trend বা ভাবধারার উৎপত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কারণ, সংগীতের ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠার জন্যে এই বাস্তব ভঙ্গিকে অবলম্বন করে সুরকারেরা সংগীত রচনায় হয়ত দ্বিধা করছেন না। যে কোন তাত্ত্বিকের কর্তব্য শুধু এই ভাবধারা লক্ষ্য করা। ভালমন্দ বিবেচনা করবেন রুচিশীল শ্রোতা এবং চিন্তাশীল সংগীত-সমালোচক। একথাই বলা যায় যে বৈদেশিক প্রভাবে আমরা সংগীতের জগতে শুধু নকলনবিশ হতে চাই না। আমাদের সংগীতের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্তত য়ুরোপ-আমেরিকায় রাগ-সংগীতের প্রচারে সম্প্রতি তা বিশেষ-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই বৈদেশিক প্রভাবে আমাদের লঘুসংগীত শুধু নকলনবীশের কৃতি হয়ে দাঁড়াবে—এ ভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে পারা যায় না। আমাদের প্রাচীন দেশী সংগীত রূপান্তরিত হয়ে নানা ধারায় যে ভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে সেই ধারাবাহিকতারই ক্রমবিকাশ এবং নতুনত্ব চাই। প্রাকৃত সংগীত সহজভাবেই পারিপার্শ্বিককে গ্রাহ্য করে, কিন্তু তাতে আপত্তি নেই—সে নিছক নকল না হলেই চলতে পারে। আত্মসত্তাকে বিসর্জন না দিয়ে যদি য়ুরোপীয় রীতি থেকে কিছু ভঙ্গি স্বীকরণ করে নিতে পারি, তবে সেখানে আমাদের সৃষ্টিশীল মনেরই বিকাশ হবে।

আজকাল চলচ্চিত্রগীতিতে সুরকারগণ বহু বৈদেশিক কায়দা আদায় করেছেন এবং সে সব রচনা চিত্রের সহযোগিতায় নানাভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। পূর্বেই বলেছি চলচ্চিত্র সংগীতের মতো উদ্দেশ্যমূলক রচনার বিশ্লেষণ থেকে কোন তত্ত্বে পৌছোতে পারা যাবে না। কিন্তু, যাঁরা গানকে যন্ত্রসংগীতের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য দিয়ে অথবা আবহ-সংগীতে সমৃদ্ধ করবার পন্থা ভেবেছেন, তাঁদের কার্যধারা সম্বন্ধেও স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ দরকার। গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং বিশেষ করে আকাশবাণী লঘুসংগীত বিভাগে যন্ত্রসংগীত সহযোগিতা এবং বাদ্যবৃন্দের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু কিছু যুক্তিসম্মত কাজ হয়েছে। যে সব সুরকারদের কথা এর পূর্বে উল্লেখ করেছি, এঁরাও যন্ত্র সহযোগিতার কথা ভেবেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ বক্তব্য—'হার্মনি' বা স্বর-সংগতির বিশেষ প্রয়োগ সম্বন্ধে। এ সম্পর্কে 'সাংগীতিকী' গ্রন্থে শ্রীদিলীপকুমার রায় সরলভাবে বুঝিয়েছেন: পাশ্চাত্য সংগীতে একক সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে গান নাট্যমঞ্চে এবং কোরাসে দলবদ্ধভাবে গাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। দেড় হাজার বছর এ সংগীতের বয়স। রোমের পোপ গ্রেগরীর নামে রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় সেই গ্রেগরিয়ান সংগীত স্বরলিপির মাধ্যমে এখনো প্রচলিত আছে। এরপর একসঙ্গে গাইবার অসুবিধা থেকে 'হার্মনির' সৃষ্টি, অর্থাৎ দেখা গেল "সবার গলাতো সমান নয়, কারুর খাদে কারুর চড়া। তাই একই গানের এক লাইনে নানা কণ্ঠের জন্যে নানা সুর বেঁধে স্বরলিপি ছকে ফেলে তাকে করল অচলপ্রতিষ্ঠ: পরিণাম—কাউণ্টারপয়েণ্টের অভ্যুদয়। একটা সরল দৃষ্টান্ত দেই—

ধরা যাক একজন গাইছে—সা মা মা। মা রা মা

অমনি ওর সঙ্গে সঙ্গে গাইছে—র্সা র্সা র্সা। র্সা র্রা র্সা

এরই নাম হল আদিম কাউণ্টারপয়েণ্ট—হার্মনির অগ্রদূত। এংপরে অবশ্য কাউণ্টারপয়েণ্ট ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল, হাজারো বিধিবিধান গড়ে উঠল হাজারো ভুলভ্রান্তি কল্পনা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে।" ভারতীয় সংগীতে একক সংগীতের ক্রমবিকাশ একটি চূড়ান্ত সীমায় পৌছে করেছে সৃষ্টির কাজ। তাই এই রীতি ভারতীয় শ্রোতা-সাধারণ ও সংগীত-রচয়িতার কাছে নতুন করে এল। উদাহরণ: "ভারতীয় সংগীত ঐক্যতানিক অর্থাৎ অর্কেস্ট্রা সংগীতের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় হার্মনির রীতি প্রয়োগের তিনি (ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ) পক্ষপাতী। বস্তুত এই আদর্শের ভিত্তিতেই তাঁর মাইহার ব্যাণ্ড গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় যন্ত্রে য়ুরোপীয় অর্কেস্ট্রেশানের রীতি প্রয়োগের তিনিই বোধ করি এদেশে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থল। তারপর তাঁরই শিষ্য তিমিরবরণ ও রবিশঙ্কর এই রীতিটির আরও অনুশীলন করেন।" (শ্রীনারায়ণ চৌধুরী : সংগীত পরিক্রমা)।

যন্ত্র-সংগীতে হারমনির ব্যবহার পুরানো নয় কিন্তু বাংলা অথবা আধুনিক ভারতীয় গানে এ ব্যবহার অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ শতকের প্রায় পঞ্চাশ দশকের পূর্ব থেকেই ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ চিত্রগীতির যুগ থেকে আরম্ভ করে অর্কেস্ট্রেশানের রূপ কিছু কিছু বদলাতে আরম্ভ করে। পরবর্তী কালে সুরকারগণও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। আজকের সুরকারগণ রেডিওতে, গ্রামোফোনে এবং চিত্রগীতিতেও কাউন্টারপয়েন্টেই পরীক্ষা চালাচ্ছেন, হার্মনি প্রয়োগ করছেন—সমবেত সংগীতে সুর-সহযোগিতায় একক সংগীতের (melody) পটভূমিকা রচনায়, সংগীত সহযোগিতায় এবং আবহসংগীতে। হার্মনির ব্যবহারে পরিচিত কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হচ্ছে, বিশেষ করে যাঁরা যন্ত্রসংগীতের সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, যাঁদের সুর রচনা ও প্রযোজনার মূলে এ ধরণের চিন্তাধারা আশ্রয় লাভ করেছে : শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীভি বালসারা, শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত, শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদুনিচাঁদ বড়াল, শ্রীঅলক দে এবং আরো অনেকে। এখানে শুধু কয়েকটি নামই ব্যবহার করেছি।

কারণ স্বর-সংগতি সৃষ্টির ধারণাটি কি শুধু পাশ্চাত্য সংগীতের সাধারণ অনুকৃতি, না ভারতীয় সংগীতে এককতা ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে তাতে স্বর-সংগতি সৃষ্টির চেষ্টা? এ বিষয়ে গীতরচনার এবং সংগীত সহযোগিতার দুটো দিকেই এই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে পারে। নিশ্চিত ধারণা খুব কম সংখ্যক সুরকারদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। আমাদের গান শুনে যদি য়ুরোপীয় সংগীতকার ভাবেন যে আমরা অত্যন্ত দুর্বল নেহাত প্রাথমিক অনুকরণই চালাচ্ছি, তা হলে লজ্জায় ধিকৃত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ সম্বন্ধে যতটা জানি, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ভাবনা খুবই পরিচ্ছন্ন। স্বরসংগতি সৃষ্টির পেছনে ভারতীয় সংগতির রূপ সংরক্ষণ এবং সেই অনুসারে উপযুক্ত ভাবপ্রকাশক কমনীয় কাউন্টারপয়েন্টই ব্যবহার বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কণ্ঠসংগীতে যন্ত্র সহযোগিতা সম্বন্ধে এ পর্যন্তই বলা যায় যে, কোন রূপ স্বরসংগতি সৃষ্টিতে সুরকারের য়ুরোপীয় সংগীতের অধিকারী হওয়া দরকার, তবেই হার্মনি প্রয়োগ চলতে পারে। শুধু স্থূল ধারণা নিয়ে হার্মনির ব্যবহার আজকের

লঘুসংগীতে জাজ্ সংগীতের অনুকরণের মতোই আর একটি সমস্যা দাঁড়াবে। মোটকথা, আমরা অনুকরণের ফসল চাই না। নতুন সুরকারের প্রতিভায় ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতের অভিজ্ঞতা-প্রসূত ফলশ্রুতি চাই। অজ্ঞতার এক্স্পেরিমেন্ট গ্রাহ্য করা চলে না।

সুরকার সম্বন্ধে এই আলোচনা থেকে একথাই বলতে চেষ্টা করেছি যে আধুনিক গানের গঠন-প্রকৃতি পূর্ব সুরকারগণের ধারা থেকে স্বতন্ত্র এবং এর পরিধি শুধু বাংলায় বিধিবদ্ধ নেই, একই পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন ভাষায় গান রচিত হচ্ছে। গানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এসকল সুরকারের মানস ক্রিয়াকেই প্রাধান্য দিতে হয়। অবশ্য শিল্পীর গায়ন পদ্ধতি ও শিল্পকর্মকে অবহেলা করছি না এবং গীতি রচনা সম্বন্ধেও সে কথা বলছি। কিন্তু বহু সংগীত সমালোচনা ও আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি সুরকারকে পাশ কাটিয়ে আধুনিক গানের আলোচনা হয়ে থাকে এবং দায়িত্ব জ্ঞানহীন উক্তি করতে দ্বিধা করা হয় না, বর্তমান সংগীতের মান ও উৎকর্ষ বিচারে বিপরীত পন্থা অবলম্বন করা দরকার। সুরকার সম্বন্ধে পদ্ধতিমূলক বিস্তৃত আলোচনার সুরু হলে, সুরকারের রচনার মান উন্নীত হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে আরো বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সুরকারের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সংগীতশিল্পী সহজেই পরিবেষণের কথা ভাবতে পারবে। যে সব গান লক্ষ্য করে এ প্রসঙ্গটি রচিত হয়েছে, সে সব গানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আরও একটি কথা বলা দরকার, এখানকার আলোচনা আধুনিক সংগীতের উৎকর্ষ ও প্রকৃতি বিচারের জন্যে principles বা বিচার সূত্র খুঁজে বের করা। সেই সম্পর্কে সামান্য কয়েকজন সুরকার ও প্রযোজকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটামুটি, বর্তমান সুরকার সম্বন্ধে বহু প্রসঙ্গ উত্থাপন করে একথাই বলতে চেষ্টা করা গেছে যে সুরকারের বিশেষ দক্ষতা বা specialisation শুধু একটি বিশিষ্ট সাময়িক প্রক্রিয়া নয়। নানা ধরণের অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নির্বাচন কুশলতা, ভাবনার ধারাবাহিকতা ও কল্পনা বা ধ্যান-দৃষ্টি সুরকারের মনের গঠনের লক্ষণ। যে মুহূর্ত থেকে সংগীতকুশলীর জীবনে এই বিচিত্র ধারাবাহিক-প্রক্রিয়া ফসল ফলাতে আরম্ভ করে সে মুহূর্ত থেকেই সে সুরকার। সুরকারের রচনা-প্রকৃতিতে বহু প্রকারের প্রভাব ও রচনা-বৈষম্য থাকা সম্ভব, নানান সুরকারদের আলোচনায় তার উল্লেখ করা গেছে। এবং প্রযোজনার

দিক থেকে তাঁদের পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণতা দান করবার জন্যে যে বিশেষ রীতির সংগীত-সহযোগিতা অবলম্বন করা দরকার—অর্থাৎ মেলডি এবং হার্মনির ব্যবহার, একীকরণ অথবা সংগতির ব্যবহার—প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। গতিশীল জীবনে বহু গান এই কয়েক দশকের মধ্যে সময়ে রচিত হয়ে কানের ভেতর প্রবেশ করেছে এবং উবে গেছে। বহু স্বয়ংসম্পূর্ণ গানও রচিত হয়েছে এবং অন্যদিকে সংখ্যাতীত ব্যবসায়িক রীতি প্রভাবিত গান চারিদিকে ছড়িয়েছে। জীবনের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করে সহজ মনের অভিব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দেবার যে দায়িত্ব সুরকার-প্রযোজকের ওপর ন্যস্ত হয়েছে, তার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এর জন্যে পথ বেঁধে দেওয়া যায় না, ফরমাশ করা যায় না। আমরা প্রতিভাবান অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ সুরকারের আবির্ভাব সর্বদাই আশা করতে পারি, কাউকে শেষ সুরকার-রূপে অভিহিত করে দাঁড়ি টেনে দিতে পারি না। অন্ততঃ ইতিহাস তা বলে না।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাংলা গানে রাগ-সংগীতের প্রভাব

রাগ সংগীতের রীতি-পদ্ধতি

বাংলা গান দেশী-সংগীতের ধারায় ক্রমবিকাশ লাভ করেছে কিন্তু রাগ-সংগীতেব দ্বারাই প্রভাবিত। এই প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুম্‌রীব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা দরকার, অন্ততঃ স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রকৃত রূপ ধরে দিতে সাহায্য করবে।

ইংবেজি 'ক্লাসিকেল' শব্দটি কিছুকাল যাবৎ 'মার্গ' সংগীতের অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'শাস্ত্রীয়' সংগীত কথাটির প্রচলন হয়েছে হালে, বাংলাদেশে 'ওস্তাদী' গান বলেই পরিচিত ছিল। 'ক্লাসিকেল' অর্থে পুরাতনী বা বাঁধা-ধরা পদ্ধতি বুঝায়—গীতি, অলঙ্কার, ছন্দ সৃষ্টির সর্বত্রই বাঁধাবাঁধি।

'ক্লাসিকেল' অর্থে দৃঢবদ্ধ বাঁধাধবা রীতি যদি কোথাও থেকে থাকে—তা ধ্রুপদে। বাঁধা রীতিতে আলাপ শেষ করে গায়ক গানের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ গাইবেন, বিভিন্ন তালের ও ছন্দের নানা গুণ প্রকরণ শেষ করবেন। তালও প্রধান অঙ্গ। খেয়াল গানেও বিশেষ বীতি বা পদ্ধতি আছে, কিন্তু রাগ বিকাশের কায়দায়, তানের বৈচিত্র্য সৃষ্টি এবং অন্যান্য আঙ্গিকের প্রয়োগ মূলত খানিকটা স্বাধীনতালাভের জন্যেই হয়েছিল। অর্থাৎ, খেয়ালে গায়কেব ব্যক্তি-সত্তা প্রকাশের সুযোগ প্রচুব, যে সুযোগ ধ্রুপদে নেই। শিল্পেব সাধারণ নিয়মে ধ্রুপদ যেমন আঙ্গিকের শেকলে বাঁধা, খেয়ালে গায়কেব কল্পনাশক্তি ও ব্যক্তিগত ভাবচিন্তা প্রয়োগের তেমনি আছে স্বাধীনতা। অন্যদিকে, আর একস্তরে টপ্পার উৎপত্তি যেমন একটি সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে, ঠুম্‌রি তেমনি মুক্ত প্রকৃতির গান, সেখানেও প্রচুর স্বাধীনতা। অর্থাৎ, বাগ-সংগীতের মধ্যে জনপ্রিয় রূপ—খেয়াল ও ঠুমরীব সঙ্গে জীবন-চেতনাব সঙ্গে সম্পর্ক আছে। খেয়াল ও ঠুমরী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে আজকের স্তরে এসে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু, তবু একই 'ক্লাসিকেল' বা 'মার্গসংগীতের' সীমানার মধ্যে থাকার দরুন একটি বিশেষ প্রশ্ন দাঁড়ায়: খেয়াল ও ঠুমরী কি বিকশিত হয়েছে, না কি-

নিয়মের শিকলে একই পরিসরের মধ্যে থেকে সংগীত-রসিক সমাজে গতানুগতিকভাবে আর দশটা জিনিসের মতো চালু হয়েছে ?

যে কোনও শিল্প যদি প্রাণবন্ত না হয়, তার বিকাশের মধ্যে যদি পরিবর্তনের কোন লক্ষণ না থাকে, তা হলে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সে শিল্পরূপ সাধারণের চিত্ত-বিনোদন করতে পারে না। এই অর্থে যে কোন শিল্পের ক্রমবিকাশের লক্ষণ ইতিহাসের দিক থেকে বিচার্য। সংগীতে ধ্রুপদ গানের তত্ত্ব শুধু ঐতিহাসিক তত্ত্বরূপে বিচার করা যায়। ক্রমবিকাশ এ গানের গঠনে লক্ষণীয় নয়, শুধু শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির ভাবনার বস্তু মাত্র। রচনার সঙ্গে সঙ্গেই গান বিধি-নিষেধের পরিসরের মধ্যে এসে গিয়েছে। সাধারণের কানে শুনে ভাল লাগা যে কোন গানের প্রথম গুণ। কিন্তু ধ্রুপদ গানের মধ্যে তা পাওয়া অনেকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, ব্যাপারটি শ্রোতার মনের শিক্ষা ও সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু খেয়াল ও ঠুমরীর বেলায় এ কথা অনেক সময় খাটে না। খেয়াল ও ঠুমরী রাগসংগীতের একটি সজীব প্রবাহ। সঙ্গীত-শ্রোতার মনোভাব বিচার করলেই এই উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে। বছরে বছরে খেয়াল ও ঠুমরীর শ্রোতা যেমন বাড়ছে, তেমনি অন্যদিকে শ্রুতিমাধুর্যও শ্রোতাকে আকর্ষণ করছে। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে পঞ্চাশ বছর পূর্বে খেয়াল যে ভাবে গাওয়া হত, আজকাল সে ভাবে গাওয়া হয় না। আজকালের বিলম্বিত খেয়াল গাইবার কায়দা লক্ষ্য করলেই একথা প্রমাণিত হবে। এটা পূর্ব রীতি নয়। সেকালে ঘরাণাগুলো তাদের বিশেষ পরিবার বা গোষ্ঠীবদ্ধ ঘরাণা রীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখত, বিভিন্ন ঘরাণা রীতির মধ্যে তারতম্যও ছিল অনেক। কিন্তু, আজকাল ঘরাণার সীমাকেন্দ্রে কোন শিল্পীই আবদ্ধ নন। রাগ বিস্তার ও তানে বহু রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষার চেষ্টা দেখা যায়। নিজ ঘরাণা পদ্ধতিতে যা পাওয়া যায় নি, এরূপ বিভিন্ন ভঙ্গি ও স্বর প্রকাশের, ভাব উপস্থাপনার নানা রূপ খণ্ড খণ্ড কায়দা শিল্পী মাত্রেই মুক্ত ভাবে গ্রহণ করে থাকেন। শ্রোতামাত্র যেমন পূর্বে রাগলক্ষণের দিকে সচেতন থাকতেন, আজ প্রতিটি স্বরকলির প্রতিও লক্ষ্য করেন। বুঝতে চেষ্টা করেন—কোথাও ধীর, গম্ভীর স্বরের চলন একটি বিশেষ স্বরে সঞ্চরমাণ হয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করছে, কোথাও গায়ক আলোর স্পন্দন সৃষ্টি করছে, কোথাও সৃষ্টি করছে স্পর্শকাতরতা —একটি বিশেষ দুঃখ, বিশেষ হাসি অথবা একটি বিস্মৃত মুহূর্ত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, নির্বিশেষকে এখানে একটি সুর উপলব্ধির মুহূর্তেই বিশেষ করে দিচ্ছে,

অনির্বচনীয়কে সুরের ভাষায় (musical phrase) বচনীয় করে তুলেছে। সুরের বক্তব্যেই সংগীত বিশিষ্ট হচ্ছে। আজকাল শুধু সুর-বিহারের কয়দা বা তানকর্তব দেখেই শ্রোতা খুশি হন না। শ্রোতা বক্তব্য খোঁজেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগের অর্থ খোঁজেন। খেয়ালগান শুনতে শুনতে শ্রোতা গায়কের স্বর সঞ্চরণ করবার প্রতি লক্ষ্য রাখেন, অর্থাৎ বিভিন্ন স্বরে সঞ্চরণ করে গায়ক স্থানে স্থানে যে আকস্মিকতার সৃষ্টি করেন, এবং ফলে, যে নতুন অভিজ্ঞতার আস্বাদন করিয়ে দেন, সেই অংশগুলো যেন শ্রোতার মনে বসে যায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও পরিণত হয়। সুর এখানে শুধু abstract নয়। যাঁদের মনে সুরের প্রতি সহজাত আকর্ষণ আছে, তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা না হলেও সুরের প্রতীক এসে তাঁদের মনের সামনে সহজে দাঁড়ায়—কয়েকটি খণ্ড সুরগুচ্ছে, কয়েকটি ভাবে, কয়েকটি বিস্তারের অংশে। সেখানে বক্তব্য বেছে নেওয়া যায়। অর্থাৎ উপলব্ধিটা শুধু আত্মকেন্দ্রিক এবং তাত্ত্বিকই হয় না। আজকাল স্থায়ী গাইবার রীতিতে, ছন্দ ও রাগের বিকাশে, তানের প্রয়োগে, নানা ভাবসৃষ্টির কায়দায় অনেক বিভিন্নতা এসেছে। আজ গায়কের লক্ষ্য পূর্ব থেকে অনেক স্বতন্ত্র, শিল্প-বোধের দাবিতে গানের কায়দা বদলে নিয়েছেন, ভাবনার ক্ষেত্রটি যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

রাগসংগীতের এই বিকাশমান গতিটিকে গতানুগতিক শাস্ত্রীয় রীতির মধ্য দিয়ে বিচার করলে ভুল ব্যাখ্যা হবার সম্ভাবনা থাকে। এ সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। সংগীতের প্রভাব সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু চিরাচরিত প্রসঙ্গ আজও কথায় কথায় আলোচনা করে থাকি। ভারতীয় ভাবনায় অনেক ক্ষেত্রে রাগের ঐশ্বর্য ও গায়কীর ক্ষমতা বর্ণনায় অলৌকিকত্বের প্রতি লক্ষ্য ছিল। মল্লার গেয়ে বৃষ্টি ঝরানো একটি অতি প্রচলিত প্রবাদ তানসেনের সঙ্গে যুক্ত। এর পূর্ববর্তী বৈজু ও গোপালের কথা বলতে গিয়ে ডঃ বিমল রায় "হরিণকে মালা পরান", "পাথর গলান", প্রভৃতি উক্তিগুলোও প্রসঙ্গত "ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে" উল্লেখ করেছেন। সংগীতে এ ধরণের অলৌকিকতার ধারণা কিন্তু বিশ্লেষণের সহায়ক হতে পারে না। Abstract art বা গুণবাচক শিল্প সম্বন্ধে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের যুগে সুরের প্রভাব ও সুরের চিত্র সম্বন্ধে শ্রোতা ও সমালোচক সজাগ। বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে এঁরা ব্যাখ্যা করেন। সংগীতে কোন্ সুরকলি কি ভাব প্রকাশ করে—অর্থাৎ কোন্‌টা কি অর্থে ব্যবহৃত, যথা—মধুরস প্রকাশক, চটুলতার

প্রতিকৃতি, বীররসের ভাবব্যঞ্জক, ভক্তিভাব-প্রকাশক, হৃদয়বিদারক, করুণ, দুঃখস্রষ্টা, শান্ত-সমাহিত ভাবস্রষ্টা, প্রাকৃতিক পরিবর্তনসূচক, বিস্ময়সৃষ্টিকারক, আকস্মিক হাস্যরস সৃষ্টির কারণ, গতিসূচক, উন্মার্গগামিতার ভাবদ্যোতক, fantastic—ইত্যাদি। এই ধরণের ভাবপ্রকাশের উদ্দেশ্যে সুরকলিগুলো নির্বাচন করে সহজে শিল্পী মাত্রেই আজকাল ব্যবহার করেন। মনে হয়, এইরূপ ভাবনাই আজকাল খেয়াল ও ঠুমরীকে সজীব করে রেখেছে।

এই প্রবহমান জীবনধারা খেয়াল ও ঠুমরীকে বাঁচিয়ে রাখে। নতুন ভাবনা চিন্তা এবং কলা-নৈপুণ্য ঠুমরী ও খেয়ালের অংগে প্রযুক্ত হচ্ছে, জীবনের সঙ্গে যোগ রেখেই সে চলেছে। এ ক্ষেত্রে আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের মতামতের অবলম্বনে রাগসংগীত বিচার করব না। কারণ সংগীতের এই বিশেষ রূপটি নতুন ভাবে প্রাণবন্ত হয়ে আজ ধরা পড়েছে—বর্তমানের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে সুবিন্যস্ত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রয়োগ-সার্থকতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ভেবেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পরিমণ্ডলটি তাঁরই রচনার প্রয়োজনে এবং সমর্থনে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ 'কথা' যেখানে সুরকে সম্পূর্ণতাদানের বাহন—সেই পরিমণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের চিরন্তন, অনির্বচনীয় রূপকেই লক্ষ্য করেছেন। তৎকালীন সংগীতের স্টাইলে—এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক ছিল। রাগসংগীতে ক্রমবিবর্তনের ভাবনা বাংলা দেশে তখনো আসেনি। হিন্দুস্থানী সংগীত তখনও শিষ্যপরম্পরা কয়েকজন বিশেষ শিল্পীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নির্বিচার অলংকার প্রয়োগ ও কায়দার আতিশয্যই ছিল রাগসংগীত-শিল্পীর অবলম্বন। বর্তমানে এ আতিশয্যকে সবটাই অলঙ্কারের আতিশয্য বলা চলে।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, খেয়াল গানের বিকাশের সবটাই অলঙ্কার নয়। গানের স্থায়ী-অন্তরাসহ গায়কীর ন্যূনতম প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য নিয়েই খেয়াল গানের সরল দেহ। শুধু গানটিই খেয়ালের বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক নয়, এর উপযুক্ত সহজ বিস্তার, তান ইত্যাদির সংযোগে গানটি খেয়ালে পরিণত হয়। সাধারণ ব্যবহারের অতিরিক্ত তান বিস্তার ইত্যাদির খণ্ড ক্ষুদ্র অংশগুলোকে বিশেষ অলঙ্কার বলা যায়। খেয়াল গান শুধু স্থায়ী-অন্তরার প্রকাশে খেয়াল হয় না। সরল, সহজ,মামুলি তানবিস্তার নিয়েই খেয়ালের দেহ। তাতে যখন গায়কের ব্যক্তিগত ভঙ্গিগুলো যোগ করা হয় তখনই হয় অলঙ্কারের স্ফূর্তি। দেহটা অলঙ্কার নয়, শিল্পীর বিশেষ প্রয়োগরীতিটা অলঙ্কার।

আঙ্গিকের দাবি অনুসারে প্রথমে গায়কী ভঙ্গির স্বাভাবিক বিকাশ হওয়া দরকার। বিকাশের সঙ্গে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টাতে অলঙ্কার-বিনিয়োগ পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ বিস্তার ও তানমাত্রেই খেয়ালের অলঙ্কার নয়, কিন্তু বিস্তার ও তানের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির ভাবনায় উদ্ভাবিত রীতি প্রয়োগ, ওগুলোকে বিশিষ্ট ভাবে সাজানো, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানান ক্ষুদ্র খণ্ড সুরের প্রয়োগ-কৃতিত্বের সৌকুমার্য সৃষ্টি, তালের সঙ্গে সুরের দোলা—এ সবই অলঙ্কার হয়ে দাঁড়ায়। এখানে অলঙ্কার শুধু উপরতলার আতিশয্য। যে খেয়ালকে গায়ক পরিমিতি বোধ সহকারে স্থির রেখে সহজ সুর বিকাশের উদ্দেশ্যে বিস্তার ও তান প্রয়োগ করেন, তাকে আমরা নিরলঙ্কার সাদামাঠা খেয়াল বলতে পারি। এ ক্ষেত্রে minimum requirement-এর চিন্তা বা পরিমিতিবোধের প্রয়োগ দরকার। খেয়ালের দেহ সম্বন্ধে যে কথা বলা হল, অনুরূপ ভাবনা ঠুমরীতেও সম্ভব।

খেয়াল ও ঠুমরীকে প্রাণবন্ত সংগীত বলে উল্লেখ করছি কেন? এর কারণ ধ্রুপদের গানগুলোর দেহে উল্লিখিত বিকাশের অবকাশ সামান্যই, কিন্তু খেয়ালের দেহের ওপর শিল্পীর সংযোজনা ও বিকাশের সুযোগ অপরিমিত। বহু বিচিত্র ভঙ্গি, বহু ঘরাণার স্পর্শ, বহু আলঙ্কারিক সংযোজনায় খেয়ালের মূর্তি হয় বিভিন্ন—গায়কীও স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। একই গানের রূপ পঞ্জাব, দিল্লী, গোয়ালিয়র, দক্ষিণী (মারাঠী) কায়দায়, আগ্রা ঘরাণায়, কিরানা ঘরাণায় নানা ভাবে নানান রকম হতে পারে। এই বিভিন্নতা ধ্রুবপদে দেখা যায় না। খেয়ালে এই বৈচিত্র্যের মূল কারণ—সুর বিকাশের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত কায়দায় সুর প্রয়োগ। এ স্বাতন্ত্র্যের জন্যেই খেয়াল ও ঠুমরীকে প্রবহমান বলা যায়। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ধ্রুপদ ও টপ্পার দেহ যদি নির্দিষ্ট ও স্থির বলা যায়, খেয়াল ও ঠুমরী সে অর্থে নির্দিষ্ট নয়, অনেকটাই লোকপ্রচলিত ভাবের সঙ্গে সুসমঞ্জস এবং প্রবহমান। এ অর্থে "ক্লাসিকেল" শব্দটির তাৎপর্যের সঙ্গে মিল নেই। ক্লাসিকেল শব্দটি বাদ দিয়ে এ প্রকৃতির গানকে যদি রাগসংগীত (pure music) বলে উল্লেখ করা যায় তবে এর অতিরিক্ত অন্যান্য লোক-প্রচলিত সংগীতকে (যথা আধুনিক, রবীন্দ্রসংগীত, পল্লীগীতি, কীর্তন ইত্যাদিকে) মিশ্র-রীতির শিল্প বলা যেতে পারে; সেখানে সুর, কথা ও বিষয়বস্তু—এই সকলের সামঞ্জস্য বিচার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব এখানে তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করছি, ধ্রুপদ অথবা টপ্পা রীতিতে বিকাশ ও প্রবাহের কোন পন্থা

নেই বলেই এতটুকোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ক্লাসিকসূত্রে বিচার্য। খেয়াল ও ঠুমরীর রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে অতএব, এই সংগীতে ভাববার পথ একটু স্বতন্ত্র। এর পরের পর্যায়ে যেখানে কথার প্রাধান্য এবং সুরের রূপটি বাঁধা সেখানে সংগীতের বিচারে অন্য কতকগুলো সূত্রের অবলম্বন করা প্রয়োজন হয় তা আমরা বিশ্লেষণ করেছি। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সংগীতের তুলনায় লোকপ্রচলিত সংগীত অনেকটাই **mixed art** বা মিশ্র কলা।

অতএব খেয়ালের আধুনিকতম রূপ প্রমাণ করে যে সে হচ্ছে জন-প্রচলিত রাগ-সংগীত। খেয়াল প্রাণবন্ততায় ও শিল্পচেতনায় আরো উন্মেষের সম্ভাবনা রাখে এবং সে চির-নূতন। খেয়াল মৃত শাস্ত্রের কচকচি মাত্র নয়। ক্লাসিকেলও নয়। রাগসংগীতের আসরে আব্দুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, ওঙ্কার নাথ কিংবা বড়ে গোলাম আলী খাঁর গান শুধুই অ্যাবস্ট্রাক্ট বলা যায় না। কারণ এঁরা সুরের বিশিষ্ট প্রতীক সৃষ্টি করেন, এতে প্রাণপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবহমান সংগীতের রূপটি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ—সে মৃত অথবা একটা নির্বিশেষ রূপে বাঁধা আছে একথা স্বীকার্য নয়। কোলকাতার বহু সংগীত সম্মিলনীতে অথবা সংগীতের আসরে একথা প্রমাণিত হয়েছে। প্রাণবন্ত প্রবাহ যখন খেয়ালের মধ্যে আসে, সুরের অংশবিশেষের নতুন সংযোজনার দ্বারা শিল্পী যখন এক একটি অপূর্ব নূতন সুরকলির (phrase) সৃষ্টি করেন ও একএকটি নূতন অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে দিতে পারেন, তখন দেখেছি গীতিরসিক ও শ্রোতাদের মধ্যে রসাস্বাদনের অপূর্ব মুহূর্ত, ব্যথা, হাসি, উচ্ছ্বাস ও সুখের সৃষ্টি। সে অপরূপ মুহূর্তের পরিচয় যাঁরা জানেন তাঁরা বলবেন প্রতিটি অংশে সুরের কলিগুলো তাদের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যে ধরা দিয়েছে। সেগুলোতে কোথাও wit-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, কোথাও বিস্ময়-বিহ্বলতা, কোথাও হাসি, কোথাও কান্নার অনুরূপ ব্যথা এসেছে। কোথাও কোথাও এসেছে বাস্তব প্রেমের অভিজ্ঞতা। আব্দুল করিম খাঁর কণ্ঠে বেদনার অভিব্যক্তিতে শ্রোতা কেঁদে আকুল হয়েছেন এমন নজির আছে। আবার মধ্য রাত্রিতে শ্রোতাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ বসন্তরাগের আলাপ ও ধামার এবং সুঘরাইর খেয়াল এবং সবশেষে গারা-কানাড়ার গারা-সংমিশ্রিত রাগের গান মনকে বিস্মৃত অতীতে ফিরিয়ে এনে এক অভূতপূর্ব জীবনস্পন্দন সৃষ্টি করেছে, এমন নজিরও আছে। শ্রীঅমিয়নাথ সান্যালের গ্রন্থের বর্ণনা অথবা স্বগত ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে

পড়ে একটি শ্রোতা একবার এসে ফৈয়াজ খানের কণ্ঠে গান শুনে কানে কানে বলেছিলেন কি যে শুনতে পেলাম—একটা উদাত্ত কণ্ঠ যেন বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ছটফট করছে আর কাঁদছে। শ্রোতা নিশ্চয়ই উপমা দিতে জানেন না কিন্তু তাঁর উপলব্ধিতে এ চিত্রের প্রতি বিশ্বাস, বিস্ময়, বিহ্বলতা এবং বেদনার অনুভূতি স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলাম—সে ১৯৩৮ সনের একটি সংগীত সম্মিলনীতে। সুরের অনুভূতিতে বর্ণ খুঁজে পাওয়া, আলোর স্পন্দন অনুভব করা, চিত্রকে চোখ বুঝে দেখা, সুরগুচ্ছকে ও কলিকে অথবা সুরগুচ্ছকে ছবির মত মনে রাখা অনেক শ্রোতার মধ্যে স্বাভাবিক। গীতকলির ভাব সম্বন্ধে বোধশক্তি কতটা প্রসারিত হয়েছে—এ হচ্ছে তারই প্রমাণ। নির্বিশেষ থেকে সুরের অভিব্যক্তিতে বিশেষকেই লাভ আজকের এই অভিজ্ঞতার মূলকথা। এ অভিজ্ঞতার আর একটি প্রমাণ, সুরকাররা খেয়াল, ঠুমরী গান থেকে সুরকলি বা অংশবিশেষ সংগ্রহ করেন, নতুন অংশবিশেষকে সংযোজন করেন। এমনি করে ওস্তাদ ওঙ্কারনাথের বিশিষ্ট গান থেকে বাংলা গানের সুর রচনা, বাংলা গানে বেগম আখতারের গানের বিশেষাংশের প্রয়োগ, বড়ে গোলাম আলী খাঁর ঠুমরীর অংশ বিশেষের ব্যবহার, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর অনুসরণে বাংলা গানের রূপদান ইত্যাদি।

ধ্রুপদী-প্রভাব

ধ্রুপদী প্রভাবে প্রাপ্ত বাংলা গানের চার ভাগ—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ—একটি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। লৌকিক গীতিরচনায় বর্ণনাত্মকতা থাকায় এবং কীর্তনগানে আবেগের বহু স্তরবিকাশের বিভেদ থাকার জন্য গানের এই চারভাগের একটা নির্দিষ্ট ধরণ গ্রহণ করবার কোন সুযোগই ছিল না। আজকের বাংলা গানের স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগের রূপ সম্পূর্ণ ধ্রুপদ-সংগীত-সংস্কার থেকেই জন্মেছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এ গীতিরচনার আঙ্গিক সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা গান রচনায় রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত পদ্ধতি সংখ্যাতীত রচনার মধ্য দিয়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

ধ্রুপদের বিশেষ আঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তালভাগ। এতে যে সাধারণ শ্রোতার মন হাল্কা-রসের প্রবণতার জন্য তেমন আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ গম্ভীর ভাবের সঙ্গে তালের গুরুগম্ভীর ধীর পদক্ষেপ সহজে মন আকৃষ্ট করে না।

যে সব গানে গাম্ভীর্যের বিকাশ, সে রকমের গানের দরকার বড় কম। প্রতিদিনের প্রয়োজন ছেড়ে দিলে ধ্রুপদের তালভাগ যে সব গানে অনুসৃত হতে পারে, তাতে নাটকীয় ভঙ্গি অথবা গানের কথায় ভারিক্কী ভাব দরকার। ধ্রুপদের তালের প্রয়োগের জন্য এরূপ পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ শুরু হয়েছিল কয়েক শতক পূর্বে কীর্তন গানে। বিলম্বিত তালগুলোর রূপ পালাকীর্তনে বহু পরিমাণে মিলে। একথা স্বীকৃত যে ঠাকুর নরোত্তম (১৫৮১-৮২) ধ্রুপদ গীতরীতি আয়ত্ত করে গরানহাটা কীর্তনে ভাব-গম্ভীরতার প্রয়োগ করেন। এইভাবে ভারি তাল পরবর্তী কালে কালীকীর্তনেও কিছুটা প্রয়োগ হয়েছিল। রামমোহন নিজে সঙ্গীত সাধনা করেছিলেন এবং ধ্রুপদের মৌলিক গম্ভীরতা ও প্রশান্তি বাংলাগানে নতুন উদ্দীপনাসৃষ্টির কারণ হয়েছিল। যদুভট্ট কিছু ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন কিন্তু সে ধারাটি রক্ষিত নয়। বিষ্ণু চক্রবর্তীর ধ্রুপদ ভঙ্গির রচনা সে যুগের সংগীতকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ গান প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। এ সম্পর্কে শুধু রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো গানের কথাই প্রথমে বিচার্য। কারণ এই রীতি থেকে যতটুকু সার সাধারণ শ্রোতা এবং গায়কমাত্রেই গ্রহণ করেছে, তা রবীন্দ্রসংগীতের জন্যেই।

ধ্রুপদ গানের ভঙ্গি সার্থক হয় গানের আঙ্গিকের সুষ্ঠু প্রয়োগ দ্বারা। ধ্রুপদী রীতি অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। গমক, বিশেষ ধরণের বড় বড় মীড়ের প্রয়োগ এবং তালে দৃঢ়সংবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন গতি রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃতির বিরুদ্ধ। ভাব-সম্পদের খর্বতা এবং অলঙ্কারপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন বলেই ধ্রুপদীয়ানা ভঙ্গি রবীন্দ্রসংগীতে সৃষ্টি হতে পারে নি। সকল রকমের গান গায়কীর দরুণই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। ধ্রুপদ গায়কের কণ্ঠ মার্জনার কায়দা রবীন্দ্রসংগীতের সরল প্রকাশভঙ্গির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সুকণ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ-ফ্রেমে নিবদ্ধ গীতি সুন্দর করে হয়ত গান করবেন সন্দেহ নেই, যেমন করে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করেন, কিন্তু একটি অভিজ্ঞতা সবার কাছে স্পষ্ট হবে যে ধ্রুপদ গায়ক যে মুক্ত ভঙ্গিতে গানকে নিয়ে তালের সঙ্গে খেলা করতে পারেন, সে মুক্তির পথ রবীন্দ্রসংগীতে নেই। এবং নেই বলেই প্রকাশভঙ্গি পৃথক হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গানে ধ্রুপদের কাঠামো আছে। কিন্তু, ধ্রুপদের কাঠামোকে কখনো ধ্রুপদ বলা যায় না। তাকে ধ্রুপদ বলে প্রমাণও করা যায় না। রাগসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকট হয় তার স্টাইল

বা গায়কীতে এবং গায়িকা বা গায়কের ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান হচ্ছে শব্দ অবলম্বনে সুর প্রকাশের আশানুরূপ মুক্তি ও গায়কীর সুষ্ঠু প্রকাশ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভটাচার্য এ বিষয়ে গোঁসাইজীর রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে, যে সব গান গোঁসাইজীর কণ্ঠে শুনেছেন, তারই কথা উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুপুর ঘরাণা গ্রন্থে কিন্তু সে ভঙ্গিটি বজায় নেই। স্বরলিপিটা গানের সমস্যা নয়, ভঙ্গিটাই গানের বড়ো কথা।

ধ্রুপদ গানের আসরে যাঁরা গান শুনে থাকেন এবং যাঁরা ধ্রুপদ চর্চা করেন তাঁরা একথা স্বীকার করবেন যে বাণীর উচ্চারণ ধ্রুপদে ভঙ্গির সূচনা করেছে, বিভিন্ন ঘরাণায় কথা বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়েছে—কোথাও অর্ধ-উচ্চারিত, কোথাও অনুচ্চারিত, কোথাও গমক সহকারে পরিবর্তিত, কোথাও ছেদ অথবা দম-প্রযুক্ত—বাক্যরূপান্তরিত, কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বর (vowel) যুক্ত। বাংলার কথাসম্পদ এই রীতিতে কথা উচ্চারণের স্বাধীনতা দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তো কক্ষণো দেন নি। শ্রীপ্রজ্ঞানানন্দ স্বামিজী ধ্রুপদ কাঠামোতে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানের রাগরূপের সংরক্ষণ ও গম্ভীরতা, সৌন্দর্য এবং ভাবসমৃদ্ধির সম্পর্কে যে কথার উল্লেখ করেছেন তাকে স্বীকার করে নেওয়া যায়, কিন্তু একথা বলা যায় যে সে সব লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রগীতি-পরিমণ্ডলের এ রচনা ধ্রুপদ গান নয়। প্রকাশভঙ্গির মূলে ধ্রুপদ থাকা সত্ত্বেও সে সম্পূর্ণ 'রবীন্দ্রসংগীত'। পুর্বেই বলেছি, প্রকাশই গানের পুর্ণ রূপ—Form is the soul। প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ দরকার।

আমাদের মূল বক্তব্য : বর্তমান বাংলা গানের রূপে ধ্রুপদীয়ানার সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ নেই, কারণ বাংলার গান উদ্ভূত হয়েছে সহজ মনের আবেদন থেকে, প্রাকৃত গীতি-প্রবণতা থেকে যেমন করে পল্লীগীতি স্ফূর্তিলাভ করেছে ও যে ভাবে কীর্তন এবং অন্যান্য ভক্তিমূলক গান জন্মলাভ করেছে। বাংলা গান ধ্রুপদ থেকেও কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছে—কোথাও রাগ, কোথাও তালের কাঠামোটি অবলম্বন করা হয়েছে কিন্তু ধ্রুপদের গীতরীতি ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সকল সময়ে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করতে পারে নি। উনবিংশ শতকে বিষ্ণুপুর ভঙ্গি অবলম্বন করে বাংলা গানের একটি রীতি সাধারণ্যে প্রচারিত হয়, সে সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণের কানে টপ্পারীতির ভজি আরও বেশী প্রচার লাভ করে। এ সময়ে বাংলায় বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদগানের প্রভাবও বিস্তৃত হয় (দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের "বিষ্ণুপুর ঘরাণা"

দ্রষ্টব্য)। ঘরাণা সম্বন্ধে একটি কথা খুবই সত্য যে বাণীর উচ্চারণের কায়দাই ঘরণার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একথা সত্য যে ঘরাণাগুলোর উচ্চারণ সম্বন্ধে আঞ্চলিক কায়দার কথা ওঠে। সুর প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিমান গায়কেরা ব্যক্তিগত কায়দার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ধ্রুপদের অধিকাংশ কথাতে পার্থক্য ছিল সামান্যই, অথবা কয়েকটি বিশেষ গান এসব ক্ষেত্রেই হয়ত ব্যবহার করা হত। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই গায়কীর স্বাতন্ত্র্যে গান রূপান্তরিত শোনাতো। গায়কীর কায়দায় উচ্চারণ স্বতন্ত্র হয় এবং এজন্যে একই কথা বিভিন্ন শোনাতে পারে। নানা আলোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে বিভিন্ন ঘরাণার প্রথম বিশেষ তারতম্য হয় উচ্চারণ-গত। এর পরেও ভঙ্গির বা style-এর কথা আসে। ধ্রুপদ সম্পর্কে গৌরহারী (গবরহার), নৌহারী, ডাগরী, খণ্ডার-বাণীর কথা প্রচলন ছিল। এগুলোকে 'শৈলী' বলে ধরে নেওয়া হত, কিন্তু এর নির্দিষ্ট প্রকৃতি ও সংজ্ঞা নিরূপিত হয় নি। শাস্ত্রীয় ভেদও জানা যায় না। "পরন্তু য়হী কহনা পড়ে যা কি আজকাল ইস্ চারোঁ বাণীয়োঁ কী স্বতন্ত্র ধ্রুপদে সুনাই নহীঁ দেতী।" (পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে)

কোন বস্তুর কোণগুলিকে ভেঙে নিয়ে আপনার গতিপথে গড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাকে বিভিন্ন আকৃতির করে নিলে যে অবস্থা হয়, ধ্রুপদ অথবা খেয়াল গানে কথার ব্যবহারও অনেকটা সেরূপ। সুর প্রয়োগের বহু বিচিত্র ভঙ্গির জন্যে প্রত্যেকের কণ্ঠে বাণীকে স্বতন্ত্র শোনায়। এজন্যে একই হিন্দুস্থানী ব্রজবুলি, ব্রজভাষা, পাঞ্জাবী, মিশ্র উর্দু, প্রভৃতি ভাষার শব্দে রচিত বহু ধ্রুপদ ও খেয়াল নানারূপে উচ্চারিত হতে বাধ্য। অধিকাংশ গানে কাব্যিক সৌন্দর্য বা ভাবাগত পরিচ্ছন্নতা খোঁজ করা বৃথা। কারণ সংগীতের ভাষায় একটি সাধারণ স্বাভাবিক রূপই বর্তমান। পুর্বের মতো আবার বলা যায় —রাগসংগীতের গানের ভাষা এমন সহজ ও ব্যবহার্য যে, রচনার প্রতিটি শব্দকে ভেঙে সহজে সুরের দ্বারাই উচ্চারিত, অযুক্ত, খণ্ডিত, দমপ্রযুক্ত, রৌদ্ররস-চিহ্নিত, করুণ ও গম্ভীরতায় পরিণত করা যেতে পারে। বাণী বা কথার পুর্ণ উচ্চারণের প্রয়োজন এখানে গৌণ হয়ে পড়ে। সুর প্রয়োগের প্রাধান্যই এখানে বিশেষ। কোন ধ্রুপদ ও খেয়াল গান যদি গায়ক সমাজে আদরণীয় হয়, তা বিশেষ করে হয় গীতিভঙ্গি বা কায়দার জন্যে। রাগসংগীতের শ্রোতা ঢংএর সমাদর করেন। রাগসংগীতের ভঙ্গি বা কায়দা বাংলা গানের কায়দার সঙ্গে সমগোত্রীয় নয়। বাংলা রচনায় উচ্চারণ রূপান্তর অথবা সুরের

ক্ষেত্রে সামান্য হেরফেরও গ্রাহ্য নয়। সুর এখানে অবলম্বন মাত্র। বাংলা গান কথাকে কোনো প্রকারে ক্ষতবিক্ষত হতে দিতে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ বাংলা-কথার কোণগুলো এমনি তীব্র ও দৃঢ় যে তার একটুমাত্র খর্বতা বা পরিবর্তনও শ্রোতার কান পীড়ন করে। ধ্রুপদ ও খেয়ালগানে ভাষা নিয়ে সুরের পাকে সুপক্ক অথবা রূপান্তরিত করা হয়। বাংলা উচ্চারণের এবং প্রকাশের এ রূপান্তর এখন পর্যন্ত বাংলায় স্বীকৃত হয় নি। যদি স্বীকৃত হত তবে হয়ত বাংলা ধ্রুবপদ এবং খেয়াল গান চালু হয়ে যেত সহজে।

ধ্রুপদ-খেয়ালের ভাষা কাব্যরূপের প্রাধান্য দেয় না। সে জন্যে একই ধরণের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী রচনা সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ও পাকিস্তানেও একইভাবে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতকে বাংলায় বিষ্ণুপুরের সংগীত-সাধকগণ বহু গান চালু করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গায়ক ও শ্রোতার কান সেগুলোকে জনপ্রিয় করে আজ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় নি। এ শতকের তৃতীয় দশকে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরলিপিসহ সংগীত-গ্রন্থগুলো বিশেষভাবেই চালু ছিল। বহু সংগীতজ্ঞ ও শিক্ষকেরা এ বই আলোচনা করতেন। কিন্তু বাংলা ধ্রুপদ সেই ধারা থেকে প্রচারিত হতে পারে নি। অথচ সেকালের অনেক প্রকারের গান আজও চালু রয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ধ্রুপদ গানের প্রচলনের সপক্ষে বলবেন। মুশকিল হচ্ছে, গান সম্বন্ধে কোন ওপরওয়ালার নির্দেশ অথবা শাস্ত্রজ্ঞের বিধান এবং বিশেষজ্ঞের প্রচেষ্টা কোনরূপে ফলপ্রসূ হয় না। কোন রূপের সংগীতকে শ্রোতা বা গায়কের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। যদি ধ্রুপদের কাঠামো এবং রাগের বাঁধা-প্রকৃতি সবসময়ে বাঙালী শ্রোতার কানে ভাল লাগত তবে রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে যে ধরণের কিছু গান রচনা করেছিলেন পরেও হয়ত সারা জীবন ভরে সে ভাবে গান রচনা করে যেতেন কিংবা সমসাময়িক প্রয়োজনে অনুরূপ ভাবে ভাবতেন। দেখা যাচ্ছে তা' হয় নি। না হবার কারণটিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে সুরের ঐকান্তিক সত্তা, যাকে ভাষানিরপেক্ষ বলা যায়, বাংলা রচনার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করা যায় নি। সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় ধ্রুপদরীতির প্রয়োগ প্রকৃত অর্থে সার্থক হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও ভাবের অক্ষুণ্ণতাকে রক্ষা করে গানের প্রকাশ-ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। ধ্রুপদ থেকে স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী

আভোগ নামক রচনার কাঠামোকে গ্রহণ করেছেন। রাগের ও তালের structure বা কাঠামোও প্রয়োগ করেছেন। গোড়ার দিকে কিছু গান মৌলিক ধ্রুপদ গানের অনুসরণে রচনাও করেছেন। শ্রীদিলীপকুমার রায় লিখেছেন "রবীন্দ্রনাথ গোঁসাইজীর সহযোগে তুটি স্মরণীয় কাজ করেন বাংলা-গানের চাষ আবাদে; প্রথম বাংলা গানের বীজ বপন করেন ধ্রুপদী সুরের মাটিতে—গোঁসাইজীর নানান্ হিন্দী ধ্রুপদ ভঙ্গি অবিকল সেই সুর-তালের কাঠামোয় বাংলা গানের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন; দ্বিতীয়, নিজের অনেক মৌলিক বাংলা গান এবং ব্রহ্মসংগীতে তাঁকে দিয়ে সুর সংযোগ করান।" উনবিংশ শতকের শেষভাগে ও বিংশ শতকের প্রথমভাগে গোঁসাইজির মত এতবড় ধ্রুপদী এবং "এত নামডাক কারো হয় নি।" "গোঁসাইজির স্বভাবগত মাধুর্য ছিল অবর্ণনীয়।" দেশী সংগীতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, ধ্রুপদের সংগে তিনি বাংলা গান গাইতেন। কিন্তু সকল গায়কেরাই তখন যতটা সুরের দরদী ছিলেন ততটা কাব্যের দরদী ছিলেন না। অর্থাৎ কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব মিললেও "বিকাশ বেশি হয় নি অর্থাৎ বাংলা গানের যুগল মিলন সঞ্জাত সর্বাঙ্গসুন্দরতার তৃপ্তি মিলত না—যদিচ অগ্রদৌত্যের স্বর্ণরাগ-চ্ছটা মিলত পদে পদেই।"..."অবশ্য একথা ঠিক যে এসব গানে হুবহু হিন্দুস্থানীয় রাগসংগীতের রস মিলতেই পারে না—যেহেতু এগান কণ্ঠবাদন নয়—এ হল যথার্থ গান—মানে কাব্যসংগীত।" অঘোর চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং গোঁসাইজী সম্বন্ধেও দিলীপবাবুর একই রকমের নিরীক্ষণ (observation)। এবং ইনি একথা বলেছেন যে বাংলা গানের দাবীটা স্বতন্ত্র রকমের বলেই গোড়ায়ই স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়েছিল। বাংলা গানের ভাবসত্তা ও প্রকাশ স্বতন্ত্র-ধরণের, একথা এখানেও বলেছি। রাগের কাঠামো বা structure ছাড়া এবং রাগের মূল প্রকৃতিকে বর্জন করে এদেশে সংগীত সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিক ভাবে আপনার প্রয়োজনে গীতিকারেরা চলিত basic music বা মূল রাগসংগীতকেই অবলম্বন করেন। এটা স্বাভাবিক, কিন্তু একথা সত্য যে ধ্রুপদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলার সংগীত সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে পরিমাণে তার আবেদন বাংলা গানের দেহে ও প্রাণে সংরক্ষিত হয় নি। একথাও সত্য যে, বিষ্ণুপুরের কোন রচনাই গায়কসমাজে প্রচলিত হয় নি। রামমোহনের পরিকল্পনায় ধ্রুপদের নতুন প্রয়োগ সংগীতকে প্রসারিত করেছিল। ধ্রুপদ যেন রেনেসাঁসের শিল্পসত্তার একটি নতুন আলোকবর্তিকা।

এই সংস্কারের ধারাটি বহুজনের মধ্য দিয়ে নানা ভাবে রূপান্তর লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পর্যন্ত এসেছিল। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রারম্ভ।

এ পর্যন্ত ধ্রুপদের দ্বারা প্রভাবিত বাংলা গানের সম্বন্ধে যে কয়েকটি ভাবনার সূত্র পাওয়া গেল সে কথা সংক্ষেপে বলা যাক।

প্রথম ক্ষেত্রে, বর্তমান বাংলা গানের মূল গঠনে ধ্রুপদের রূপ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, ধ্রুপদের মনোরঞ্জনশক্তি ও তার প্রভাব অনেকটাই abstract অথবা নির্বিশেষ বলা যায়, তাই এই নির্বিশেষ রূপটি বাংলা কথা ও সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেজন্যে বাংলা গান ধ্রুপদের অনুরূপ সার্থক রাগপ্রধানসংগীত সৃষ্টি করতে পারে নি।

দ্বিতীয়ত, বাংলা গান অনেকটা মিশ্ররীতির কলা। বাংলা-গানে ভাষার প্রকৃতি মার্গসঙ্গীতের কায়দাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রাহ্য করতে দেখা যায় না এবং ভাষা ও ভাবকে গৌণ করে তাতে রাগ বিকাশের সুবিধা করতে দেখা যায় না।

তৃতীয়ত, প্রয়োজন অনুসারে কথাকে রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত উচ্চারণ করা ঘরাণাদের বৈশিষ্ট্য হলেও, বাংলা গানের জনশ্রুতিতে তা গ্রাহ্য নয়। ভাষা রাগবিকাশের সহায়ক নয় অনেক ক্ষেত্রে।

চতুর্থত, ঘরাণাগুলো কথাকে উচ্চারণের সময়ে রূপান্তরিত না করে সম্পূর্ণ-ধ্রুপদকে রূপদান করতে পারে না, কিন্তু এও বাংলায় গ্রাহ্য নয়।

পঞ্চমত, বাংলা গানের কথা ভাবসমৃদ্ধ। ভাবসমৃদ্ধি ত্যাগ করে ভাষা দাঁড়াতে পারে না, অন্যদিকে গানের প্রয়োজনে ভাষাকে গৌণ করা সম্ভব নয়। তাই দেখা যাচ্ছে বাংলা গানের উৎস মূলত প্রাকৃতিক বা প্রকৃতিগত। ভাষা ও ভাবসমৃদ্ধি খর্ব করে বাংলা গান কখনো চালু হয় না। যে সব বাংলা গান ধ্রুপদকে আশ্রয় করেছিল তাতে সুরের কাঠামোটাই ছিল প্রধান। তাতে পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদী রীতি বিকশিত হবার সুযোগ পায় নি, কাজেই বাংলা গানে ধ্রুপদ দাঁড়ায় নি কিন্তু ধ্রুপদ গান বাংলা গানের কাঠামো তৈরির সহায়ক হয়েছে, বহুক্ষেত্রে বাংলা গানে অনুরূপ গাম্ভীর্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। প্রাচীন কীর্তন গানে বিলম্বিত লয়ের ও বিভিন্ন তালের প্রয়োগ হয়েছে। তাই, বর্তমান বাংলা গানের structure বা কাঠামো ছাড়া আর কোথাও ধ্রুপদের লক্ষণ তাতে স্পষ্ট নয়।

ধ্রুপদ সম্পূর্ণ মার্গসঙ্গীত—সত্যিকার শাস্ত্রীয় রীতি প্রযুক্ত। এর সঙ্গে

খেয়াল ও ঠুংরীর প্রকৃতিগত বৈষম্য অত্যন্ত বেশী। খেয়াল ও ঠুমরী—সঙ্গীতের প্রাণবন্ত রীতি। পরিবর্তনের পথে বিশেষ রূপ লাভ করেছে—গীতকুশলী ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শে। নতুনের পর নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত পথে।

খেয়াল ও বাংলা গান

সেকালে খেয়াল গায়কের নামে নানা বিরুদ্ধ মতামত সংগীত-রসিকদের মধ্যে চলিত ছিল। মতগুলো ধ্রুপদের সমর্থনে। যথা—"খেয়াল গায়ক বেতালা", "খেয়ালী টপ্পার সংমিশ্রণ করেন", "খেয়ালী ঠুমরী দ্বারা প্রভাবিত", "খেয়ালী হাল্কা সারেঙ্গীয়া কায়দায় গান করেন", "খেয়াল গায়ক অস্থায়ী গানেওয়ালা" (এর বেশি কিছু সে জানে না বা গায় না), "খেয়াল নাট্কী তালের গান" (মহারাষ্ট্রে) ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব উক্তি ধ্রুপদগানের বাঁধাবাঁধি থেকে খেয়ালের মুক্তির কথা প্রমাণ করে। কিন্তু খেয়ালের স্বাতন্ত্র্য শুধু এই মুক্ত প্রকৃতিতে নয়, এর বহুমুখিতায়। অর্থাৎ নানান রীতি-পদ্ধতি নিয়ে খেয়াল গান নানারূপে গাওয়া হতে পারে। পরিবর্তনের পথও প্রশস্ত। গত একশত বছরের মধ্যে খেয়াল গানের রূপে যে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে তাতেই এই বহুমুখিতা ও প্রাণপ্রবাহ স্বীকৃত। অর্থাৎ যুগের উপযোগী শিল্পবোধের প্রতিফলন এই গানেই সম্ভব।

বর্তমান খেয়ালগানের সুর-প্রয়োগের রীতিকে নানা ভাবে গানে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা দেখা যায়। বাংলায় এ শতকে ত্রিশ দশকের সমসময়কাল থেকে এই প্রভাবের বিস্তার লক্ষ্য করা যেতে পারে। অতুলপ্রসাদ সেন খেয়ালের গায়নরীতি, বিশেষ করে ঠুমরীর ধারা অনুসরণ করে বাংলা গান রচনা করেন এবং সে গানগুলো মূলরীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। কাজী নজরুল গীতি রচনা করে মুক্তভাবে খেয়াল ভঙ্গিতে গাইবার জন্যে গায়কের হাতে তুলে দেন। কিছুকালের মধ্যে গীতিকার হিমাংশু দত্ত সুরসাগর এ পথে এগিয়ে আসেন। যাঁদের কণ্ঠে এ গান প্রথম যুগে প্রচারের বাহন হয় এঁরা হচ্ছেন দিলীপকুমার রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, শচীন দেববর্মন। বিশেষ করে খেয়ালঠুমরী-প্রভাবিত ঐ সব গান থেকেও অনেকটাই এগিয়ে যান জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী—কয়েকটি বাংলা গানে খেয়াল গায়কীর সরাসরি প্রয়োগ করেন। ভীষ্মদেবের কণ্ঠে

এবং কিছুকালের মধ্যে আরও নানা শিল্পীর দ্বারা গ্রামোফোন ও রেডিওতে প্রধানত এই শ্রেণীর গানের প্রসার হয়। সমসাময়িক কালে অনেক গীতিকার ও গায়ক এপথে এগিয়ে আসেন।

যাঁরা বলেন এ শতকের ত্রিশ দশকের পূর্বে খেয়াল বাংলা গানেও প্রচলিত হয়েছিল—খেয়ালী রীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে একথা ভুল মনে হয়। (টপ্পা আলোচনা দ্রষ্টব্য।) কেন এ কথা বলা হয় তা ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আসলে টপখেয়ালের একটা রূপ পূর্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশিষ্ট আঙ্গিক প্রয়োগ করে খেয়ালের অনুসরণ এ যুগেই হয়েছে। এ শতকের আগে কবি-গীতিকারদের মন কেড়ে নিয়েছিল ধ্রুপদ এবং টপ্পার রীতি। খেয়াল তখনো আজকের মতো মুক্তরূপে আসেনি। একথা পূর্বেই বলেছি, ধ্রুপদ বা খেয়ালের কোন গানের ছায়া নিয়ে, বা অনুসরণ করে কোন গান রচনা করলেই তা ধ্রুপদ বা খেয়াল হয় না। ধ্রুপদ অথবা খেয়ালী রীতিকে অবলম্বন করলেই সে গান প্রকৃত রূপ লাভ করতে পারে। ধ্রুপদের কাছে খেয়ালের প্রধান দাবী গায়কীর মুক্তি—কথা ব্যবহারে ও সুর ব্যবহারে মুক্তি এবং সেই সঙ্গে রাগ বিকাশের স্বাধীনতা। রাগবিকাশ করবার নানান পদ্ধতিও আছে। ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এই সব রীতি ভেবে অথবা অভিজ্ঞতা নিয়ে এশতকের ত্রিশ দশকের আগে গান রচনা হয় নি। হয়ত, অঘোর চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোঁসাইজী এবং লালচাঁদ বড়ালও বাংলা গান বা খেয়ালের মতো করে গেয়ে থাকবেন। কিন্তু প্রশ্ন, খেয়ালী রীতি দৃঢ়বদ্ধ ভাবে ও পরিপূর্ণ রূপে তাতে সঞ্চারিত হতে পেরেছে কি না?—যদিও সে যুগেই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে আমরা বলতে পারি, তবু স্বীকার করতে হবে যে তখন ভঙ্গি সঞ্চারিত হবার মতো অবলম্বন দাঁড়ায় নি। প্রভাব বিস্তৃত হয়ে বাংলা গান "সেই" রূপে নবকান্তি লাভ করছে এই যুগে। এই যুগে এসেও বাংলায় পূর্ণ খেয়াল হয়নি, রূপটি হয়েছে মৌলিক বাংলা গান, প্রয়োজন অনুসারে সম্ভবতঃ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এর নাম দিয়েছিলেন "রাগপ্রধান"।

কেন পূর্ণ খেয়াল বাংলায় চালু হয় নি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও প্রসঙ্গ আসে। এর কয়েকটি মূল কারণ সংক্ষেপে বলা দরকার, যদিও স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে নানা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা কথার ভাবসম্পদ ও গানের ইতিহাসের উল্লেখ নতুন নয়। খেয়াল গানের ভাষাগত বক্তব্য অত্যন্ত সাধারণ, সাদাসিধা, সহজ এবং ভাবের দিক থেকে

দুর্বল। সাধারণ মিলন-বিরহ দুঃখ, সহজ ভজন-পূজন অথবা অত্যন্ত ক্ষীণ, বাঁধাধরা স্তুতি, প্রকৃতি বর্ণনা অথবা সহজ রাধাকৃষ্ণ প্রেম নিয়েই এর শেষ। বিশিষ্ট কতকগুলো ব্যঞ্জনবর্ণ এবং শব্দ এই গানে সুর-প্রকাশের সহায়ক। তাছাড়া খেয়াল গানে অক্ষরগুলোকে বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারণ করতেও বাধা নেই; তুলনায়, বাংলা শব্দ অথবা শব্দসমষ্টি একযোগে উচ্চারিত হওয়াই রীতি। কথার এই অসংলগ্ন সহজ রূপটি গায়কের স্বাধীন সুর-উচ্চারণের কায়দাকে বেশি মর্যাদা দেয়। তাছাড়া উচ্চারণের হেরফের (এমনকি বিকৃতিও) গ্রাহ্য হয়ে যায়। বাংলা গানের কথার ভাবৈশ্বর্য, উচ্চারণের অবিকৃত রীতি, এবং শব্দগুচ্ছকে আবৃত্তি করবার স্বাভাবিক প্রবণতা খেয়াল গানের ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে আকাশ-পাতাল পার্থক্য সূচনা করে। এ জন্যই বাংলা খেয়ালকে গায়ক মুক্তভাবে প্রয়োগ করেন নি। টপ্পার জন্য নিধুবাবু সংক্ষেপ রচনার একটা পথ দেখিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। খেয়ালে বাছাই শব্দ ব্যবহার করে বিস্তার (সুরবিস্তার), বোল তান, তান, সারগম, ছন্দবিচিত্রার প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু খেয়ালের কণ্ঠভঙ্গি বা "কণ্ঠবাদন" এমনই ব্যাপার যে তাতে বাংলাত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে। সম্ভবতঃ এজন্যেই মৌলিক বাংলা খেয়ালের গায়কী চালু হয়নি। নজরুলের একটি খেয়ালোপম গান "শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়"—বাক্‌ভঙ্গিকে পরিপূর্ণ রেখে খেয়ালের সর্বরূপ বিস্তার দিয়ে রচিত, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর মুখে অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ গানটি একটি অনুরূপ মধ্যলয়ের খেয়ালের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায়—এ গানে খেয়ালী রীতি পরিস্ফুট হলেও খেয়ালী-রীতির পূর্ণস্ফূর্তি কখনও হয় নি। যা হয়েছে তাকে "রাগপ্রধান" বাংলা গান বলা হয়। এটা অনেকটা মধ্যপন্থা। আরও কয়েকটি গানে এরূপ খেয়ালী রীতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। কোন গানই আজ পর্যন্ত খেয়াল গানের আসরে এসে পৌঁছোয় নি। কিন্তু রচনা ঠিক হয়েছে।

যে কোন একটি গানকে খেয়াল করে রচনা করা বা সাধারণভাবে গাওয়া বড় কথা নয়, খেয়াল গায়কের কণ্ঠে রীতিসঙ্গত রূপে একটি মূল্যবান 'অস্থায়ী' রূপে গৃহীত হওয়া বড় কথা। কয়েকটি গানে শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রাগের রূপ ও ভাব বিকাশের অপরূপ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তী-কালে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী বাংলায় খেয়ালের রূপে তান-বোলতানের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী সারগম্ প্রয়োগের কায়দাটি স্বাভাবিক

করতে চেয়েছিলেন। শ্রীদীপালি নাগের রেকর্ডের গানে খেয়ালী-ভঙ্গিতে কথা ও সুরের সংমিশ্রণের কায়দা, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের গানে ঠুমরীর কুশলতার প্রয়োগ নানাভাবে বাংলায় খেয়াল ও ঠুমরীকে রূপদান করেছে। এসব ছাড়া ত্রিশ দশকের পর থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে খেয়ালী সুর-সংযোজনায় শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা উল্লেখ করা যায়। "আলোছায়া দোলা" এবং "যদি দখিনা-পবন আসে দুয়ারে" হিংমাশুকুমারের প্রযোজনায় এই দুটো গানে শ্রীশচীন দেববর্মনের প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়েছিল খেয়ালীভঙ্গির সংগীত দিয়ে। মোটামুটি, তত্ত্বের দিক থেকে বাংলা খেয়াল সৃষ্টিতে কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও, বাংলা কথা অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল গান গায়ক সমাজে বা খেয়ালের আসরে চালু হয় নি। একথা বলা দরকার, গান সৃষ্টিতে কোথাও কোন বাধা নিষেধও থাকতে পারে না, এ বিষয়ে মিলিত চেষ্টাও চলতে পারে। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলোও স্মরণ করি, কিন্তু সব সুবিধে সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেন পূর্ণাঙ্গ খেয়াল চালু হয়নি সে কথাটিই বিশেষভাবে মনে আসে।

এর কারণ বর্ণনায় একটি পুরানো তর্ক আসে—হিন্দী বাংলায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহারের তারতম্য। কিন্তু ভাষার এসব ত্রুটি বাধা নয়। আদর্শ খেয়াল-গায়ক ভাষার উচ্চারণের বাধানিষেধের মধ্যে বন্দী থাকতে রাজি নন। খেয়ালী এ ব্যাপারে গতানুগতিক শব্দ ব্যবহারের পথটা বোধ হয় ছাড়তে চান না, অনুচ্চারিত, অশুদ্ধ—অর্ধ-উচ্চারিত কথাকে অধিকতর আ, ই, উ, ও প্রভৃতি সংযোগ করে, অথবা দু-একটি ব্যঞ্জনবর্ণের অতিরিক্ত প্রয়োগ করে কণ্ঠবাদন—খেয়ালীর নিয়মিত কাজ। যদি গায়ক এভাবে বাংলা গান করেন শ্রোতার সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন কিনা সন্দেহ। বাঙালী শ্রোতার দিক থেকে পুরোনো রসিকতার কথা মনে পড়ে। "রাধার কোমরে ঘাগরী"—গানের কথায়, "কোমরে ঘা"তে বার বার থেমে থাকার পর "ঘা"তে সমের "হা" এসে যে দুর্ঘটনা ঘটায়, তাতে 'ঘাগরী' আর উচ্চারিত হয় না। বাঙালী শ্রোতার কান এই শব্দের অপব্যবহারে তৈরী নয়। রঙ্গিলা ঘরাণায় গানের বাণীকে আকর্ষণীয় করে তোলবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু ভাষার চালের মধ্যে যেন তান বিস্তার বাধা পেয়ে যায়। দেখা যায়, খেয়াল-ভিত্তিক গান রচিত হলেও. খেয়ালত্ব সম্পূর্ণ স্ফূর্তি লাভ করে না। কারণ কথার রচনাতে খেয়াল বিধিবদ্ধ নয়। সংগীতক্রিয়াই তার পূর্ণ স্ফূর্তি এবং গায়কের ধারাবাহিক রাগরীতির অভিব্যক্তিই খেয়াল। কথা কঙ্কাল

মাত্র। খেয়ালের কথার ভাষা দশ রকমের শব্দে সংমিশ্রিত, সহজ, ভাব-বৈচিত্র্যহীন, নিরলঙ্কার ও স্থূল। আলোচনা করলে দেখা যাবে অলঙ্কারপূর্ণ কাব্যিক ভাষা খেয়ালের বাধা স্বরূপ। সে জন্য দেখা যায় একই ধরণের স্থায়ী অথবা অন্তরা বিভিন্ন রাগের খেয়ালে পাওয়া যায়। প্রায় একই কথা বিভিন্ন ঠুমরী গানেও খাটে। নতুন রচনাও কিছু কিছু চালু হয়। কিন্তু সেই সব রচনা ওস্তাদদের গলায় সার্থকরূপে ফুটে উঠলে গায়ক তাকে সংগ্রহ করেন। একথাও অনস্বীকার্য যে মৌলিক ঘরাণায় প্রচলিত "চীজের" সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ, প্রতিটি রাগে গানের সংখ্যা যে খুব বেশি আছে এমন কথা বলা যায় না। যখন কোন ওস্তাদ বলেন কেউ হাজার হাজার খেয়াল জানেন,—উক্তি-গুলো হাস্যকর মনে হয়। সংখ্যাতত্ত্বকে বিশ্বাস করা আমাদের কাজ নয়। এক জন গায়ক শ'দেড়শ গান আর গুটি পঞ্চাশেক রাগ ভাল করে গাইতে পারলে বড় খেয়ালী হতে পারেন। খেয়ালের কৃতিত্ব সংখ্যায় নিরূপিত হয় না এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত গালভরা নাম ও তালিকা দ্বারাও নয়। গায়কীর প্রকাশের রূপে ও ভঙ্গি দ্বারাই রাগের উৎকর্ষ নিরূপণ করা হয়, যথা :—

(১) কোন রাগের বিশেষ অংশ কিভাবে সম্পন্ন করতে হয়?

(২) কোন বিস্তারে বিশেষ রাগ অংগের সংগে এক একটি অংশকে সার্থকরূপে সম্মিলিত করা যায়?

(৩) তানের গঠন-প্রণালী কিরূপ?

(৪) তানের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক কি ও কোথায়?

(৫) বিস্তারের সঙ্গে তানের সম্পর্ক কি? সংযোগ কোথায়?

(৬) সুরের প্রতিটি কলি কিভাবে সম্পন্ন করা যায়?

(৭) নতুন রকমের স্বর-সম্মিলন বা সুরকলি রচনা দ্বারা রাগবিকাশ হয় কি না?

(৮) স্থায়ীর মুখ সাজানোর কায়দা, বার বার ফিরে ফিরে আসার নতুনত্ব কি আছে?

(৯) তান ও বিস্তারের মধ্যে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় কিনা?

(১০) স্থায়ী অংশের ভঙ্গি কিরূপ, রচয়িতার কায়দা (বন্দেশ) কিরূপ? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যদিও নানা রকমের পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করা হয়নি, তবু এখানে বলব খেয়াল সম্বন্ধে এসব কথাই শ্রোতারা ভাবেন, এই পদ্ধতির আলোচনা

লেগে থাকে। এসব আলোচনায় কথা-রচনার প্রসঙ্গ অত্যন্ত সামান্য। ১০নং লক্ষণ থেকে বোঝা যায় স্থায়ীর গুণাগুণ নির্ধারণের জন্যে অনেক সময়ে ভণিতার খোঁজ-খবর করা যায়। অথবা গায়ক-রচয়িতার আলোচনা চলে। কিন্তু 'কথার' প্রকাশভঙ্গি যেরূপই হোক, স্বরের চাপ এর উপর এত প্রবল যে স্বরের সংযোজন ও বিভাজন কথাকে অপ্রধান করে। কোথাও 'কথা' ভাল থাকা সত্ত্বেও গানের "বাঢ়তে" তাকে গায়ক ইচ্ছে অনুসারে দুমড়ে, মুচড়ে, থিতিয়েও নিতে পারে। সামান্য সংখ্যক শব্দ ব্যবহারই হয় অবলম্বন। সব কথার বিষয়বস্তু একই অর্থে একাকার হয়ে যেতে পারে। আশা করি, উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণে বোঝাতে পেরেছি—ভাষা যেন স্বাভাবিক কারণে অপ্রধান হয়ে পড়ে এবং অক্ষর বা শব্দ অত্যন্ত খামখেয়ালী রূপেই হয় অবলম্বন। খেয়াল গানের এই স্থলে আইন-কানুন চলে না। আকাশবাণীর সর্বভারতীয় অনুষ্ঠানে গানের বাণীকে ঘোষণা করে' মর্যাদা দেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খেয়ালীদের গান শুনে দেখা যায় ভাষা সেখানে শুধু নেহাৎ অভ্যস্ত উচ্চারণ পদ্ধতি।

খেয়ালের কথায় বা বাণীতে—যথা, কগবা বোলে, বরখা রুতকী, বোলন লাগি রে, পিয়াকে নজরিয়া, পীর ন জানে, দৈয়া কাঁহা গয়ে, বনরা রঙ্গিলে ইত্যাদি ইত্যাদি—মামুলী শব্দগুলোই গানের অবলম্বন। খেয়ালী দৃষ্টি রাগবিকাশে নিবদ্ধ, কথায় নয়। কথা বড়জোর শব্দ মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে ভাষায় সমগ্রতা নেই, প্রতীকও নয়। এখানেই বাংলা রচনার প্রকৃতির সঙ্গে পার্থক্য। যদি বলা যায় একটি করে সুন্দর ভাবসমগ্র রচনা চালু হবে না কেন? উত্তর: নিশ্চয়ই চালু করতে পারেন। মনে রাখতে হবে খেয়ালের রচয়িতা মানে "খেয়াল গায়ক" নিজে—যে জন স্বরের স্থায়ীভাগকে সুন্দর করে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন—সুরকার নয়। খেয়ালের স্থায়ী রচনার বেলায় শিল্পীর সুরব্যবহারের প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি ক্রিয়াশীল। সেখানে আলাদা সুরকারের স্থান নেই, নিজেই সুরকার। যদিও সুরকার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও আমরা দিতে পারি, কিন্তু, খেয়াল গানে তা মিলে না। বর্তমান বাংলা গান এ পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে—গীতিকার আর সুরকার দুজনার সম্মিলিত ফল এবং সুরকারের সেখানে প্রাধান্য।

বাংলা কথা রচনায় সমগ্র জনসাধারণের কান বাংলাগান শুনে শুনে বাংলা প্রকৃতিতে এমন অভ্যস্ত হয়েছে, যে গীতি রচনার রীতিকে শ্রোতা আহত হতে দিতে রাজি নয়। কারণ, কবিমনের রচনা ছাড়া বাংলা গান গ্রাহ্য

হয় না এবং শ্রাব্য তো নয়ই। শ্রীদিলীপকুমার রায় এজন্যে কাব্যসংগীত কথাটি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছেন। সুরের প্রয়োজনে বাংলা রচনা সোচ্চার স্বেচ্ছাপ্রযুক্ত হবে—এ ভাববার কোন সুবিধেই নেই, অথচ স্বাধীনতা না পেলে খেয়াল গায়ক এ পথে পা বাড়াবেন না। তাই রাগপ্রধান গানও এক অর্থে কাব্যগীতি, কারণ সেখানে ভাষা রচনার ঐশ্বর্য বজায় থাকা দরকার। কিন্তু তবুও গায়কীর অভিনবত্বের জন্যে রাগপ্রধান গানে খেয়ালের যে ঐশ্বর্য নবকান্তি লাভ করেছে তাকে স্বাগত জানাতেই হয়। আসলে আমরা নকল চাই না, অভিনবত্বই চাই। মোটামুটি যে সকল কারণে একই ধরণের গান সমগ্র উত্তর ভারতের (পাকিস্তানেও) একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত খেয়াল হিসেবে চলেছে অথচ বাংলায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় নি সে কারণগুলোকে সংক্ষেপে বলা যাক :

(১) বাংলা গানের উৎকর্ষ এবং খেয়াল গানের উৎকর্ষ বিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র—বাংলা গানের শ্রোতা কথাকে বাদ দিয়ে গান শোনে না, খেয়াল গানের প্রধান লক্ষ্য—কথা নয়—গানের রীতি বা ভঙ্গি এবং রাগের বিকাশ ;

(২) বাংলা গানের প্রধান অবলম্বন ভাব ও ভাষার অবিকৃত রূপ, খেয়ালী কথার উচ্চারণ—গতানুগতিক, অভ্যাসপন্থী—বাধা-বন্ধ-হারা শুধু অক্ষর উচ্চারণ-পন্থী ;

(৩) বাংলা গান বাক্‌ভঙ্গি বা ইডিয়ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে না, খেয়ালের ভাষায় বাঁধা বাক্‌ভঙ্গি নেই, প্রয়োজন অনুসারে নানা শব্দ নানাভাবে উচ্চারিত হয় ;

(৪) বিলম্বিত চালে বাংলা গান চালু হবার পন্থা মোটেও নেই, অর্থাৎ হয় নি, কারণ সেখানেও শব্দ ও বাক্য ভেঙে ভাবগ্রাহ্য করবার সমস্যা বড় হয়ে দাঁড়ায় ("রাগপ্রধান" আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

তবুও, খেয়ালের যে বিপুল প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বাংলা গানে নতুন যুগসৃষ্টি করেছে সে কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মধ্যলয়ের খেয়ালকে রাগপ্রধান শ্রেণীর গান আংশিকভাবে খেয়ালরীতিকে কথা-সম্পদের মধ্য দিয়ে নতুনরূপে গ্রহণ করতে পেরেছে। এর সম্ভাবনাও অপরিসীম। এমনও হতে পারে রাগ-অবলম্বিত গান ভবিষ্যতে নতুন ভাবে প্রচলিত হবে, কারণ,

১। খেয়ালরূপের বহু প্রতিফলন হয়েছে,

২। প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের প্রয়োগ হয়েছে,

৩। তান ও সারগমের প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে নানা ভাবে,

৪। রাগবিস্তারের বহু অংশ বাংলা গানে প্রচলন হয়েছে—কোন কোন সুরকার মীড়, ঝটকা ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ করেছেন,

৫। আধুনিক গানের রূপকে সমৃদ্ধ করেছে,

৬। সময় হিসেবে ও ঋতু মেনে রাগ ব্যবহারও কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তর ভারতের সংগীতে এখনো চালু আছে,

৭। খেয়ালের মধ্যলয়ের ছন্দভঙ্গিও সহজে গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু এই সকল তো গেল আঙ্গিক বিচারে নানান অংশ প্রতিফলনের কথা। এ সম্পর্কে আরো একটি বিশেষ বিচার্য আছে—তা হচ্চে ব্যক্তিগত ভঙ্গি বা স্টাইল। ঘরাণার রূপান্তর যেমন সম্ভব নয় তেমনি স্টাইলকেও প্রতিফলিত না দেখলে খেয়ালকে সার্থক বলা যায় না। আমরা ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর ভঙ্গিতে সুরের ছন্দে ছন্দে বাকভঙ্গি গানে প্রয়োগ হতে দেখেছি অথবা ওঙ্কারনাথের যে আবেগ-প্রবণতা সুরে ও ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাকে রেকর্ড মাধ্যমে বাংলায় রূপান্তরিত করতে চেষ্টা হয়েছে এরূপ দেখেছি। আমাদের খেয়াল গানের রীতি এখনো অনুকরণশীল। কিন্তু, বাংলাদেশ মৌলিক খেয়ালীর উদ্ভাবনী-শক্তির অপেক্ষা করে। অর্থাৎ এমন রচনার উৎস দরকার যেখান থেকে ধারাবাহিক ভাবে ভঙ্গি সহকারে বহু গান গায়কীর গুণেই গ্রাহ্য হতে পারবে। তাহলেই এক ধরণের খেয়াল গান চালু হওয়া সম্ভব। এখানে নতুন যুগের বাগ্‌গেয়কারের[১] প্রয়োজন।

১। শাস্ত্রীয়-সংগীতে music composer অর্থে বাগ্‌গেয়কার শব্দটি বিশেষ ব্যবহৃত। বাগ্‌গেয়কারের ব্যাখ্যাও প্রচুর হয়েছে। কথা ও সুরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তি যখন পদ্ধতি, লক্ষণ এবং প্রযুক্তি বিদ্যার কৃতিত্ব দেখান তাঁকে এই নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু, বাগ্‌গেয়কার তিন শ্রেণীর: উত্তম, মধ্যম ও অধম। মধ্যম-অধম দুটো গুণই বিশেষ লক্ষণ বলে উল্লেখও আছে। রত্নাকরকার বাগ্‌গেয়কারের গুণ দিয়েছেন:—

(১) শব্দানুশাসন-জ্ঞান (২) অভিধান-প্রাবীণ্য (৩) ছন্দ প্রভেদ-জ্ঞান (৪) অলঙ্কার কুশলতা (৫) রসভাব পরিজ্ঞান (৬) দেশস্থিতি, অর্থাৎ কলাশাস্ত্রে প্রবীণতা (৭) তূর্যত্রিতয় চাতুর্য (৮) হৃদ্যশারীরশালিতা (৯) লয়তালকলাজ্ঞান (১০) অনেককাকু জ্ঞান (১১) প্রভূত প্রতিভা (১২) সুভগগেয়তা (১৩) দেশীরাগাভিজ্ঞতা (১৪) সমাজবাকপটুত্ব (১৫) রাগদ্বেষ পরিত্যাগ (১৬) সার্দ্রত্ব (১৭) উচিতজ্ঞতা (১৮) অনুচ্ছিষ্টোক্তিনির্বন্ধ (১৯) নবীনধাতুনির্মিতি (২০) পরচিত্ত পরিজ্ঞান (২১) প্রবন্ধ-প্রগলভতা (২২) দ্রুতগীতবিনির্মাণ (২৩) পদান্তরবিদগ্ধতা (২৪) ত্রিস্থান-গমকপ্রৌঢ়ি (২৫) আলপ্তি-নৈপুণ্য (২৬) অবধান।

টপ্পা

পাঞ্জাবের এই রাখালিয়া গানের উৎপত্তি কবে হয়েছিল বলা দুঃসাধ্য। টপ্পা যে গোড়ায় রাখালিয়া গান ছিল একথাও জনশ্রুতি। ধ্রুপদের প্রারম্ভিক রূপ যাই হোক না কেন এর একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। খেয়াল কয়েকশত বৎসরের মধ্যে ধ্রুপদকে ভেঙে স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। এমনও হতে পারে লোক-প্রচলিত এক ধরণের গীত থেকেই খেয়ালের উৎপত্তি হয়েছিল। খেয়াল বিশেষ করে দিল্লী অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে আকবরের সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু, টপ্পা পুরোপুরি আঞ্চলিক গীতি। "ডপা (টপ্পা) পাঞ্জাবেই বেশীর ভাগ গাওয়া হয়। এই দেশের ভাষাতেই রচিত হয়। দুই থেকে চারটি কলিতে নিবদ্ধ, এর বেশীও হতে পারে। তবে দুটি দুটি পদান্ত ভিন্ন ভিন্ন মিল যুক্ত হয়। এটি প্রেম সংগীত।" (-ফকিরুল্লাহ, মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা: শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র।) কিন্তু একথা সত্য যে রাগসংগীতের উৎস সন্ধানে বেরুলে অনেক রকমের লোকপ্রচলিত, আঞ্চলিক রূপে পৌঁছে যাওয়া যায়। টপ্পার বহু বিশ্লেষণই মনগড়া। বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা যায় না, শুধু বলা চলে টপ্পা প্রেম-সংগীত, পাঞ্জাবে এর উৎপত্তি ও প্রচলন, সপ্তদশ শতাব্দীর ফকিরুল্লাহ একথা বলে গেছেন। গানের প্রকৃতিতে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি বর্তমান, সে কথাই আমাদের বক্তব্য। কারণ, টপ্পা অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাকে প্রভাবিত করেছিল।

গানগুলো আলোচনা করে ও অভ্যাস করে দেখা যায় সংগীত-রীতি হিসেবে কয়েকটি মাত্র বিশেষ লক্ষণ এতে বর্তমান। হয়ত, প্রথম টপ্পা সৃষ্টিতে এসব লক্ষণ ছিল না, লোকগীতির মত এগুলোর মধ্যে কতকটা চটুলতাই বর্তমান ছিল। তাতে গীতির পাঞ্জাবী কথা এবং কোথাও কোথাও অন্ত্য-মিলের চেষ্টা দেখা যায়। পাঞ্জাবী ভাষায় কথাগুলো অত্যন্ত বাঁধাধরা। যে সমস্ত রাগে টপ্পা রচিত হয়েছে তা অধিকাংশই সম্পূর্ণ জাতীয়, অর্থাৎ সাতটি স্বরের ব্যবহারই তাতে চলে এবং কতকটা সরল, সহজ এবং লঘু ভাবোদ্দীপক। খাম্বাজ, কাফি এবং ভৈরবী ঠাটের রাগই এর প্রধান অবলম্বন। পরবর্তীকালে,

শাস্ত্রে এসব গুণ সন্নিবেশের পরেও খেয়াল রচনায় অধিকাংশ রচয়িতার মধ্যে প্রথম দুটো ও ২১, ২২, ২৩ সংখ্যক গুণ অপ্রধান। কারণ, গায়ক-রচয়িতা ক্রিয়াসিদ্ধ ব্যক্তি, শুধু সংগীতক্রিয়ার অতিরিক্ত ভাষা সম্বন্ধে তার মধ্যে কোন ভাবনা থাকা সম্ভব নয়।

গুরুগম্ভীর ভাবোদ্দীপক টপ্পা রচনার চেষ্টা করা হয়েছিল, সে চেষ্টারও প্রমাণ পাওয়া যায় ইমন, ভূপালী, কেদার, মূলতানী, পুরিয়া প্রভৃতি রাগে টপ্পা রচনার উদাহরণ থেকে। কিন্তু সেগুলোও ওস্তাদদের নিতান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। টপ্পার সুর সংযোজনা ও চলনে দ্রুততান প্রয়োগ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, একথা সকলেই জানেন। সাধারণ কথায় তাকে 'জম্‌জমা' বলা হয়। এই শব্দটির উল্লেখ ব্যতীত এর আর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। জম্‌জমা শব্দটি সংগীতে টপ্পার দানাদার তান বোঝায়। "আসলে জম্‌জমা (zamzama) শব্দের অর্থ সুরকরে পড়া। ইংরেজিতে যাকে chant বলে সেই রকম। জম্‌জমা-পরদাজ, জম্‌জমা সনজ, জম্‌জমা গুইয়ান্‌, জম্‌জমানাক্‌ শব্দে 'গায়ক' বোঝায়" [মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা]।

টপ্পা শ্রেণীর গানে যে তান ব্যবহার চলে তাকে চিত্ররূপ দিয়ে "বেণী" বলা যেতে পারে। "বেণী" অলংকারটি সংগীতশাস্ত্রে আছে। কতকগুলো তরঙ্গের স্তর গায়ে গায়ে সাজিয়ে দিলে যেমন দেখতে হয়, সেইরূপ স্বরগুলোকে নানান স্তবে সাজিয়ে যাওয়ার কারুকর্ম নিয়েই টপ্পার উৎপত্তি। ছন্দের contrast বা বৈপরীত্য এর সৌন্দর্য। অর্থাৎ, প্রচলিত পাঞ্জাবী ঠেকা বা মধ্য-বিলম্বিত গতি ত্রিতালের (মধ্যমানের) বিশিষ্ট ভঙ্গিতে গানগুলো বিন্যস্ত। মধ্যমান অর্থে ত্রিতালের ঝোঁক প্রতি তালের ওপর না পড়ে, প্রতি তালের মধ্যে ঝুঁকি সৃষ্টি করা। এরূপ তালের সঙ্গে টপ্পা গায়কের তান স্তবকে স্তবকে গড়িয়ে স্তরে স্তরে আরোহণ অথবা অবরোহণ করবে। প্রতিটি তানের গতি শেষ হবে সমের ভাবসম্মিলনে এবং একটি বিশেষ রকমের বাঁধা "মোকামে"। তানগুলোর মধ্যে সংযোগ অনেকটাই অবিচ্ছিন্ন রাসায়নিক সংযোগের মত। দানাগুলোকে বহু রকমের খেয়ালী তানের মত খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও জটিল করা যায় না, যদিও স্তবক সৃষ্টিতে একটা স্বাভাবিক জটিলতা আসে সন্দেহ নেই। আমরা শাদা কথায় তাকে জড়ানো গিটকারী বলতে পারি। মোটামুটি, তানের রূপ, গানের মুখ বা স্থায়ী গাইবার বাঁধা ভঙ্গি এবং তানের ছকবাঁধা সুর এই সব মিলে টপ্পার পরিসর ও পরিবেশ সীমিত ও সঙ্কীর্ণ। এধরণের তান স্বতন্ত্রভাবে ঠুমরী ও খেয়ালেও ব্যবহার করা হয়। সেজন্যেই এ গানের প্রচলন বেশি হয় নি এবং এ গানে সৃষ্টির আনন্দে মৌলিক চিন্তার অবকাশও শিল্পীর কিছুমাত্র নেই।

আমরা জানি, ধ্রুপদের পরিমণ্ডলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের ভাবনার যোগ

যেমন নেই, আঙ্গিকও তেমনি দৃঢবদ্ধ আইন-কানুনে বাঁধা। খেয়াল ও ঠুমরী ভাব ও সৌন্দর্যের দিক থেকে অনেকটাই জীবনের সঙ্গে যুক্ত বলেই আরো বেশি প্রচলিত হয়ে আত্মরক্ষা করে চলেছে। কিন্তু টপ্পারীতির কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ বিস্ময় সৃষ্টি করে। টপ্পারীতি বিগত শতকে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয়েছিল, সাধারণ সংগীতকারদের আদরণীয় হয়ে একেবারে জনসমাজে পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ সে মৌলিক টপ্পারীতি আজ অচল। বাংলাদেশে পাঞ্জাবী টপ্পা প্রচলিত হলেও তাল বিভাগে তাকে অনেকটা সরল করে নেওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ টপ্পার তানের বহু স্তর ও স্তবককে কতকটা সরল করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ গায়কের গানে এ ভঙ্গি সহজে স্ফুরণ হওয়ার কারণ—টপ্পার তান সহজাত অভিব্যক্তির ফসল। গলার স্বাভাবিক গিটকারী এই রীতির ভিত্তি বলেই, টপ্পার তানের ভঙ্গি বাংলা কীর্তন, শ্যামাবিষয়ক গান এবং কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারদের অবলম্বন হয়েছিল। বাংলায় এ গিটকারী একটু ধীরগতি, তা ছাড়া গলার স্বাভাবিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে এ গিটকারী অনেকটাই সুসমঞ্জস। দেখা গেল পশ্চিম থেকে এ গানের রীতি বাংলায় আসা মাত্রই তাকে ভেঙে বাংলার গায়কেরা প্রয়োগ করতে পারছে। কিছু কিছু শোরী, সারাসারের টপ্পা অনুসরণে নিধুবাবু নিজে গীত রচনা করলেন এবং তানের স্তবক ও স্তর সহজেই যুক্ত হল। সাধারণ প্রেমের গানে ভঙ্গিটি খাপ খেয়ে গেল। খেয়ালের গায়কীভঙ্গিতে যে বহু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, গানে বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজনে যে ভাবে তাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া প্রয়োজন হয়, টপ্পা ভঙ্গিতে তার প্রয়োজন হল না।

পরবর্তীকালে টপ্পাগানের স্তবক ও স্তরগুলো আরো লঘু ও খণ্ড খণ্ড হয়ে এসেছিল। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে তান খেয়ালে ও ঠুমরীতেও মিশ্রিত হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু টপ্পা, নিধুবাবুর রচনার জন্যেই, বাংলা গানের একটি বিশেষ section বা শ্রেণীরূপে প্রচারিত হবার সাময়িক সুযোগ পেয়েছে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং রচনার মৌলিকতার কথা ছেড়ে দিলেও, একথা অনস্বীকার্য যে টপ্পায় তানের তরঙ্গ ও শোরীর অনুসরণে ভঙ্গির উদ্ভাবন বাংলা গানের ক্রমবিকাশে যুগান্তকারী সৃষ্টি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে বাংলার কণ্ঠপ্রকৃতির সঙ্গে টপ্পার একটা সহজাত মিল ছিল—গিটকারীর স্বাভাবিকতায়। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী কোন কোন ভাটিয়ালী গানে দু একটি টপ্পার তানের স্তবক লক্ষ্য করেছিলেন। টপ্পার কায়দা শ্যামসংগীতেও সম্প্রসারিত

হয়, কাজেই কিছু কিছু তান সাধারণ গানেও যুক্ত হতে থাকে। সে যুগে টপ্পাই নব্যরচনার পথ প্রদর্শক।

জনৈক ওস্তাদের (ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেনের) মুখে শুনেছিলাম—"আগেকার বিভিন্ন ঘরাণার খেয়াল গায়কেরা বলতেন, যে খেয়ালী টপ্পা আদায় করেনি, সে প্রকৃত খেয়ালী হতে পারে না।" মুহম্মদ হোসেন টপ্পা শিখেছিলেন তৎকালীন পঞ্জাবের হস্নুমিঞার কাছে (পরবর্তী কালে ঢাকার) এবং কোলকাতার রমজান খাঁর কাছে এবং সবশেষে ওস্তাদ তসদ্দুক হোসেন খাঁর কাছে (যিনি শেষ জীবন মেদিনীপুরে কাটিয়ে সেখানে স্বর্গত হন), এবং মুহম্মদ হোসেন কিছুকাল (বড় গোলাম আলী খাঁর পূর্বপুরুষ) কালেখাঁর সঙ্গেও ছিলেন। মহম্মদ হোসেনের কাছে এদের প্রত্যেকেরই উপদেশ ছিল "খেয়ালীকে টপ্পা আদায় করতেই হবে।" কণ্ঠস্বরের দ্রুত সঞ্চরণ শক্তি ও তানের শ্রুতিমাধুর্যের জন্যই বোধ হয় এই নির্দেশ। তবে একথাও সত্য যে খেয়াল গানে তানের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে টপ্পার তানের স্তবক তাঁরা সেকালে বাদ দিতেন না। বিস্তারে বৈচিত্র্য-সৃষ্টি বিগত যুগে ব্যাপক ভাবে সকল খেয়ালীর মধ্যে ছড়ায় নি, তান-পল্টার প্রতি আকর্ষণই বেশি ছিল। এই কায়দাতে কিছু কিছু খেয়াল গান টপ্পা-রীতি প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বাংলা দেশেই গায়কী অনেকটা টপ্পা প্রভাবিত হয়। লক্ষ্য করলে উত্তর ভারতের কোন কোন ঘরাণার খেয়ালেও জমজমা তানের প্রভাব প্রচুর দেখা যাবে।

গানের সুর বিস্তারের পুরো স্থানটি যখন টপ্পার তানের ভঙ্গিতে তরঙ্গায়িত হয় এবং গানের ছন্দ যখন মধ্য-বিলম্বিত বা স্বল্প ঢিমে লয়ে থাকে তখনই গানের রূপে টপ্পার ভাব আসে। আসলে খেয়াল গানের বহু আঙ্গিক সেকালে প্রচারিত হয় নি, সুর বিস্তারের পদ্ধতিও সীমিত ছিল। তানকর্তবে খুব বেশি জটিল পল্টার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না, তাই খেয়ালগান অনেকস্থলে টপ-খেয়ালে পরিণত হয়েছিল। টপখেয়াল স্বভাবসৃষ্ট গায়কীরীতি, অনেকটাই খেয়ালীর গীত-পদ্ধতি নয়। টপখেয়াল বলে কোন বিশিষ্ট শ্রেণীও নেই, তার গানও নেই। কথাটি দিলীপবাবু বেশি চালু করেন। যাঁরা সেকালে ধ্রুপদের চর্চা করতেন বা ধ্রুপদপন্থী ছিলেন তাঁরা গানে সামান্য বিস্তার করে, অথবা না করে, দু একটি বাঁটের ব্যবহার করে টপ্পাভঙ্গির তান প্রয়োগ করতেন। এই পদ্ধতিটি টপখেয়াল নামে পরিচিত হয়। ছন্দের দিক থেকে এসব গান

সাধারণত ত্রিতালেই বাঁধা থাকত। শ্রীদিলীপকুমার রায় সেকালের অঘোর-চন্দ্র চক্রবর্তীর দানাদার টপ্পাব তানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন ধ্রুপদী। অঘোরনাথ চক্রবর্তী সম্বন্ধে সবচেয়ে মৌলিক উক্তি পাওয়া যাচ্ছে শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যের লেখা থেকে—"তিনি ধ্রুপদই গাইতেন। তবে টপ্পাও গাইতেন না, তা নয়। যেমন ধ্রুপদে তেমনি টপ্পায় তিনি ছিলেন অসাধাবণ গায়ক। ভজন গানও তিনি অনেক আসরে গাইতেন এবং তাঁর ভজন অপূর্ব হত। তাঁব সেই সব গান ছিল টপ্পা অঙ্গের" [বিষ্ণুপুর ঘরাণা]। অঘোর বাবুর পরে বাংলা গানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রসসৃষ্টি করেন রাধিকা গোস্বামী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো কণ্ঠ সে যুগে ছিল না। পুঁজিও বিশেষ ছিল না, "কিন্তু তাঁব ছিল অনন্যতন্ত্র কল্পনা ও অসামান্য তানের প্রতিভা।"—"রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো", মাঝে মাঝে তব দেখা পাই," "আমার মন ভুলালে যে কোথায় আছে সে," "আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো," "কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল," "বিয়োগ বিধুরা রাজবালা" প্রভৃতি গানে তিনি হিন্দুস্থানী টপখেয়ালেব যে লীলায়িত আনন্দের ঢেউ তুলতেন তাতে রসজ্ঞমাত্রেবই প্রাণ উঠত দুলে। এই ভঙ্গি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাছে থেকে শেখেন—তিনি বাংলা গানে তান বিকাশের ও সুর বিহারেব এক নতুন আভাস ও সম্ভাবনা দেখিয়ে দিলেও তাঁর কণ্ঠে বাংলা গানের সুন্দরতম রূপটি ব্যাহত হত, তিনি যতটা সুরের দরদী ছিলেন ততটা কাব্যের দরদী ছিলেন না। একথা গোঁসাইজী ও অঘোর বাবু সম্বন্ধে সমান খাটে।"—কিন্তু এঁরাই ছিলেন বাংলা গানের অগ্রদূত। অর্থাৎ বলা হয়ে থাকে এমনি করে একটা টপখেয়াল-ধরণের ভঙ্গির দিকে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে রূপটিও বাংলা গানে চালু হয় নি। প্রধান কারণ, যাঁর গানের তান স্বাভাবিক ভাবেই ফেরে তিনি নিজের মতো করে একটা রীতি উদ্ভাবিত করে নেন। কিন্তু, তা প্রকৃত খেয়াল গানেব তান নয়। খেয়ালের তানে বহু রকমের ফর্মুলা প্রয়োগ করে তাকে বিচিত্র করা হয়, খেয়ালের তান অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত সঞ্চরমাণ কণ্ঠের রাগ-বিস্তার, নিছক গিটকারী নয়।

গ্রামোফোন রেকর্ডে লালচাঁদ বড়াল থেকে আরম্ভ করে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী পর্যন্ত একটি ধারা এযুগে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। যিনি এঁদের মতো সাধারণ্যে বেশি প্রচারিত হন নি অথচ উনবিংশ শতকের ধারাটিকে

অনাবিল রেখেছেন এবং প্রকৃতরূপে যিনি আজ পর্যন্ত রক্ষা করে চলেছেন তিনি শ্রীকালীপদ পাঠক। শ্রীকালীপদ পাঠকের রীতি বাংলা টপ্পার রীতি, তানের কাঠামো পুরোনো ধারা থেকে কতকটা সরল করা হয়েছে। তানের গতি একটু ঈষৎ ধীর, কিন্তু স্তবক ও স্তরগুলো অবিকৃত ও কতকটা সংক্ষিপ্ত। জানি না টপ্পার এ রূপটি এরপর বজায় থাকবে কি না? আরো অনেক গায়ক এ চর্চা করেন। রেডিও মারফতেও প্রচারিত হয়, কিন্তু নিবিড়রসঘন যে রূপ শ্রীপাঠকের মধ্যে দেখেছি, উদাহরণ-স্বরূপ শুধু তারই উল্লেখ করা গেল। এদ্বারা প্রমাণ হয় এখনো কিছু কিছু শ্রোতা আনাচে কানাচে আছেন যাঁরা উনবিংশ শতকের সংরক্ষিত পুরোনো রস আস্বাদন করেন। কিন্তু, সেগুলো পুরোনো শোরী সারাসারের টপ্পার প্রতিরূপ নয়। খাঁটি বাংলা টপ্পা, বাংলার একটি মৌলিক গীতরূপ।

ঠুমরী

নায়ক-নায়িকার মধ্য দিয়ে ঐকান্তিক প্রেমের অভিব্যক্তি হয় ঠুমরী গানে। গায়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়িকা হয়ে দাঁড়ান। ব্যক্তিগত ভাবাবেগ প্রকাশের স্বাধীনতা আর কোন গানে এ ভাবে পাওয়া যায় না। অনেক সময়ে মনে হতে পারে কীর্তনের একটি পুর্ণ পালাতে পুর্বরাগ, মান, বিরহ, মাথুর ইত্যাদি যে বিচিত্র প্রকাশ আছে, একটি ঠুমরীতে সেই পুরো নাটকীয় ভাব-প্রকাশের সুযোগ আছে, অথচ বর্তমান রীতিতে সে নাট্যরস নেই। এক সময়ে বাঈজীরা নেচে ঠুমরী গাইতেন 'ভাও' ছিল তাদেরই ভঙ্গি প্রকাশ। রুচিবাগীশের চোখে প্রেমের অভিব্যক্তি এত বেশি উৎকট ঠেকে যেত যে ঠুমরী গান রাগ-সংগীতের আসরে পৌঁছাতে পারে নি। কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় এজন্যেই বড় আশান্বিত ছিলেন। তিনি ঠুমরীর অপরিসীম সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। বিগত শতাব্দী থেকেই ঠুমরীর গীতরীতি একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গিরূপে দানা বাঁধল, বাইজীর আসরে নৃত্যশীলার গান হিসেবেই রইল না। বিশেষ করে কলকাতায় নির্বাসিত ঠুমরী গানের নায়ক ওয়াজেদ আলীকে কেন্দ্র করেই এই রীতি আরো বিশিষ্ট হল।

খেয়াল কিংবা ধ্রুপদের মধ্যে নায়ক-নায়িকার প্রেমের যে অভিব্যক্তি আছে গানের মধ্যে তার রস-বিস্তার হয় না, যদিও নায়ক-নায়িকার ভাবাবেগের আদান-প্রদানের নানা বৈচিত্র্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হিন্দুস্থানী

সংগীতের পার্শী গ্রন্থেও এর বর্ণনা আছে (রাগদর্পণ, ফকিরুল্লাহ)। কিন্তু ধ্রুপদ খেয়ালের প্রধান লক্ষ্য সেই রস-সৃষ্টিতে থাকে না। রসের উল্লেখ হলেও রাগ প্রকাশের নানা ভঙ্গির সম্বন্ধেই সচেতন করে দেয়। ধামার প্রেমোল্লাসের গান, আবির ও রঙের তাতে ছড়াছড়ি, রঙ ছাড়া ধামার হয় না। কিন্তু ধামার গানের বিশেষ সৌন্দর্য, উল্লসিত ছন্দ প্রকাশের গুরুগম্ভীর দ্যোতনাতে পরিস্ফুট, কোমল ভাবাবেগ তাতে অত্যন্ত গৌণ। তুলনায়, হোলী ঠুমরীতে দেখা যায় আবেগপ্রবণ প্রেমোল্লাসের ভাব আকর্ষণীয়রূপে ফুটে উঠেছে। যেন প্রেমের চাতুরী ও দুঃখ আমাদের ঘরের আনাচে কানাচে প্রবেশ করেছে। এজন্যে ঠুমরী মন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে ও রাগের সুরকল্পনার জগৎ ছেড়ে একেবারে জনসমাজের মধ্যে এসে পড়েছে। মন্দির প্রভৃতিতে অপাংক্তেয় হয়ে থাকার কারণও অনেকটা জাগতিক প্রেমের প্রতি অরুচি। ঠুমরীর কায়দা সহজেই গায়ক গায়িকাকে নায়ক বা নায়িকা করে তোলে। এখানেই ব্যক্তিগত ভাবের সুবিধে হয়। ঠুমরী মধুর-রস-প্রধান, প্রেমের সুরেলা অঙ্গে ও সুরপ্রকাশের বিশেষ ভঙ্গিতে এর রূপ প্রকাশিত। কি ধরণের বিরহ, বেদনা অথবা মান, অভিমান, বিরাগ, অকারণ বিরক্তি ইত্যাদি ভাব প্রকাশ হবে, কিরূপ সুর ও ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি বা 'ভাও' তাতে থাকবে—ঠুমরী গানে এসব আঙ্গিক এখন কতকটা নির্দিষ্টই আছে, কিন্তু এর মধ্যেও গায়কের ব্যক্তিগত ভঙ্গিপ্রকাশেরও সুবিধে আছে।

আধুনিক কালে ঠুমরীর মূল প্রকৃতি খর্ব হতে দেখা যায়। কোন কোন স্থলে গান শুধু একটি ভঙ্গিতে পরিণত হয়, ভাবাভিব্যক্তির চেয়ে খেয়ালের মত সুর সংযোজনার দিকে লক্ষ্য চলে যায়। বহু আঞ্চলিক ভঙ্গিও ঠুমরীর মধ্যে উদ্ভাবিত হয়। অর্থাৎ, নানারূপ সুর প্রকাশের চাল এতে প্রবেশ করে। পার্শী ও আরবী সংগীত-ভঙ্গির কিছু কিছু প্রভাব পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকগীতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। "পাঞ্জাবীতর্কিফ" ঠুমরীতে আজকাল প্রযুক্ত, অর্থাৎ সে ধরণের স্বরগুচ্ছ ঠুমরী গানে এসেছে। উত্তর ভারতের পল্লীগীতি থেকে কিছু কিছু সংযোজনও এর মধ্যে হয়ে থাকে, যথা চৈতী কাজরী, দাদরা ইত্যাদি। প্রেমের অভিব্যক্তিতে আবেগের সহজ প্রকাশে, গানে 'বিশেষ' সৃষ্টি হয়। কোথাও কোথাও আবেগের প্রতি লক্ষ্য না রেখে গায়ক কতকটা খেয়ালী রাগ-বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি করেন—সারগমের প্রয়োগ করে। অর্থাৎ এই স্বাধীন আহরণীবৃত্তি ঠুমরীকে নিছক আবেগপ্রধান গানে পরিণত না করে

বিশিষ্ট ভঙ্গির গানরূপে পরিণত করে। নায়ক-নায়িকার মূল ভাবটি হয় রীতি মাত্র। এই রীতি সম্প্রসারিত হয়ে ঠুমরীর ভঙ্গিটি একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ঠুমরীর গীতি পদ্ধতিতে নমনীয়তা ও কমনীয়তা আছে, পাথুরে প্রাচীনতায় সে স্তম্ভিত হয়ে থাকে নি, প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করেছে, শুদ্ধ ও বদ্ধ হয়ে থাকে নি। সেজন্যে স্বরগুচ্ছের নানারূপ যোজনার কায়দাও ঠুমরী গানের রীতিকে প্রভাবিত করেছে।

"ওয়াজেদ আলী ঠুমরী সৃষ্টি করেছিলেন"—বক্তব্যটি লোক-প্রচলিত হলেও এতে ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। কারণ, ঠুমরী রীতিটি সাধারণ মনের দাবীতে সৃষ্ট একটি বিবর্তিত ভঙ্গি মাত্র। ওয়াজেদ আলীর আমলে হয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা চূড়ান্ত অবস্থা এসেছিল, রচনা ও অনুশীলনের একটি নির্দিষ্ট ধারার প্রবর্তন হয়েছিল, ধীরে ধীরে "নাচাও" ও "ভাও" ঠুমরীর রীতির পন্থাও নির্দিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু ওয়াজেদ আলী বা কোন ব্যক্তিবিশেষকে ঠুমরী সৃষ্টির দায়িত্ব আরোপ করা যায় না। মীর্জা খাঁ এবং ফকিরুল্লাহ্‌র সময়েও 'ঠুমরী' বর্তমান ছিল। ফকিরুল্লাহ্ সাহজাহানের সময়কার লোক, ঔরঙ্গজীবের সময়েও বর্তমান ছিলেন। অতএব এঁর পরবর্তীকালে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠুমরীর আঙ্গিক স্পষ্টভাবেই গড়ে উঠেছে—একথা বলতে অসুবিধা নেই।

ঠুমরীর আর একটি লক্ষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে গীতরীতিটি অনেক স্থলে লোকগীতি-প্রভাবিত। অবশ্য সকল প্রকার সংগীতের মূল সন্ধান করতে করতে লোকগীতিতে পৌঁছে যাওয়া চলে। যখন ধ্রুপদ খেয়ালের ধারাগুলো পরিপূর্ণ বিকশিত অন্যদিকে ঠুমরীও আত্মপ্রকাশ করছে, তখন লোকগীতির এক শ্রেণীর গান সংমিশ্রিত হতে থাকে ঠুমরীতে। ঠুমরীর আঙ্গিক সম্প্রসারিত হয়। এভাবেই দাদরা ভঙ্গিটি ঠুমরীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে, চৈতী এবং কাজরীও ঠুমরীর আঙ্গিকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঠুমরী গণিকা সমাজের প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু ওয়াজেদ আলীর কলকাতা বাসের জন্যে বাংলায় ঠুমরী গীতরীতি রূপে প্রচারিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলা দেশে পরে মৈজুদ্দিন খাঁ এবং গিরিজাশঙ্করের প্রভাবেই মূলত এর প্রসার। অবশ্য এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিচারে আরো সমসাময়িকের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের ভাবনা স্বতন্ত্র।

ঠুমরীর বিশেষ আঙ্গিক "বোল" তৈরির রীতিতে নিবদ্ধ আছে। "বোল-তৈরি" কথাটির অর্থ, সুর-কলিতে বিশিষ্ট ধরণের স্বরগুচ্ছের বিন্যাস। এই

বিন্যাস প্রেমাভিব্যক্তির সহায়ক। কয়েকটি স্বরসমষ্টিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথার মধ্য দিয়ে যেন একই বক্তব্যের রচনা করা। এই রচনার অবলম্বন হচ্ছে একটি ক্রিয়াপদ অথবা একটি আহ্বান যথা, 'ননদী তোকে গালি দেব', 'ঘুম থেকে জাগিও না,' 'দৃষ্টিবাণ হেনো না,' 'কেমন যে পীরিতি লাগিয়েছো!' 'কেন প্রেম করেছ,' 'কেন ইয়ার্কি করছ'? ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথাগুলোর মধ্যে দুএকটি ক্রিয়াপদ এবং অনুজ্ঞাই প্রধান। ঠুমরী গায়ক অনেক সময়ে এর সঙ্গে অভিব্যক্তির জন্যে উপস্থিতক্ষেত্রে আরো কিছু সহজ কথা জুড়ে দেন। বাংলাগানের রীতিকে যে ভাবেই বিশ্লেষণ করা যাক না কেন, কথায় এমন সীমানা টেনে দেওয়া যে ভাষার অতিশয় বিন্যাস বাঙালীর কান সহ্য করতে নারাজ। ভাষার কাব্যগুণই হচ্ছে বাংলায় প্রধান। এই প্রধান ফর্মুলাটি বার বারই নানাভাবে বলা হয়েছে। ভাষার কাব্যগুলিই সুরকে নির্বাচনের পথে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। কথার নির্বাচন এবং স্বরগুচ্ছের নির্বাচন এই দুটোতে মিলে ঠুমরীর আঙ্গিকের পুরোপুরি প্রকাশ হতে দেখা যায়। আবেগ প্রকাশের জন্য অথবা বিশিষ্ট স্বরগুচ্ছ ব্যবহারের জন্য বিশেষ কাব্যিক কথা নির্বাচনের প্রয়োজন ঠুমরীতে নেই। সামান্য ও সোজা গতানুগতিক কয়েকটি শব্দ এর অবলম্বন। এখানেই বাংলার রচনারীতির সঙ্গে বিরোধ। ঠুমরীতে ব্যবহৃত শব্দগুলো কাব্যিক ভাষা নয়, কতকগুলো বাঁধা বুলি।

গ্রামোফোন রেকর্ড দৃষ্টে বলা যায় যে অনেক এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করা সত্ত্বেও ঠুমরীর পুরো রূপটি কোন বাংলা গানকে অবলম্বন করে দাঁড়ায় নি, অথবা একথা বলা চলে বাংলায় পুরো ঠুমরী দাঁড়ায় নি। কিন্তু, যা দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে বাংলার ঠুমরী-প্রভাবিত স্বকীয় সংগীতের অনুরূপ অভিব্যক্তি। কথার প্রতি শ্রোতার দাবী, কাব্যের প্রতি পক্ষপাত এবং ভাব থেকে ইমেজ প্রত্যক্ষ করবার আশায় বাংলা গান ঠুমরী গানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের ঠুমরী-ভিত্তিক রচনার কথা বলেছি। নজরুলের রচনাও কাব্যগুণসমন্বিত। এ দুজন রচয়িতা, যাঁরা ঠুমরীতে মন দিয়েছিলেন, তাঁরা বাংলা রচনায় ঠুমরীর সম্পূর্ণ ভঙ্গিটাকে আদায় করিয়ে সেই ভঙ্গি গানের মধ্যে প্রচলন করে দিতে পারেন নি। হিমাংশুকুমারের দু একটি রচনায়ও ঠুমরীর আমেজ চমকপ্রদভাবে এসেছে। যে কয়েকজনার গানে ঠুমরীর রূপ গ্রামোফোন রেকর্ড অবলম্বনে কিছুটা জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁরা কৃষ্ণচন্দ্র দে,

শ্রীশচীন দেববর্মন, ইন্দুবালা, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। ব্যক্তিগত গায়কীতে ঠুমরীর আঙ্গিক পুষ্ট হয় বলেই এই রূপের সার্থকতা নির্ভর করে গীতকার বা সুরকারের ওপর নয়—গায়কের ওপর।

কিন্তু ঠুমরীর রং-এর পোঁচ দিয়ে বাংলাগানের রূপের যে বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে, নতুন ধারার রাগপ্রধান ও আধুনিক গানের মধ্যে ঠুমরীর নানান ছোঁয়া গানকে সমৃদ্ধ করেছে একথা বলা বাহুল্য। ঠুমরী গানের প্রেমবৈচিত্র্য সুরে প্রকাশের সুযোগ প্রচুর ছিল বলেই বাংলায় ঠুমরীর ক্ষুদ্র খণ্ড অংশের প্রভাব বিস্তৃত। অনেকক্ষেত্রেই এই প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ। অনেক সুরকলির মূল অনুসন্ধান করলে ঠুমরী গান পর্যন্ত যাওয়া যায়। ঠুমরী আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য কিছু কিছু রাগপ্রধান গানে প্রয়োগ করতেও চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরীর সঙ্গে বাংলা গানের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনায় একথা স্পষ্টই বোঝা গেছে যে বাংলাগানের উৎপত্তি প্রাকৃত বা দেশী-সংগীত থেকে হলেও, রাগসংগীত ধীরে ধীরে রসনিঃসরণ করে বাংলাগানকে উজ্জীবিত করে তুলছে। বাংলাগান প্রতি পদে পদেই স্বকীয় ভাব রক্ষা করে চলেছে। স্বকীয়ভাবটি বোঝা যায় না বলেই বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। যথা, "বাংলাতে ধ্রুপদ, খেয়াল, ধামার, টপ্পা, ঠুমরী গাওয়া হবে না কেন?" নিশ্চয়ই হবে। এতে বাধা দেবার কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু গেয়ে প্রমাণ করতে হবে "হ্যাঁ, এই হচ্ছে।" সে গান সহজভাবে সর্বজন-গ্রাহ্য হওয়া চাই। এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি প্রতি পদে পদে বাংলাগান মৌলিকতার দিকে ফিরেছে, তত্ত্ব ও তথাকথিত শাস্ত্রীয় রীতিতে সে বাঁধা নয়। ধ্রুপদকে অবিকল ধ্রুপদ, খেয়ালকে পূর্ণরীতির খেয়াল, ঠুমরীকে পরিপূর্ণ অনুসরণ বা টপ্পাকে পুরো অনুকরণ হয় নি। সব ক্ষেত্রেই বাংলাগানের মৌলিকতা সংরক্ষিত। অর্থাৎ খেয়াল বলতে যে পরিপূর্ণ গীতি-ভঙ্গি বা রাগসংগীত রীতি আমরা বুঝি তা বাংলা ভাষায় হয়নি। খেয়ালের বৃত্তপথ হচ্ছে বর্ণহীন, অর্থসঙ্কীর্ণ ভাষা। আসলে ভঙ্গিটিই জ্যোতিষ্ক—যাকে খেয়াল বলা যায়। বাংলা ভাষার বৃত্তপথে সেই জ্যোতিষ্কের মত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন রূপ আমরা যে আধারে পাচ্ছি সেটা বাংলার স্বকীয় রীতি। মৌলিক শিল্পের অনুবাদ বা অনুকরণ কখনো চলে না, বাংলার সৌভাগ্য—তার

স্বকীয়তাকে অবলম্বন করে যে বিশিষ্ট ধরণের রীতি গড়ে উঠছে, তার নাম যাই হোক, তাকে আমরা পরিপূর্ণরূপে পেতে চাই। এটা সুলক্ষণ। কথা ও রাগের এবং বিশেষ করে রীতির সমতা রক্ষা করে,' রাগপ্রধান গান ব্যাপক ভাবে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরীর বহুরূপে বিকশিত হতে পারবে এবং তাতে বাংলার স্বকীয়তা বজায় থাকবে বলে মনে হয়। এজন্য আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শক্তিমান গায়কী। বর্তমান গীতশ্রেণীতে রাগ প্রয়োগের একটা সজীব রূপ সব সময়েই পাওয়া যাচ্ছে। এই সজীবতা বজায় রেখে কতটা কথার ব্যবহার করতে হবে? কিভাবে হবে? ঠুমরীতে কতটা পরিমাণ বোল ব্যবহার হবে?—তা গায়কীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর নির্ভর করবে। এজন্য রাগ-সংগীতের শিক্ষা ও সংগীতরচনার ক্ষেত্র আরো বৈজ্ঞানিক চিন্তা-নির্ভর এবং সুশৃঙ্খল হওয়া দরকার।

রাগপ্রধান বাংলা গান

রাগ অবলম্বন করে গান রচনা কি আধুনিক যুগের পূর্বে হয় নি? রাগের প্রাধান্য কি তৎকালীন গানে ছিল না? সকলেই জানেন "রাগসংগীত" পূর্বযুগের বাংলা গানের ভিত্তিভূমি। কিন্তু, "রাগপ্রধান" নামকরণের প্রয়োজন হয়েছিল শুধু রাগভিত্তিক বাংলা গান লক্ষ্য করে নয়, গানের ভঙ্গি বা কায়দা লক্ষ্য করে। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তৎকালীন বেতারে প্রচারিত বহু রাগ অবলম্বিত গানের প্রচারের জন্য নানা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন। প্রায় সেই সময় থেকেই রাগপ্রধান কথাটি প্রচারিত। রাগপ্রধানের মূল কথা—গানের মধ্যে শুধু রাগের রূপ সৃষ্টি করা নয়, গায়ন পদ্ধতিতে রাগ সংগীতের স্টাইল-প্রতিফলন। এ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই খেয়াল ও ঠুমরীর রূপ আমদানীর প্রতি সংগীতকারদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ধ্রুপদ এবং টপ্পা এই দুটো গানের রীতি বাংলায় আগেই এসেছিল, কিন্তু খেয়াল ও ঠুমরীর ভঙ্গি অবলম্বন অপেক্ষাকৃত নতুন পদক্ষেপ।

সে কালের টপখেয়ালের গানের মধ্যে টপ্পা প্রকৃতির রূপই ছিল স্পষ্ট। গানের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট ধরণের তানের প্রাধান্যই বিশেষ ছিল—তাকে গিটকারী বলা হত। গিটকারী বলতে গলার একটা স্বাভাবিক

তানের বিকাশ বোঝায়। খেয়াল গান এটাকে স্বীকার করে না, খেয়ালে গলায় তান স্ফুরণের বহু রকমের ফর্মুলার অভ্যাস দরকার হয়। অতএব এ যুগে দেখা গেল খেয়াল ঠুমরীর সীমানা অনেকটাই বড়ো বা ছড়ানো, তাতে বহু রকমের ভঙ্গিতে সুর-বিহার বা বিস্তার ও নানান রকমের তরঙ্গায়িত, বিস্তীর্ণ, বেণীবদ্ধ ও কূট-সমন্বয়ের তান চলে, নিছক গিটকারী চলে না। শুধু তাই নয়, ঠুমরী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বোল তৈরি, ছন্দের কাজ এবং অংশ-তান প্রয়োগ করবার চেষ্টা দেখা যায়। বাংলাগানে এই সব প্রয়োগ করেও শ্রোতার দাবীতেই হোক বা যে কারণেই হোক, গানের ভাষা ও কথার ভাব-রূপ বজায় রাখার চেষ্টা প্রাধান্য লাভ করল। এরূপ ভাবনা সংগীতকারদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়। অর্থাৎ পথটা কেউ বেঁধে দেয় নি, দেওয়া যায় না। এটাই স্বাভাবিক রূপ। মোটামুটি, একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খেয়াল ও ঠুমরীর নানান কায়দা বাংলা উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গিতে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছিল।

তৎকালীন বেতারে প্রচারিত "হারামণি" অনুষ্ঠানের জন্যে নজরুল অসংখ্য বাংলা গান রচনা করেছিলেন। অপ্রচলিত অথবা অপেক্ষাকৃত অচলিত রাগ অবলম্বন করে অনুষ্ঠানে গান প্রচারিত হত, পরিকল্পনার মূলে ছিলেন সুরেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী, ইনি রাগ পরিচয় দিতেন। আর একটি অনুষ্ঠান "নবরাগমালিকা", এতে রাগের সংমিশ্রণ করে, বিস্তার অথবা তান সহকারে অন্যান্য ধরণের গান প্রচারিত হত। বলা হয়ে থাকে নজরুল কয়েকটি রাগও তৈরী করেছিলেন। খবরটা বাংলাগানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, যদিও 'রাগ তৈরী করা' ব্যাপারে কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। এখানে নজরুলের রাগ-তৈরী-করার বাংলা খবরটি গানের গোড়াপত্তনের একটা মূল্যবান প্রসঙ্গ।

"রাগ তৈরী করা" খুব বড় কথা নয়। যে কোন সুগায়ক বারোটি সুরের নানা রকমের ব্যবহারের কায়দা ভেবে নিয়ে রাগ তৈরী করতে পারেন। কিন্তু সে রাগ যদি গায়ক বা যন্ত্রীর গ্রাহ্য হয়, রাগের যে সব লক্ষণ বিকশিত হওয়া দরকার তা যদি তৈরী রাগে ফুটে ওঠে এবং তা যদি গৃহীত হয়, তবেই সে অভিনব রাগ বলে' স্বীকৃত হতে পারে। শুধু একটা রাগের কাঠামো তৈরী করে গান বা গৎ রচনা করলে রাগ সৃষ্টি হয় না। রাগের অসংখ্য লক্ষণ তাতে ফুটে ওঠা দরকার এবং তা' শিল্পীর গ্রাহ্য ও সংগীত বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। যে কোন রাগের রূপ একটা বাঁধা ফ্রেম নয়, তাকে

ক্রমপরিণতি-মূলক সুরের রূপ বলা যায়। এজন্যে, মার্গ সংগীতের দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুলের রাগসংগীত-প্রীতি এবং এরূপ ভাবনার খবর ছাড়া রাগ বানানোর সংবাদটার ওপর কোন মূল্যই আরোপ করা যায় না। যাঁরাই একটা রাগ তৈরী করেছেন বলে দাবী করেন, তাঁদের দাবীও গ্রাহ্য হতে পারে না, যদি রাগের আলাপ, বিস্তার, জোর, পকড়, প্রধান-অঙ্গ, বাদী-সম্বাদী, বক্রস্বর ইত্যাদি ইত্যাদি সকল লক্ষণ প্রকাশ করবার মতো সুযোগ তাঁদের না থাকে। নজরুলের সে পন্থাও ছিল না—সময় ও সুযোগ তাঁর ছিল না। তাছাড়া কবি-গীতিকারের প্রয়োজন কি রাগের এসব বৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামাবার? কবির কাছে রূপটা বড়ো, রক্ত-মাংস-হাড় নিয়ে তাঁর কারবার নয়। এজন্যে ভাসাভাসা রূপ দাঁড় করিয়ে তার নাম যদি দিয়ে থাকেন "ধনকুন্তলা" বা "সন্ধ্যামালতী"—তা দিন। সে কাব্যিক ইচ্ছের খেয়াল। সেখানে কবিমন ক্রিয়াশীল। তবে নজরুলের রাগতৈরীর খবরটা রাগপ্রধান গান রচনার দিক থেকে নিম্নলিখিত কারণে একটি প্রধান পদক্ষেপ বলা যায়।

সাধারণত খেয়াল বা ধ্রুপদ গায়কেরা প্রচলিত ও অচলিত রাগের গান করতে রীতি ও ট্রাডিশনকে অতিক্রম করেন না বা করতেন না। নজরুলের এই বিশেষ রাগবানানোর ব্যাপারটি গতানুগতিকতা থেকে মুক্তির সন্ধান দেয়। সাধারণত কয়েকটি রাগে মনোনিবেশ করে গায়কদের বছর কেটে যায়। নতুন রাগ সৃষ্টি অথবা সংমিশ্রণের ভাবনাকে তাঁরা সহসা গ্রাহ্য করেন না। নজরুলের উদ্দীপনা নতুন সৃষ্টির একটা লক্ষণ সূচিত করে। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোনো অভিজ্ঞ সংগীতকার কোন রাগ-রচনা করেন, তাঁকে বহু সময় ব্যয় করে সে রূপের প্রতিষ্ঠা করা দরকার হয়। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান "হেমন্ত" রাগ তৈরী করেছেন (তিনি হয়ত আরো রাগ সৃষ্টি করেছেন বা করতে পারতেন), কিন্তু ভেবে দেখা যেতে পারে "হেমন্ত" রাগ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের পেছনে কতটা সযত্ন সাধন করতে হয়েছে। "চন্দ্রনন্দন"বলে একটা রাগ ওস্তাদ আলী আকবর খান প্রচার করেছেন, এখনো তা পুরো স্বীকৃত হয়েছে কি? বলছি, অভিজ্ঞ সংগীতজ্ঞের কাছে নজরুলের রাগ-বানানোর খবরটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু রাগপ্রধান বাংলা গান তৈরীর এটা একটা মৌলিক প্রয়াস। নজরুলের মন স্বাভাবিক ভাবেই বুঝতে পেরেছে ধরা-বাঁধা রাগের সীমানায় (রাগ সংগীত পদ্ধতির রীতিতে গান করা হলেও) বাংলা গানের রূপকে বন্দী করা যাবে না। নজরুলের এই পদক্ষেপ নতুন সৃষ্টির একটা আশ্বাস বা পদক্ষেপ। অর্থাৎ

রাগসংগীত গাইবার পদ্ধতির বিশুদ্ধিতা রাগপ্রধান গানে রক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু রাগ-বিশুদ্ধিতা রক্ষা করতেই হবে এমন আইন চলবে না। রাগ-বিশুদ্ধিতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয়, ইচ্ছাকৃত রঞ্জক বুদ্ধিতে রাগের রূপকে পরিবর্তনও করা যাবে। নজরুলের, তথা সমসাময়িক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর চিন্তাধারায় এই স্বরূপটিই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। খেয়াল গায়ক হয়ত সহসা একাজ করতে পারবেন না, ঠুমরী গায়কও তাঁর স্টাইল অনুসরণ করে যতটুকু করা দরকার করে যাবেন। নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন রাগরূপে বৈচিত্র্য সৃষ্টি রাগপ্রধান সংগীতের দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী।

নজরুলের কয়েকটি গান গেয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী—আপনার মুক্তভঙ্গিতে। এখানে গায়কের ভঙ্গির মুক্তি স্বীকৃত। নজরুল খেয়াল রীতির কিছু কিছু গানেব পত্তনে "চীজ্" তৈরীর কাজ করেছেন, কিন্তু এরপর বাঁধাবাঁধি রাখেন নি। কিন্তু অন্যান্য রাগ-প্রধান গানে স্বতন্ত্র রীতি। গীতকার যেমন করে গানের প্রতিস্তরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার দ্বারা সুর সংগ্রহ করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেন, ইনি তেমন করে "চীজ" তৈরী করেছেন। নজরুল অনেক রাগপ্রধান গানেই বাঁধাবাঁধি বড়ো বেশি করেন নি। এই বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে রাগপ্রবান গানের বিশ্লেষণে আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে পারি। রাগপ্রধান গানে গায়কীর কতকটা মুক্তি আছে এবং গানে গায়কের ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত করবার সুবিধেও আছে।

রাগপ্রধান গানে গায়কের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হবার সুবিধে থাকা সত্ত্বেও কতকটা সীমানা টানা হয়ে যায় আপনা থেকে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গানে বৈপরীত্য বা contrast খুব বেশি, শব্দ ও কাব্যাংশকে একসংগে পৌরুষপূর্ণ কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারিত করে অন্য অংশে বিস্তার ও তানের দিকে এগিয়ে যান। কথার গুরুত্ব পরিসরকে সীমিত করে দেয়। এখানেও কিছুটা নির্বাচন ক্রিয়া রয়েছে। এদিক থেকে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীর গান খেয়ালের হিন্দুস্থানী রীতি ঘেঁষা, কোথাও কোথাও খেয়ালী রূপের তান প্রবল হবার সম্ভাবনা জানায়, কিন্তু কথার জন্য সেখানেও সাবধানী নির্বাচিত সুরবিস্তারের লক্ষণ স্পষ্ট। শ্রীমতী দীপালি নাগ-(তালুকদার)-এর গানে দেখা যায় প্রতি কথার সঙ্গে কথা বোনায় রঙ্গিলা ঘরানার কায়দা প্রতিফলনের স্পষ্ট প্রয়াস। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গানে অভিনব সুর-চায়না, যাকে বাংলা কথায়

"কণ্ঠবাদনের" প্রত্যক্ষ প্রয়াস বলা যায়। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও শ্রীশচীন দেববর্মন—অনেকটা আধুনিকের কাছে এসে পড়েন। অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র দে থেকে আজ পর্যন্ত রাগপ্রধানের রূপ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—এই গান রাগ-সংগীতের পূর্ণ পর্যায় থেকে আরম্ভ করে আধুনিকের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত।

রাগপ্রধান গানের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করলে দেখা যায় এতে দুটো লক্ষণই স্পষ্ট:—একটিতে, রাগসংগীতের অলংকার প্রয়োগ, অন্যটিতে কথার ভাব-সংগতির জন্যে নির্বাচন-প্রক্রিয়াটিও আছে—অর্থাৎ, সীমানা টানা আছে। প্রথম পর্যায়ে রাগ-সংগীতের অলংকারের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য নতুন নতুন রকমের দেখা যায়। গায়কেরা আজকাল সারগম করছেন—খেয়ালী ছন্দে ও অনেকটা কণ্ঠবাদনের ভঙ্গিতে। কথা ও কাব্যিক ভাব-সমগ্রতা সেখানে রক্ষিত হচ্ছে কিনা বলা মুস্কিল, নির্ভর করছে গানের কথার সঙ্গে এই বিশেষত্বকে উপযুক্ত করে রাগকে অলঙ্কারে ভাবসমগ্র করা যায় কিনা—তার ওপর। এক্ষেত্রে শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর গানের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। নির্বাচিত তানের অংশ নিয়েও কিছু রচনা চালু হচ্ছে। গীতকার একাজ করেছেন আধুনিকের মতো করে, রাগপ্রধানে কিছু সুরকলি বা সারগমের অংশ সংযোগের চেষ্টা করেছেন। বিশিষ্ট ঠুমরীর অংশ নিয়ে আধুনিক রচনা কতকটা রাগপ্রধানে রূপান্তরিত হচ্ছে। এগুলো রাগপ্রধান গানের নতুন ভাবধারা। নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় সুরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগও থেকে যাচ্ছে। এইরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল প্রথমে হিমাংশু দত্তের রচনায়—রাগপ্রধানের সামান্য কয়েকটি রচনায় ইনি উজ্জ্বলতম সুরকার। এই দিকে থেকে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও বিশেষ অলঙ্কার নির্বাচন-পন্থী সুরকার রূপে মূল্যবান কাজ করেছেন। শ্রীঅনিল বাগচীর মানসিকতাও এই ভঙ্গির রূপদানের লক্ষণ প্রকাশ করে।

বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা গেল রাগপ্রধান বাংলা গানের রীতির বিস্তৃততম পরিসরের মধ্যে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরীর সব শ্রেণীর কায়দা গানে অবলম্বিত হতে পারে, এমন কি সংমিশ্রণের জন্যে রাগপ্রধান গান আধুনিকের সীমা পর্যন্ত পৌছুতে পারে। রাগপ্রধান কথাটির মর্মার্থ এই যে খেয়াল অথবা ঠুমরী রীতির যে পদ্ধতিই অনুসৃত হোক, ভাষার ভাবরূপ এবং ইডিয়মকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, ভাষা রীতি-অনুসারে উচ্চারিত হবে, অর্থাৎ রাগরূপকে যে-ভাবেই হোক মনোরঞ্জকও করা যেতে পারে, রাগে মিশ্রণ চলতে পারে কিন্তু গায়কী রীতি পুরোপুরিই রাগ-সংগীতের দিকে ঝুঁকে যায়, যদিও মৌলিক

ভাষার বাক-ভঙ্গি তাতে অক্ষুণ্ন থাকে। রাগসংগীতে গানের বিকাশ যে ভাবে হয়, কথা যে ভাবে ব্যবহৃত হয় রাগপ্রধান গানে সেরূপ হয় না। কিন্তু, তালের প্রয়োগে রাগপ্রধানে রাগ-সংগীতের সঙ্গে কোন তারতম্য নেই, যা আধুনিক গানে আছে। রাগপ্রধান রাগসংগীত অথবা হিন্দুস্থানী গানের অনুকৃতিও নয় আবার সে আধুনিকও নয়—বাগাশ্রয়ী আঞ্চলিক গান।

আগেই লক্ষ্য করেছি, এর বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয় গানে রাগসংগীতের ছন্দ প্রকৃতি প্রয়োগ দ্বারা। ভাষায় প্রকাশিত ভাবরূপটির অখণ্ডতা রক্ষা করে চলবার জন্যে আজ পর্যন্ত কোন বাংলা গানে বিলম্বিত লয়ের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করা হল না। অর্থাৎ সাদা কথায়, বিলম্বিত যেন আমাদের ভাব নয়, ভাবপ্রকাশের পন্থাও নয়। সংগীতকার যদি সার্থকরূপে বিলম্বিত লয়ের রাগপ্রধান গান চালু করতে চেষ্টা করেন, তা হলে প্রশ্ন থেকে যাবে, তাতে রাগের রূপের সঙ্গে ভাষা কতকটা ফোটানো যাবে কি? খেয়ালে ভাষার প্রশ্নটা গৌণ। যে বাক্-বৈদগ্ধ্য বাক্-চাতুরী এবং বাক্য ও কথা আমরা পছন্দ করি—বিলম্বিত লয়ে তার সুবিধে কতটুকু? কথার সংগতি তাতে পাওয়া যাবে তো? এ সব প্রতিবন্ধকগুলো অতিক্রম করে কেউ যদি সত্যি বিলম্বিত লয়ের গান চালু করতে পারেন, যে গানে বাংলাত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে এবং গানও স্বীকৃত হবে (অর্থাৎ অভ্যাস করার পথে কোন বাধা থাকবে না) তাহলে বাংলা রাগপ্রধান গান খেয়ালের দাবী অনেকটা মেটাতেও পারবে। ধীরগতি বিলম্বিত গানের প্রচলন কীর্তনে ছিল, কিন্তু উপযুক্ত গায়ন শক্তির অভাবে কীর্তনের এই অঙ্গ জনপ্রিয় নয়। কীর্তনের বিলম্বিত লয়ের গানের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই বলেন। কিন্তু আইন-কানুন প্রণয়ন করে গান চালানো যায় না। সহজ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে বলা যায় বিলম্বিত চালের গান বাংলায় প্রচলনে বাধা নেই। কিন্তু শিল্পের প্রত্যক্ষ ও স্বীকৃত-রূপ না পাওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। বিলম্বিত গান গায়কের গ্রাহ্য হওয়া চাই। মোটামুটি, বাংলায় বিলম্বিত লয়ের গান ছিল না, এখনো নেই, নতুন সৃষ্টির আশা পোষণ করা ভাল। রাগপ্রধানে মধ্যলয়ের গানই প্রচলিত ও জনপ্রিয়। কিন্তু এখনো বিলম্বিত লয়ের গান সুপ্রচলিত হবার পথে বাধা থেকে গেছে অনেক।

সংক্ষেপে, 'রাগপ্রধান' রূপটি এখন বিশেষ বাংলা গানেরই রূপ নয়, এ রূপটি যে কোন প্রদেশের যে কোন ভাষায় রাগ-সংগীতের ভাষার অভিব্যক্তিরই মতো। রাগ-সংগীতে ভাষার অভিব্যক্তি যেমন ভাবে করা যায়,

গানে দেশীভাষা তার চেয়ে বেশি ভাবগত মর্যাদা লাভ করে এবং রাগ-সংগীতের গীত-ভঙ্গি প্রয়োজন অনুসারে সুনিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে এই কয়েকটি লক্ষণ বিশ্লেষণ করেছেন: (১) রাগ-প্রধান গান হিন্দুস্থানী খেয়াল গানও নয় আবেগবর্জিতও নয় (২) সুরবিশুদ্ধি আর সুর-সৌন্দর্যের গঙ্গা-যমুনা সংগম। কিন্তু 'এহ বাহ্য' বর্ণনা। আবেগটা বড় নয় এবং সুর-বিশুদ্ধিতাও প্রকারান্তরে বিচার্য নয়। তাই অন্য বিশ্লেষণ দরকার। রাগপ্রধান গানের সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপে দেওয়া যেতে পারে:

(১) রাগপ্রধান-গানের প্রধান লক্ষণ রাগ-সংগীতের প্রকাশ-ভঙ্গির (খেয়াল, ঠুমরী ইত্যাদি স্টাইল) জন্যে যে ভাষা ব্যবহার হোক সে ভাষার বাক্‌ভঙ্গি ও ভাব-সমগ্রতা গানে বজায় থাকবে, এই অর্থে রাগপ্রধান আধুনিক কালের রচনা (অসমীয়া ভাষায়ও রাগপ্রধান চালু আছে)।

(২) রাগপ্রধান গানে রাগবিশুদ্ধি থাক বা রাগসংমিশ্রিত হোক বাধা নেই, কিন্তু নির্বাচন ক্রিয়া থাকা দরকার—(কি কি অলঙ্কার, তানের কতটা দৈর্ঘ্য অথবা অন্যান্য রীতি কতটা প্রয়োগ হবে?)—এ সম্বন্ধে সচেতনতা।

(৩) গায়কীভঙ্গি আধুনিক রীতির কণ্ঠ-উপস্থাপনা থেকে স্বতন্ত্র—খেয়াল ঠুমরীর গলা বলতে যদি কিছু থাকে, তাই প্রয়োগ হবে—চরম উদাহরণ, জ্ঞান গোস্বামী এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান।

(৪) বাঁধা সুরের কলি ব্যবহার করে গান রচিত হলেও এ গানের নৈপুণ্যে স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পীর ব্যক্তিত্ব দাবী করে—উদাহরণ স্বরূপ হিমাংশু দত্তের "ছিল চাঁদ মেঘের পারে" এই ফ্রেমে বাঁধা রচনাটি গাইবার জন্যেও শিল্পীর রাগ-সংগীতের নৈপুণ্য দরকার—এ গানটি যদিও আধুনিক গানের সীমানায় এসে যায়।

(৫) গায়কীর মুক্তির সঙ্গে তার শিল্পবোধই গানকে সীমিত পরিসরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয় এজন্যে রাগপ্রধান পুরো রাগসংগীতও হয় না আবার আধুনিকও নয়।

(৬) সাধারণত মধ্যলয়ের ব্যবহৃত তালগুলো রাগ-সংগীতের অনুরূপ ব্যবহৃত হয়—তাল এখানে আধুনিক গানের ছন্দমাত্র নয়—রাগ-সংগীতে তালপ্রকরণ যেমন নিয়মমাফিক—রাগ-প্রধানে তেমনি ব্যবহার চলে।

সবশেষে এই কথাটি মনে রাখতে হবে রাগপ্রধান কোন মুহূর্তের সৃষ্টি নয়। স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়েছে। কেউ এর রূপ বেঁধে দেয় নি। এ

ধরণের গান চালু ছিল না—এমনও নয়। শুধু আধুনিক গানের সংগে এর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে তিরিশ দশকের পরে নামকরণ করা হয়েছে।

তাল প্রসঙ্গ

শাস্ত্রীয় সংগীতে তাল অতি পুরনো অধ্যায়। তালের কত বিচিত্র নাম, বিচিত্র হিসেব-নিকেশ আছে তার ইয়ত্তা নেই। তালেব অসংখ্য রকমের প্রকৃতি হওয়াও খুব স্বাভাবিক। কারণ, ভিত্তিতেই রয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব। শ্রীদিলীপ-কুমার রায় 'সাঙ্গীতিকী' গ্রন্থের ভূমিকাতেই (শিবের মুখ থেকে নির্গত তাল—চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক সম্পর্কেষ্টাক ও উদ্‌ঘট্ট ইত্যাদি উল্লেখ করে), মার্গতালের বাগাড়ম্বর থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ দেশী সংগীতের আলোচনায় এসবের প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত সংগীত-গ্রন্থ ছেড়ে মুঘলযুগের সংগীত চিন্তায় আসা যেতে পারে। তাল সম্বন্ধীয় বর্ণনাতে প্রায় ৯৩টি তালের একটি তালিকা দিয়েছেন মীর্জা খাঁ "তহ্‌ফাতুল হিন্দ্‌" গ্রন্থে (শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র কৃত অনুবাদ)। এর মধ্যে বিভিন্ন নামে শুধু পাঁচ মাত্রারই প্রায় তেরোটি তালের উল্লেখ আছে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় রাগ-সংগীতে এমন কোন হিসেব বা মাত্রা নেই যাতে কোন না কোন তাল রচিত হয় নি। কোথাও এমনকি অর্ধমাত্রায় তাল শেষ হয়েছে, দেখা যায়। কীর্তনেও তালের চর্চা হয়েছিল বিস্তৃত ভাবে। বরং কীর্তনেই বাংলা পদের ছন্দ-রূপ নিয়ে তালের সৃষ্টি হয়েছিল। কীর্তনে তালের অলঙ্কারের অনুশীলনও অত্যন্ত প্রাচীন ঘটনা। প্রায় শতাধিক তাল কীর্তনে ব্যবহৃত হত, একথা পুর্বেই উল্লেখ করেছি। বলা বাহুল্য, খোল বর্তমান গানে মুক্তভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও বলব, আধুনিক গানে তাল সম্বন্ধে পুরনো চিন্তা ও পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। যাঁরা শুধু রাগ-সংগীতের মার্গ তালকেই শিল্পসাধনার ব্রত বলে মনে করেন, তাঁদের পথ আধুনিক গানের পথ নয়। রবীন্দ্রনাথ আলোচনাটি সুরু করেছিলেন উল্টো দিক থেকে, অর্থাৎ যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতকে তালের দুর্বলতা নিয়ে অবজ্ঞা করেছিলেন তাঁদের প্রতি-আক্রমণ করে। প্রথম জীবনে চিরাচরিত লয়ের ভঙ্গিতে তিনি গান রচনা করেন। বহু গানের স্বরলিপিতে তালের নামও উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রায় ১৩০৩ সাল পর্যন্ত এভাবে চলবার পর গানে নতুন ছন্দ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন (শ্রীশান্তিদেব ঘোষ)। রবীন্দ্রনাথ চমকপ্রদ বিশ্লেষণ করে চিন্তার পথটি খুলে দিয়েছেন। আদতে তিনি

পরবর্তী গানের রচনায় তালের দিকে যান নি, তিনি লক্ষ্য রেখেছেন ছন্দ ও লয়। মুস্কিল হচ্ছে, তাল সম্বন্ধে বলতে গেলে তালের প্রসঙ্গে রাগ-সংগীতের কথা আসে, সে জন্যে, যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সৃষ্টিটাকে তালজগতের বড় দান বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র, রাগ-সংগীতের তাল-জগতের সংগে কোন নিকট সম্পর্ক রাখেন নি তিনি। তিনি আধুনিক গানের ছন্দের প্রকৃত প্রবক্তা।

রাগ-সংগীতে যা 'তাল' আধুনিক গানে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালযন্ত্রে ধ্বনির বিচিত্র সমাবেশ—আঘাত ও প্রতিঘাত বা ছন্দ সমাবেশ মাত্র। আধুনিক অর্থে এখানে অধিকাংশ লঘু-সংগীতের কথাই বলছি। এই ছন্দ সমগ্রভাবে গানকে সমৃদ্ধ ও পূর্ণ করে তোলে। এই ছন্দ গানের অলঙ্কার মাত্র—অন্যান্য সহযোগী যন্ত্রের মতো।

তালযন্ত্র ছাড়া সুরেলা আঘাত সৃষ্টির বহু বিচিত্র পন্থা (বর্তমানে যেমন চলে) আমাদের সংগীতে তা জানা ছিল না। আজকাল বহু রকমের ছন্দ-ধ্বনি সংযোজিত হচ্ছে—পল্লীগীতি থেকে অথবা নানান বিদেশীয় গানের রীতি থেকে নানা বাদনভঙ্গি গ্রহণ করা হচ্ছে। এই অর্থে 'তাল' শব্দটি আমরা সকল রকমের সংগীতে ব্যবহৃত ছন্দের নাম হিসাবেই ব্যবহার করি। কিন্তু রাগ-সংগীতে তালের যে প্রকৃতি, লঘু-সংগীতে ছন্দের প্রকৃতি সেরূপ ভাবে উপস্থাপিত করা যায় না, একথা উল্লেখ করেছি। রাগ-সংগীতের তাল আরম্ভ হবার সঙ্গে বিকশিত হয় ছন্দের নানা আঘাত-প্রতিঘাতে, পরে ধীরেধীরে নানা অলঙ্কারে তার পরিণতি হয়, এবং বিশিষ্ট প্রারম্ভিক মাত্রায় সামঞ্জস্য ও ছন্দ সমন্বয়ে (যাকে সম বলা হয়) তাতেই পরিসমাপ্তি। লঘু-সংগীতের তাল প্রয়োগে আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি একই রকম, বিকাশ ও পরিসমাপ্তির বালাই নেই। তালের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন গানের লক্ষ্য-বস্তু নয়। সমের অস্তিত্বই হয়ত স্বীকার করা যায় না। যদি কোথাও কোন বিশেষত্ব প্রয়োগ করা হয়—তাও সাবধান-প্রয়োগ এবং 'অধিকন্তু ন দোষায়' রকমের ব্যাপার।

অর্থাৎ, বর্তমান সংগীতে তালের দুটো শ্রেণী :—একটিতে শুধু নিয়মিত ছন্দের বিভাগ—তাতে যে কোন ভাবে সুরেলা ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে নিয়মিত ছন্দ চলেছে। কি ধরণের সুরের আঘাত তাতে দরকার, সেটা গানের রচনার প্রকৃতি দেখে স্থির করা হবে। পিয়ানোর

পর্দায় সুরের আঘাতে, গীটারের তারে, খমকের ঠোকায়। তারযন্ত্রের তারে আঘাতে এবং নানান ধাতব যন্ত্রের আঘাতে নানা রকমের আওয়াজ সৃষ্টি করে ছন্দ রচনা হয়ে থাকে। শুধু ছন্দ বুঝিয়ে দেওয়াই নয়, তাকে উপযুক্ত ভাবে বাদনের জন্যে রচনা করাও দরকার হয়। এ ছাড়া রাগ-সংগীতে ব্যবহৃত তাল বাদ্যের ব্যবহার লঘু-সংগীতে তো আছেই। সেই সঙ্গে ঢোলক, খোল, ঢোল খুঞ্জুরী, খমক জাতীয় নানা যন্ত্রও চালু আছে। কিন্তু মূল কথা—বাজাবার পদ্ধতিটি শুধু উপযুক্ত ধ্বনিসৃষ্টিতে নির্ভরশীল। তালের বিস্তারে প্রয়োজন সামান্য, বাজাবার কৃতিত্বও সীমাবদ্ধ ও একঘেয়ে।

অন্য শ্রেণীতে—রাগ-সংগীতের তাল। সেখানে নির্দিষ্ট তাল-যন্ত্রের চর্চা ও ব্যবহার চলে এবং চর্চাটিও পদ্ধতি-মাফিক, শ্রমসাধ্য। তালযন্ত্রে শুধু ছন্দই বাজে না, ছন্দের বিকশিত-রূপ নিয়েই এক একটি পূর্ণ তাল। নিয়ম হচ্ছে—যে মাত্রায় আরম্ভ সেখান থেকে গতি সুরু করে এক-একটি বক্তব্য শেষবারে দাঁড়িতে ফিরে আসা—অর্থাৎ সমে। সমে ভাব ও গতির সমন্বয়। তাল বলতে এই শ্রেণীতে পাখোয়াজ, তবলাতে (এবং খোলের, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে মৃদঙ্গম, ঘটম প্রভৃতির) ব্যবহৃত বহু রকমের ছন্দ-বাদনের ক্রমপরিণতি-মূলক পদ্ধতি বুঝায়। তাল-বাদনের ক্রমপরিণতি কথাটির বিশেষ অর্থ আছে।

রাগ-সংগীতে তালের অঙ্গটিরও প্রাধান্য আছে। কারণ, গানের কোথাও না কোথাও তালবাদক সামান্য হোক, বেশি হোক বিশেষ স্থান করে নেবেন, তাঁর শিল্পরূপ প্রস্ফুট হবে। রাগ-সংগীতের ছন্দ-প্রকরণে সত্যিই বুঝি 'লাঠিয়ালি' বা 'পালোয়ানি' অথবা 'ঘোড়দৌড়ে কে জেতে' তারই পরিবেষণ। ধামার গানে বাঁট-অংশের সংগত এবং আড়ি-কু-আড়ির পর 'ধা' নিয়ে লুকোচুরি দেখে তাই মনে হতে পারে। পুরোনো দিনে এগুলো মারামারির সামিল ছিল হয়ত। আজকের যুগে আর তা নয়। তারাণা গাইবার সময়ে ছন্দকে সাজিয়ে নেবার প্রধান লক্ষ্য—তবলার সাথ-সংগৎ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিলম্বিত খেয়াল গাইবার সময়ে ধীর-গতিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তেহাইরূপে বিস্তারকে ছন্দোবদ্ধ করে নেওয়া হয়। এখানেও সুরের কায়দার সঙ্গে লয়ের নিগূঢ় সংমিশ্রণ। সেতার-সরোদে তান, তোড়া, ইত্যাদি সাজিয়ে প্যাঁচ কষতেই, তবলিয়াকে জবাব দিতে হয়। না হলে সাথ-সঙ্গৎ হল না। এই রীতির জন্যে যাঁরা সাধনা করেন এবং যাঁদের মনে সংগীতের এই অভিব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ আছে—তাঁদের মানসিকতা আলাদা রকমের। তাঁরা এর মধ্যে সূক্ষ্মতা ও

কারিগরি এবং সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বাদকের বক্তব্য বুঝে নিতে পারেন। এ রসে রসিকের সংখ্যা আজ ক্রমবর্ধমান। মুস্কিল হয় তুলনামূলক আলোচনাতে। বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে আমরা বলছি 'ওদের সুরটা দুর্বল' আর অন্যদিকের বক্তব্য 'ওদিকে সংগীত নেই, পালোয়ানী আছে'। কিন্তু এই চরম-মনোভাব অবলম্বন করে আর্ট এবং সংগীত-তত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনার প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথ একপক্ষের প্রবক্তা হয়ে আধুনিক রীতির মৌল রূপটিকেই মনে প্রাণে বুঝে নিয়েছিলেন এবং লয়ের মুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন "সংগীতের মুক্তি" প্রবন্ধে :

"(১) ...তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের কড়াকড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে।......

(২) ...য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব-নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে চায় না কেননা সমস্ত সংগীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজে সীমানা বাঁধিয়া দেন...

(৩) ...কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম...

(৪) ...কবিতায় যেটা ছন্দ সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে। আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তেই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্ব-সংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কী, গানেই কী এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।"

উদাহরণ : মাত্রা

বাজিবে। সখি। বাঁশি। বাজিছে (১ ২ ৩ । ৪ ৫ । ৬ ৭ । ৮ ৯ ১০)

কাঁপিছে। দেহ। লতা। থর। থর (১ ২ ৩ । ৪ ৫ । ৬ ৭ । ৮ ৯ । ১০ ১১)

যে কাঁদনে। হিয়া। কাঁদিছে (১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯)

আঁধার। রজনী। পোহাল (১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯)

তুয়া। মম। পথ। পাশে (১ ২ ৩ । ৪ ৫ । ৬ ৭ । ৮ ৯)

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে (১ ২ ৩ । ৪ ৫ । ৬ ৭ । ৮ ৯ ১০ । ১১ ১২)

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসারে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায় যাতে "লয়ের হিসেব দিলেও তালের হিসেবে মেলে না।" এ সব ছন্দে গান বাঁধা যায় অথচ ছন্দ-ভাগ তো প্রচলিত নেই। রবীন্দ্রনাথ এরূপ নানা ছন্দকে চমকপ্রদরূপে গান বেঁধে দিয়েছেন। তিনি এরূপ বিভিন্ন দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় মাত্রার নানারূপ সন্নিবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রচলিত গানের ছন্দ :—

রূপকড়া (১ ২ ৩। ৪ ৫। ৬ ৭ ৮), নবতাল (১ ২ ৩। ৪ ৫। ৬ ৭। ৮ ৯), একাদশী (১ ২ ৩। ১ ২ ৩ ৪। ১ ২ ৩ ৪), ঝম্পক (১ ২ ৩। ৪ ৫), নব পঞ্চতাল (২+৪+৪+৪), তা ছাড়াও ছয় মাত্রার নানান ব্যবহার (১ ২। ৩ ৪ ৫ ৬, ১ ২ ৩ ৪। ৫ ৬)। এ ছাড়াও সম্পূর্ণ পাঁচ মাত্রা কিংবা ছয় মাত্রার শব্দে মাত্রা ভাগ না করেও কতকগুলো গানে প্রয়োগ করেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তালের ব্যাখ্যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি বলব, সংগীতের এই মুক্তির যে প্রকৃতিটি আধুনিক কিংবা দেশী গানের মূলে ছিল—তাকে ব্যাখ্যা করে, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির থেকে পার্থক্যটি স্পষ্ট করে দেখিয়ে তিনি তৎকালীন প্রয়োজন অনুসারে লিখেছেন :

> ...আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা, যে নিয়ম সত্য সে নিয়মের বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে, সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের এই সংগীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।......

নিয়ম অর্থে এখানে রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত কবিতার ছন্দের নিয়ম, ছন্দ গানে প্রয়োগের নিয়ম। ওস্তাদের মাত্রার বন্ধনী, সম-ফাঁকের ঘোরপ্যাঁচ ও অলঙ্কারের বাহিরের ওস্তাদিটাও নিয়ম। চিরাচরিত রীতি অনুসারে মুক্ত-ছন্দ-রচনা হয়ত কিছু কিছু পরিমাণে লোক-সংগীতে অথবা কবিতায় চলেছিল, কিন্তু ভেতরের তত্ত্বটির ব্যাখ্যা কখনো হয় নি। কারণ, তাল বলতেই আমরা শাস্ত্রীয় রীতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ ছন্দের ব্যবহার রাগ-সংগীতের বর্ণিত তালের ব্যবহার নয়। (শ্রীশান্তিদেব ঘোষের আলোচনা দ্রষ্টব্য।) রবীন্দ্রনাথের আলোচনা লঘু সংগীতের দিগ্‌দর্শনের সহায়ক।

এবারে, এখানকার মূল বক্তব্য : রবীন্দ্রনাথের কাছে যেটা বাধা স্বরূপ মনে হয়েছে নিয়মিত অভ্যাসে এবং সংগীতের সামগ্রিক বিকাশে রাগ-সংগীত-শিল্পীর কাছে সেটা বাধা নয়। হতে পারে সেকালে ধ্রুপদী ও পাখোয়াজীর প্রচুর মারামারি ছিল গানের আসরে। রাগসংগীতের নিয়মিত অভ্যাস স্বাধীনতা দিতে পারে—সে বন্ধনের মধ্যে স্বাধীনতা। সংগীতের formটির ওপর দখল না হলে সে স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব নয়। এ দখলের চূড়ান্ত উদাহরণ ওস্তাদ আলি আকবর খান ও পণ্ডিত রবিশঙ্করের পাশ্চাত্য দেশে সংগীত প্রচার। খেয়াল গানে ঠেকার ব্যবহার চলে, কিন্তু ঠেকার মধ্যেও নানা 'ভরণ' প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ নান স্থানে মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছন্দাংশের অভিব্যক্তির সুবিধে তবলিয়ার থাকে। তাতে খেয়াল গান সুরবিহারে বাধা পায় না। ঠুমরী গানেরও একটি বিশিষ্ট অংশে হাল্কা ছন্দাংশের (অলঙ্কাবের) পরিবেষণ রীতিতে গান আকর্ষণীয় হয়। অর্থাৎ রাগ-সংগীতে তালবাদকেবও একটা প্রধান স্থান আছে এবং স্বাধীনতা আছে, সীমার মধ্যে এবং নিয়মের মধ্যে শিল্পী ও তালবাদকের মুক্ত আচরণের পথ আছে।

কিন্তু এই মুক্ত আচরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত তাল তত্ত্বটির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বিভ্রম সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ গান সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, বর্তমান লঘু সংগীতের রীতিতে সেই রূপই প্রত্যক্ষ কবছি। রবীন্দ্রনাথ মুক্ত ভাবে ছন্দ তৈবী করে গিয়েছেন। ব্যাখ্যা করেছেন প্রকৃতি, আমরা এখানে বর্তমান লঘু-সংগীতে তাল-প্রকরণের রূপ কি দাঁড়ায় তাই বলছি।

রবীন্দ্রনাথ সম বর্জন করবার পক্ষে বলেছেন। আধুনিক তাল অনেক স্থলেই সম-বিবর্জিত। কবিতার ছন্দেব মত আধুনিক গানে সমের মাশুল চুকিয়ে দেবার জায়গা নেই। বহু রবীন্দ্র-সংগীত অথবা আধুনিক গানে তাল-যন্ত্র ছাড়া অন্তরূপেও ছন্দের ব্যবহার চলে। সেখানে সম-ফাঁকের তাগিদ নেই, আছে শুধু লয় বা ছন্দের নিয়মিত গতি। রাগ-সংগীতের শ্রোতা যেমন করে "ধা"এর জন্যে অপেক্ষা করেন, লঘু-সংগীতে সে কথা ভাববার সুবিধে নেই। তা হলে, লঘু-সংগীতের তাল-প্রকরণ কোন শ্রেণীর ?

রাগ-সংগীতের তালে সম ছাড়া তালের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু লঘু-সংগীতে হয়ত তবলা বা পাখোয়াজ বাজাতে পারা যায়। কোথাও বোল-বাণী, কায়দা, গৎ, তোড়া, তেহাইও প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে নিয়মের বন্ধন নেই।

ঠেকার হেরফেরও চলতে পারে। এক কার্ফা (চতুর্মাত্রিক) তালের কত প্রকারের ঝুঁকি ও দোলা হতে পারে এবং সে অনুসারে বাজনার পন্থাও প্রয়োজন অনুসারে বদলে যেতে পারে। কোথাও মাত্রায় বিশিষ্ট ধরণের আওয়াজ, কোথাও ঠক্ ঠক্—খট্ খট্—ঠুং ঠুং, কোথাও বাঁয়ার গমক, কোথাও এক একটি মাত্রা বা দুটো মাত্রায় বাড়ন্ত শব্দ—সব নিয়েই তালটাও একটা আবহ-সংগীতের একটানা গতিকে দোলা লাগিয়ে যায়, এতে বিশেষ রকমের তালের অঙ্গ বা অংশ বিকাশের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ভাবতে গেলে খোলের ডাইনের আওয়াজটাও লঘু সংগীতে অনেকটা আবহ সৃষ্টির মতো। ধর্মীয় গীতি অথবা অধ্যাত্ম গীতির জন্যে খোল ব্যবহারে আমাদের সংস্কার তৈরী হয়ে আছে, যদিও খোলেও বহু নৈষ্ঠিক তাল অনুশীলন হয়েছে ও হচ্ছে।

সবটা মিলে আধুনিক সংগীতেব তাল অনেকটা effect musicএরই মতো সহকাবী সংগীত মাত্র। তবলার রূপ পরিস্ফুট হতে পারে একমাত্র রাগপ্রধান গানে, যেখানে রাগ-সংগীতেব রীতি প্রয়োগ করা হয়, এবং এই রাগপ্রধান রীতিটি রাগ-সংগীতের তাল-নির্ভর। লঘু সংগীতের তাল মুক্ত-ছন্দ তাল, ছন্দ ও লয়ের ধ্বনি-সৌষম্য মাত্র। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, শিক্ষার ব্যবস্থায় তাল-সাধন যেমন প্রয়োজন তেমনি নানা যন্ত্র ব্যবহারের কুশলতা অর্জন না করলে ধ্বনি-সৌষম্য সৃষ্টির নিয়মবোধ জাগ্রত হতে পারে না। রাগ-সংগীতে একক তালযন্ত্রের কঠিনতম আঙ্গিকের শিক্ষা, লঘু-সংগীতে বহু ধ্বনি যন্ত্রের ব্যাপক বিস্তৃত শিক্ষা, রাগ-সংগীতে intensive—লঘু-সংগীতে extensive রীতিতে শিক্ষা-পদ্ধতি তৈরি হওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে লঘু-সংগীতে তাল সংগতের জন্যে বিশেষ বিশেষ শিল্পীর ডাক পড়ে যারা ছন্দ সৃষ্টিতে মৌলিক লয়বোধের সঙ্গে ধ্বনি-বোধের ওজন মাফিক সামঞ্জস্য সাধন করতে পারেন। বিশেষ ধরণের বাদকেরা লঘু-সংগীতেও সার্থক হতে পারেন। তাল শিক্ষার ক্ষেত্রে লঘু-সংগীতের বেলায় কিন্তু সংক্ষেপ নেই—প্রয়োগের ব্যাপারে যেমন সংক্ষেপ আছে। যিনি তবলা বাজাচ্ছেন, তিনিই ঠিক বাজাচ্ছেন এবং তিনিই চমকপ্রদ ছন্দে ঢোল বাজিয়েও শোনাতে পারেন। তিনি তালটি বাঁয়ার গমকে আর বাঁয়ার মাটির খোলের ওপর একটা ধাতব যন্ত্রের ধ্বনি তুলে গানের ছন্দকে দোলা লাগিয়ে দিতে পারেন। লঘু-সংগীতের পথ বিচিত্র এবং গতিও বিচিত্র। বর্তমান আলোচনা থেকে যে সূত্রগুলো যাওয়া গেল, তা সংক্ষেপে :

(১) রাগ সংগীতের তাল ও লঘু সংগীতের ছন্দ, দুটো স্বতন্ত্র প্রকৃতির—যদিও একই 'তাল' শব্দে দুটোই বোঝায়।

(২) রাগ-সংগীতের তাল—রীতি-মাফিক ধারাবাহিক (process) রূপে নানা অলঙ্কার সহযোগে গানের মধ্যে বিকশিত হয়। মাত্রা স্থাপনায় তাল যন্ত্র বাজনাতে উত্থান-পতনের সুষমা থাকে, ওজন-বোধ থাকে এবং সমের ভাব-সম্মিলনে ছন্দের পরিণতি ও সমাপ্তি।

(৩) লঘু সংগীতের তালে, মাত্রাকে নিয়মিত ভাবে ছন্দে বাজানোর ওপর নির্ভর করে। ক্রম-পরিণতিহীন একঘেয়ে এর গতি। অলঙ্কারের অপ্রয়োজন এর বৈশিষ্ট্য, সম-ফাঁকের নিয়মিত দৃঢ়বদ্ধতা (বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া) এতে প্রয়োজন নেই।

(৪) ছড়ার ছন্দ কিংবা বহু বিচিত্র যান্ত্রিক ও প্রাকৃতিক ছন্দ যে ভাবে তৈরী হয়, কবিতায় মাত্রা প্রয়োগের নানা ব্যবস্থায় যে ছন্দ তৈরী করা যায় লঘু-সংগীতে এ সকলই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমান ভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ধ্বনি-বৈচিত্র্যই লঘু-সংগীতের ছন্দের প্রাণ। অর্থাৎ কত প্রকারের ধ্বনির ব্যবহার কত ভাবে হতে পারে তাও লক্ষ্য করা দরকার।

(৫) লঘু-সংগীতের ছন্দ আধুনিক গানের একটি ধ্বনি-বর্ণ বিশিষ্ট অলঙ্কার মাত্র। অধিকাংশ স্থলে সে effect music (বা সহযোগী সংগীতা-লংকার) এমন কি গানের মধ্যে বোলবাণী, রেলা, পরণ, গৎ-সহ তবলার বা পাখোয়াজ ব্যবহার একটা অঙ্গ হতে গানে যুক্তপারে—যেমন করে কথক নৃত্যের ছন্দবাদনও আধুনিক হয়ে যায়। কিন্তু রাগ-সংগীতের কোন তালের পুরো প্রয়োগের দরকার ওতে নেই—অর্থাৎ তালের রীতি-অনুসারে প্রয়োগ। ক্রমবিকাশও দরকার নেই।

(৬) রাগ-প্রধান গানের বিশেষ আঙ্গিক-রাগসংগীতের তাল ব্যবহারে নিবদ্ধ।

আধুনিক গানের সঙ্গে রাগপ্রধান গানের এখানেই বিশেষ তারতম্য। এরপর, রাগ সংগীতের তাল প্রসঙ্গকে পাশ কাটিয়ে লঘু-সংগীতের বর্তমান তাল প্রয়োগ-বিধি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারবেন যাঁরা স্বর-প্রযোজক এবং যাঁরা ছন্দ ও তাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও বহুমুখী প্রয়োজন সম্বন্ধে ভেবেছেন, বহু রকমের যন্ত্রের দ্বারা যাঁরা ছন্দ ও লয়ের ঝুঁকি বা ইঙ্গিত সৃষ্টি করেন, শ্রোতার মনোরঞ্জন বা গানের প্রকৃতি অনুসারে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিই যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, তালবাদনের নিয়মিত পদ্ধতি তাঁদের কাছে গৌণ হয়ে যায়।

———

পরিশিষ্ট

নির্দেশিকা ১ ॥ ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী

সংগীত চিন্তা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাঙ্গীতিকী — দিলীপ কুমার রায়
স্বরলিপি গীতিমালা ১ম ও ২য় খণ্ড — শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র-সংগীতে ত্রিবেণী-সংগম — ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
রবীন্দ্র-সংগীত — শান্তিদেব ঘোষ
গীতবিতান বার্ষিকী — বিভিন্ন সংখ্যা
রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ১ম ও ২য় খণ্ড — প্রফুল্লকুমার দাস
কথা ও সুর — ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের গান/অন্যান্য প্রবন্ধ — সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা — শুভ গুহ ঠাকুরতা
রবীন্দ্র-জীবনী — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সংগীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
নজরুল চরিত মানস — সুশীলকুমার গুপ্ত
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ — সুশীলকুমার রায়
বাংলার গীতকার
মুঘল ভারতের সংগীতচিন্তা } — রাজ্যেশ্বর মিত্র
সংগীত পরিক্রমা — নারায়ণ চৌধুরী
বাংলার লোকসাহিত্য — ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলার লোকগীতির সুর বিচার — সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

[বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত পরিশিষ্ট—ক]

বাংলার বাউল — ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
হারামণি — মহম্মদ মনসুরুদ্দিন
বাংলার পল্লীগীতি সংগ্রহ — চিত্তরঞ্জন দেব
বাংলার লোকসংগীত ১ম—৫ম খণ্ড — ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত
লোকসাহিত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভারতের লোকসাহিত্য (সংগ্রহ) — বেতার জগৎ, শারদীয়, ১৯৬৪
বাংলা সংগীত (মধ্যযুগ) — রাজ্যেশ্বর মিত্র
ভারতীয় শক্তি সাধনা — ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

শাক্ত পদাবলী ও শক্তি ধর্ম — শ্রীজাহ্নবী চক্রবর্তী
ভারতীয় সংগীতচিন্তা — অরুণ ভট্টাচার্য
ভারতীয় সংগীতপ্রসঙ্গ — ডাঃ বিমল রায়
স্মৃতির অতলে — অমিয়নাথ সান্যাল
বিষ্ণুপুর — রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিষ্ণুপুর ঘরাণা — দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
বিষ্ণুপুর ঘরাণা ও আমি — শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য

[বিষ্ণুপুর ঘরাণা গ্রন্থের অন্তর্গত পরিশিষ্ট (১)]

সংগীতাচার্য রাধিকা মোহন গোস্বামী ও
বিষ্ণুপুর ঘরাণা — শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

[বিষ্ণুপুর ঘরাণা গ্রন্থের অন্তর্গত পরিশিষ্ট (২)]

ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্র (হিন্দী সংস্করণ)
How to Sing — Madeline Mansion
Akashvani — বিভিন্ন সংখ্যা
Aspects of Indian Music
(D. P. Mukherjee) — Publication Division

নির্দেশিকা—২ ॥

রবীন্দ্র-সংগীত

(ক) শ্রীদিলীপকুমার রায়ের উল্লিখিত "রাগ-ভঙ্গিম গানের দৃষ্টান্তপঞ্জী—যদিও তিনি বলেছেন এরূপ গানের সংখ্যা অনেক :

ইমন কল্যাণ/তেওরা

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে,
আমার মাথা নত করে দাও, তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে

সুরফাঁকতাল

প্রথম আদি তব শক্তি—সোহিনী, দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে—ভীমপলশ্রী

চৌতাল

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে—ভৈরোঁ, আছো অন্তরে তবু কেন কাঁদি—কাফি

একতাল

সীমার মাঝে অসীম তুমি—কেদার ছায়ানট, মন্দিরে মম কে—আড়ানা,
আমি তোমার প্রেমে হব—ভৈরবী, অমল ধবল পালে লেগেছে—ভৈরবী,

ত্রিতালী

ডাকো মোরে আজি এ নিশিথে—পরজ, আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—বাহার,
আজি কমল মুকুলদল খুলিল—বাহাব, তিমির দুয়ার খোলো—ভৈরোঁ রামকেলী,
রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি—খাম্বাজ

মধ্যমান (টপ্পা অঙ্গের)

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে—সিন্ধু, পিয়াসা হায় হায় নাহি মিটিল—ভৈরবী

(খ) ধ্রুপদাঙ্গ তথা ধ্রুপদ গানের শ্রেণীরূপে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের দৃষ্টান্তপঞ্জী :

চৌতালে

তুমি অমৃত পাথারে—ললিত, কেমনে ফিরিয়া যাও—ভৈরবী, এখনো আঁধার রয়েছে হে নাথ—আসাবরী, জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল মাঝে—বিভাস, প্রভাতে বিমল আনন্দে—গুর্জরী, আজি হেরি সংসার অমৃতময়—বিলাবল, শোনো তার সুধাবাণী শুভ মুহূর্তে—ইমন কল্যাণ, তোমারি সেবক করো হে—ছায়ানট, তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন—বড়হংসসারং, শুভ্র হতে তব অভয় মাঝে—বেহাগ, হে মহা প্রবল বলী—কানাড়া ইত্যাদি

সুরফাঁকতালে

শান্তি করো বরিষণ=তিলককামোদ, সুন্দর বহে আনন্দে মন্দানিল=ইমনকল্যাণ, দেবাদিদেব মহাদেব=দেবগিরি, প্রথম আদি তব শক্তি=দীপক, আনন্দ তুমি স্বামী মঙ্গল তুমি=ভৈরবী প্রভৃতি

ধামারতালে

আজ রাজ আসনে তোমারে=বেহাগ, মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে=বাহার, হৃদি মন্দির দ্বারে=কেদারা, গরব মম হরেছ প্রভু=দেশ, অমৃত সাগরে=কামোদ, প্রভৃতি

আড়া চৌতালে

সবে আনন্দ করো=দেবগিরি বিলাবল, শুভ্র আসনে বিরাজো=ভৈরব প্রভৃতি

তেওরা তালে

আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা=পূরবী, আমার মিলন লাগি তুমি=বাগেশ্রীবাহার, জড়ায়ে আছে বাধা=মিশ্র নাহানা, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে=বেহাগ, আলোর আলোকময় করো হে=ভৈরব, বিপুল তরঙ্গ রে=ভীমপলশ্রী, প্রভৃতি

ঝাঁপতালে

কেন বাণী তব নাহি শুনি=ভৈরব, নিত্য নব সত্য তব=শুক্ল বেলাবলী, পেয়েছি অভয়পদ=খট্, মহা সিংহাসনে বসি=ভৈরবী, হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে=ললিতা গৌরী, ইত্যাদি।

(গ) রবীন্দ্রনাথের 'দেশী' সংগীতরীতি অনুসারী রচনা সম্বন্ধে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের বর্ণিত বিশেষ লক্ষণ :

গান রচনার আরম্ভ থেকে সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত লোকপ্রচলিত সুরের সাহায্যে তৈরী গান—অধিকাংশ কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুরে রচিত :—

১ গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে (মিশ্র কীর্তন)
২ আমি শুধু রইনু বাকি (রামপ্রসাদী)
৩ আমি জেনেশুনে তবু (কীর্তন)
৪ শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি (রামপ্রসাদী)
৫ আবার মোরে পাগল করে (কীর্তন)
৬ সুখে আছি (মিশ্র কীর্তন)

ত্রিশ বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী দশ বছরে বাউল ও লোক-প্রচলিত সুরে রচিত গান

বাউল—তোমরা সবাই ভাল, খ্যাপা তুই আছিস আপন

কীর্তনাঙ্গ—আমাকে কে নিবি ভাই, খাঁচার পাখি ছিল, বড় বেদনার মত,
ওহে জীবনবল্লভ, ভালবেসে সখী, সংসারে মন দিয়েছিনু,
ওগো এত প্রেম আশা, চাহিনা সুখে থাকিতে হে,
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক

অন্যান্য প্রচলিত সুরে—এবার যমের দুয়ার খোলা, তোমরা হাসিয়া বহিয়া,
তোমার গোপন কথাটি, আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,
বঁধু তোমায় করব রাজা, আজি শরত তপনে,
নয়ন তোমারে পায় না, ওলো সই ওলো সই,
হৃদয়ের একূল ওকূল।

১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ—স্বদের আন্দোলন (প্রায় ৪৪ বৎসর বয়সে) পূর্ববঙ্গীয় বাউলদের গানের সুরে রচনা :—

১.	আমার সোনার বাংলা	২.	ও আমার দেশের মাটি
৩.	ওরে তোরা নাই বা কথা বললি	৪.	ঘরে মুখ মলিন দেখে
৫,	ছি ছি চোখের জলে	৬.	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
৭.	যে তোরে পাগল বলে	৮.	যদি তোর ডাক শুনে

"বাংলার নিজস্ব সুর ও ঢঙে রচিত গুরুদেবের গানের আর একটি নতুন সৃষ্টির প্রকাশ আমাদের কাছে ধরা পড়ে থাকে। আমি বলি রাবীন্দ্রিক কীর্তন বা রাবীন্দ্রিক বাউল। অর্থাৎ আখর ইত্যাদি বর্জিত, বাউলের প্রভাবযুক্ত ও গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের জীবনে যার সূত্রপাত, সেই গান।"

বাউল, কীর্তন ইত্যাদি সুরের রচনায় বিচিত্র ছন্দের প্রয়োগ :—

১ ওরা অকারণে চঞ্চল—চার মাত্রা

২ আমার কী বেদনা সে কি জানো—তিন মাত্রা

৩ যেতে যেতে চায় না যেতে—ঝাঁপতালে

৪ লহ লহ তুলে লহ—তেওড়াতালে

"বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে এর আগে রচিত (৫৪ বৎসর বয়স) গানের মধ্যে ধর্ম সংগীত ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, তারপর জাতীয় সংগীত (দেশাত্মবোধক অর্থে) ও মানবিক প্রেমের গান। ঋতু-বিষয়ক সংগীত দু-একটি মাত্র। কিন্তু এখান থেকে ঋতু-সংগীত যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি ঐ সুরে জাতীয় সংগীত লেখা বন্ধ হয়ে গেল। জীবনের প্রথম দিকে রামপ্রসাদী সুরের গান কিছু পেয়েছিলাম; কিন্তু শেষার্ধে সে সুরে আর একটিও রচনা করতে দেখি না। প্রথম জীবনে রচিত কীর্তনের বিভিন্ন সুর ও ঢঙের মধ্যে কয়েকটি আর পরবর্তী জীবনে দেখা গেল না। দেখা গেল নতুন ঢঙের দেশী, মিশ্র সুরের গান। যেমন—আজি এ নিরালা কুঞ্জে, পুরানো জানিয়া চেও না, রোদন ভরা এ বসন্ত ইত্যাদি। 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' বা 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গান দুটিতে যে ধরনের প্রচলিত কীর্তনের সুর শুনি ঠিক ঐ সুরে আর তিনি রচনা করেন নি।"

(ঘ) অপ্রচলিত তালের প্রথম প্রকাশ তালিকা (রবীন্দ্র সংগীত গ্রন্থের—"ছন্দ ॥ তাল")

১৩১০ কাব্যগ্রন্থ। মোহিত সেন সম্পাদিত

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে। রূপকড়া ৩।২।৩ =৮ মাত্রা

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া। একাদশী ৩।২।২।৪=১১ মাত্রা

নিবিড় ঘন আঁধারে। নবতাল ৩।২।২।২=৯ মাত্রা

১৩১৬ গান। ইণ্ডিয়ান প্রেস সম্পাদিত

জননী, তোমার করুণ চরণ। নবপঞ্চতাল ২।৪।৪।৪।৪=১৮ মাত্রা

আজি ঝড়ের রাতে। ঝম্পক ৩।২=৫ মাত্রা

বিপদে মোরে রক্ষা কর। ঝম্পক ৩।২=৫ মাত্রা

১৩২১ গীতালি। হৃদয় আমার প্রকাশ হল ৪।২=৬ মাত্রা

১৩২৪ সংগীতের মুক্তি—(প্রবন্ধ)

ও যে দেখা দিয়ে যে চলে ৫।৫=১০ „

ব্যাকুল বকুলের ফুলে ৫।৪=৯ „

কাঁপিছে দেহলতা থরথর ৩।৪।৪=১১ „

দুয়ার মোর পথ পাশে ৯=৯ „

যে কাঁদনে হিয়া ৬।৩=৯ „

১৩২৬ শেফালি। সখী প্রতিদিন হায়; ৬।৬=১২ „

১৩২৯ নবগীতিকা (১ম)। আমার দিই বেলা যায়গো ২।৪=৬ মাত্রা

নির্দেশিকা—৩ ॥

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের উল্লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের কতিপয় রাগ-ভঙ্গিম গান

আইল ঋতুরাজ সজনি	সিন্ধুড়া	চৌতাল
আজি গাও মহাগীত	খাম্বাজ	চৌতাল
আজিগো তোমার চরণে জননি	ইমনকল্যাণ	একতালা
আজি তোমারি কাছে ভাসিয়া যায়	ঝিঁঝিট	মধ্যমান
আজি নূতন রতনে	ভৈরবী	ত্রিতালী
আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে	ভৈরবী	মধ্যমান
আনন্দময়ী বসুন্ধরা	ভৈরবী	ত্রিতালী
আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই	ঝিঁঝিট	একতালা
আমার আমার বলে ডাকি	ভৈরবী	একতালা
আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে	ইমনকল্যাণ	একতালা
আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি	ঝিঁঝিট খাম্বাজ	[illegible]

আমি সারা সকালটি বসে বসে	ভূপকল্যাণ	একতালা
প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে	জয়জয়ন্তী	চৌতাল
কী দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি	ভৈরবী-আসাবরী	চৌতাল
একই ঠাঁই বলেছি ভাই	ভৈরবী	ঝাঁপতাল
আর একবার ভালবেসো	যোগিয়া	ত্রিতালী
যে জগতে আমি বড়ই একা	ভীমপলশ্রী	যৎ
এ জীবনে পূরিলনা সাধ ভালবাসি	ভৈরবী	যৎ
এসো প্রাণসখা এসো প্রাণে	বাহার	ত্রিতালী
ঐ প্রণয় উচ্ছ্বাসী মধুর সম্ভাবি	ভেঁরো	একতালা
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে	ভৈরবী	ত্রিতালী
বরষা আইল অই	কেদারমল্লার	ত্রিতালী
হৃদয় আমার গোপন করে	ছায়ানট	একতালা
যাও হে সুখ পাও	ইমনকল্যাণ	তেওরা
সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই	বাগেশ্রী	আড়াঠেকা
তোমারেই ভালবেসেছি আমি	দরবারী কানাড়া	আড়াঠেকা
মলয় আসিয়া কয়ে গেছে	নটমল্লার	যৎ

[গানগুলোর লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে—ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, টপ্‌খেয়াল ইত্যাদি রূপে]

নির্দেশিকা—৪ ॥

(ক) রজনীকান্তের যে সকল গান গ্রামোফোন রেকর্ডযোগে প্রচারিত

আমি সকল কাজের	তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে
কবে তৃষিত এ মরু	আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ
মাগো, এ পাতকী	কুটিল কুপথ ধরিয়া
আমি তো তোমারে	আর কতদিন ভবে থাকিব
প্রেমে জল হয়ে যাও গলে	তোমারি দেওয়া প্রাণে
স্নেহবিহ্বল করুণা ছলছল	ওরা চাহিতে জানে না

সম্প্রতি প্রকাশিত "কান্ত-পদ-লিপি"—শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের স্বরলিপিসহ, ৩০টি গানের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ গ্রন্থে যেসব অতিরিক্ত জনপ্রিয় গানের স্বরলিপি পাওয়া যাচ্ছে :

শুনাও তোমার অমৃত বাণী	তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন
আমি সকল কাজে পাই হে সময়	যদি মরমে লুকায়ে রবে
ভীতি সঙ্কুল এ ভবে	পাতকী বলিয়ে কি গো

কেন বঞ্চিত হব চরণে
কবে চির মাধুরী
ভারত কাব্য নিকুঞ্জে
তবু ভাঙেনা ঘুমের ঘোর
আমি অকৃতি অধম
ঐ ভৈরবে বাজিছে
সেথা আমি কি গাহিব গান
তব চরণ নিয়ে উৎসবময়ী ইত্যাদি

(খ) অতুলপ্রসাদের গান (কাকলী) স্বরলিপি যোগে বহুল-প্রচারিত। যে সকল গান রাগভঙ্গিম (অনেক ক্ষেত্রে ঠুমরী জাতীয়) বলে শ্রীদিলীপকুমার রায় উল্লেখ করেছেন "শ্রেষ্ঠ গান হিসেবে ভাবীকালে বীণাপাণির প্রসাদ পাবে" সে গানের তালিকা :

কি আর চাহিব বলো
আর কতকাল থাকব বসে
আমারে এ আঁধারে
ওগো সাথী
প্রভাতে যারে নন্দে পাখি
মিছে তুই ভাবিস মন
ওগো নিঠুর দরদী
ঝাবনা ঝাবনা ঝাবনা ঝরে
মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে
বঁধু ধরো ধরো মালা
কত গানতো হল গাওয়া
সে ডাকে আমারে
আয় আয় আমার সাথে
পাগলা মনটারে তুই বাঁধ
জল বলে চল্ মোর সাথে চল্
আমারে ভেঙে ভেঙে
থাকিসনে বসে তোরা
আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়
এ মধুর রাতে
সবারে বাস্‌রে ভালো
কে গো তুমি বিরহিণী
রুমক ঝুমক রুনঝুন
বাদল ঝমঝুম বোলে
তাহারে ভুলিব কেমনে
শ্রাবণ ঝুলাতে
আমার বাগানে এত ফুল
জানি জানি গো রঙ্গরাণী
মধুকালে এল হোলি

নির্দেশিকা—৫।

নজরুল-গীতি

জনপ্রিয় নজরুল-গীতির দৃষ্টান্তপঞ্জী। অধিকাংশই এচ. এম. ভি., কোলাম্বিয়া, হিন্দুস্থান প্রভৃতি রেকর্ডে বিধৃত। জনপ্রিয় রচনার মধ্যে কিছুসংখ্যক ইসলামী গানও ছিল, সেগুলোর প্রচলনের মূলেও ছিলেন নজরুল।

অহংকারের মূল কেটে দে
আজ ভারতের নব যাত্রা পথে
আজি নন্দদুলাল মুখচন্দ্র
আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে
আমায় নহে গো, ভালবাস মোর গান
আমায় শ্যামা মায়ের কোলে

আমারে চোখ ইশারায়
আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
আমি সন্ধ্যা-মালতী বনছায়া অঞ্চলে
আমি দ্বার খুলে আর
আবার যখন গান ধরেছি
আরো কতদিন বাকী
আসল যখন ফুলেরি ফাগুন
আসিল আজি বন্ধু মোর
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
এ আঁখিজল মোছ প্রিয়া
এ ঘন ঘোর রাতে
এত জল ও কাজল চোখে
এল ঐ রণরঙ্গিণী চণ্ডী
এল রে দুর্গা
করুণ কেন অরুণ আঁখি
কাবেরী নদী জলে
কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে
কারার ঐ লৌহ কপাট
কালো মেজে ফিরলি ঘরে
কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে
কুহু কুহু কোয়েলিয়া
কে নিবি ফুল
কে বিদেশী
কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
কেন আনো ফুল ডোর
কেন কাঁদে পরাণ
কেন দিলে এ কাঁটা
কেন মেঘের ছায়া
কেমনে রাখি আঁখি বারি
গভীর নিশীথে
চেওনা সুনয়না
জগতের নাথ কর পার হে
জানি জানি প্রিয়
তোমায় যা বলার কিছু

তুমি শুনিতে চেওনা মোর মনের কথা
তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
দক্ষিণ সমীরণ সাথে
দুর্গম গিরি কান্তার মরু
দূর দ্বীপবাসিনী
দে দোল দে দোল
নহে নহে প্রিয় এ নহে আঁখিজল
নতুন করে গড়ব ঠাকুর
নীলাম্বরী শাড়ি পরি
না মিটিতে মন সাধ
পালিয়ে যাবে গো, আমি দ্বার খুলে আর রাখব না
পিউ পিউ বিরহী
প্রিয়তম হে বিদায়
প্রথম মনের মুকুল
ফাগুন রাতের ফুলের নেশায়
বলরে জবা বল
বসিয়া বিজনে
বাগিচায় বুলবুলি তুই
বাঁশি বাজায় কে কদমতলায়
বিদায় সন্ধ্যা আসিল
বৌ কথা কও
ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান
ভারত শ্মশান হল মা
ভারতলক্ষ্মী আয় মা ফিরে
ভারত আজিও ভোলে নি
ভুলি কেমনে
ভোরের ঝিলের জলে
মধুর মিনতি শুন ঘনশ্যাম
মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে
মহাকালের কোলে এসে
মাগো, চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়
মেঘে মেঘে অন্ধ
মেঘহীন খর বৈশাখে

মেঘলা নিশি ভোরে
মেঘবরণ কন্যা
মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
মোমের পুতুল মমীর দেশে
মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম
যত নাহি পাই দেবতা
যবে তুলসী তলায়
যাও যাও তুমি ফিরে
রাতের শেফালি ঘুম ভেঙে বলে
রাঙামাটীর পথে লো
রুমুঝুমু রুমুঝুমু
শাওন আসিল ফিরে
শিকল পরা ছল আমাদের
শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয়
সখি গো বৃথা প্রবোধ দিলে
সখি, বল বঁধুয়ারে
হে বিধাতা হে বিধাতা

নির্দেশিকা—৬

সুরকার ও প্রযোজক

(ক) রেকর্ডে প্রকাশিত আধুনিক সংগীতে সুর-সংযোজনা প্রযোজনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

অনিল ভট্টাচার্য
মাধবী রাতে মম মন বিতানে
অনুপম ঘটক
গান গেয়ে মোর
তুমি ছিলে তাই
শুকনো পাতা ঝরে যায়
সন্ধ্যামালতী বনে
হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে
জাগো রে মন
চোখের জলে পূজবো এবার
আজি এ শারদ বিজয়া গোধুলি
কমল দাশগুপ্ত
আমি ভোরের যূথিকা
জানি জানি গো
পৃথিবী আমারে চায়
সবার দেবতা তুমি
সেদিন তোমায় আমি বলেছিনু গো
সাঁঝের তারকা আমি
নচিকেতা ঘোষ
ছোট পাখি চন্দনা
মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা
রবীন চট্টোপাধ্যায়
চৈতী ফুলের কী বাঁধিস রাঙা রাখি
পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে
মধু মালতী ডাকে আয়
রাইচাঁদ বড়াল
[আধুনিক গান রচনার প্রাথমিক যুগে রাইচাঁদ বড়ালের স্থান পুরোভাগে সহজ সরল সুর-সংযোজনায় চলচ্চিত্রের জন্য রচিত কুন্দনলাল সাইগলের গানগুলোর দৃষ্টান্তই উল্লেখ করা যায়]
গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে

কাহারে যে জড়াতে চায়
রাজার কুমার পক্ষীরাজে
প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার
প্রেমের পূজায়

শৈলেশ দত্তগুপ্ত

জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা
তোমার ভুবন মাঝে
তোমায় ডাকা ভুলব না

সলিল চৌধুরী

পাল্কীর গান
গাঁয়ের বধু
রাণার
ওগো আর কিছু তো নাই
কেন কিছু কথা বল না
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
দুরন্ত ঘূর্ণির লেগেছে পাক
যদি কিছু আমারে সুধাও
যা যা রে যা যা পাখী
যাক যা গেছে যাক

সুধীরলাল চক্রবর্তী

আমি তোমার কেহ নহি
আপনারে ভুলে যাই
এ দুটি নয়ন
তোমার রূপের মাধুরী
খেলাঘর মোর

সুধীন দাশগুপ্ত

সোনার হাতে সোনার কাঁকন
চোখের নজর কম হলে
এসো বরষা যে সহসা
জল ভরো কাঞ্চন কন্যা
নাম রেখেছি বনলতা

সুবল দাশগুপ্ত

নাই বা ঘুমালে প্রিয়

হিমাংশু দত্ত

আকাশের চাঁদ মাটির ফুলেতে
চাঁদ কহে চামেলি গো
খুঁজে দেখা পাইনি যাহার
তার কাজল নয়নে ছিল
ঝরা চামেলি বনে
আজি এ মাধবী রাতে
যদি দখিনা পবন আসিয়া
আলোছায়া দোলা
মম মন্দিরে এলে
মধু রাতে আজি
ফাগুনের সমীরণ সনে
বহে রিনিকি ঝিনিকি
ছিল চাঁদ মেঘের পারে
বল হিম ঋতু বল
ঝরানো পাতার পথে
তাজমহল
চাঁদ ভোলে নাই চামেলিরে তার
রাতের ময়ূর ছড়ালো পাখা
প্রেমের না হবে ক্ষয়
শ্রাবণ রজনী

(খ) আধুনিক সংগীতে সুর-সংযোজনা ও প্রযোজনার কিছু সংখ্যক দৃষ্টান্ত-আকাশবাণীর রম্যগীতি অনুষ্ঠানে প্রচারিত :

অনিল বাগচী

যে প্রেমে নেই গো ক্ষমা
জীবনেতে প্রেম একবার আসে

অনুপম ঘটক

তোমারে গান শুনিয়ে

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাক চাক কুড় কুড় নকুড় নকুড়

সলিল চৌধুরী

কে ঢেউ জাগালে আজ

ঝিল্‌মিল্‌ ঝিলমিল্‌

ওপারের মঞ্জিল

হলুদ গাঁদার ফুল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উড়ে যায় মনের কথা

আজ বুল বুল দেয় শীষ

সুরেন পাল

যদি বলো ভুলে যেতে

হিতেন বসু

রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা

হিমাংশু বিশ্বাস

পাখি আবক্ষারার

কয়েকটি ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৫৪	২৬	যাগের মধ্যে	রাগের মধে
৯২	১২	অনুকরণ।	অনুকরণ,
৯৫	১১	দু'শটি	দু দশটি
১১৩	৫	ঠাইছ, আরম্ভ	বাইছ-আরম
১০১	১০	তালের গান	চালের গান